কত আলোর সঙ্গ

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কথাশিল্পী মনোজ বসু

অগ্রজপ্রতিমেষু

হৃদয়ের সঙ্গে প্রদীপের তুলনা কোথায় পড়েছিলাম মনে নেই, কিন্তু কথাটার তাৎপর্য আজ বেশ বুঝতে পারছি। আজ মনে হচ্ছে, সেদিন আমার চারিদিকে ছিল সারিসারি প্রদীপ জ্বালানো, কেউ হাওয়ায় কাঁপছে, কেউ স্থির হয়ে পূর্ণ শিখায় দাঁড়িয়ে আছে। কেউ বা নিভে গেছে, কেউ বা আবার উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠছে।

হয়ত কোন্ সে অনাদি কাল থেকে এমনি ক'রেই জ্বলে জ্বলে আলোক বিকীরণ ক'রে আসছে। মহাকালের সৌধশিখরে বহু প্রদীপের দীপাবলী। সেই যে একটা গান শুনেছিলাম না? 'যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ, তার অণু-পরমাণু পেলো কতো আলোর সঙ্গ। ও তার অন্ত নাই গো নাই!'

তাদের সঙ্গ আমায় ব্যথা দিয়েছে, কষ্ট দিয়েছে, কিন্তু আনন্দও দিয়েছে। আজ সেই-সব ব্যথার রেখা কোথায় গেছে হারিয়ে, স্মৃতির মণিঘরে যা বেঁচে আছে, তা আনন্দ।

বোধহয়, মহাকালের বিধানে, সব-কিছু ধুয়ে মুছে গিয়ে শেষ পর্যন্ত আনন্দই জেগে থাকে। দুঃখ-ব্যথা-বিরহ সবই যেন হৃদয়ে লালিত হ'তে হ'তে অবশেষে একদিন আনন্দের স্নিগ্ধ দীপালোক হ'য়ে দেখা দেয়! প্রমত্ত মন-বাউল মুহূর্তে গেয়ে উঠে—

'কতো, শুকতারা যে স্বপ্নে তাহার রেখে গেছে স্পর্শ,
কতো, বসন্ত যে ঢেলেছে তায় অকারণের হর্ষ,
ও তার অন্ত নাই গো নাই!'

কিন্তু কতো বসন্তের হর্ষের কথা আজ আপনাকে আমি বলব বাড়ুয্যে-মশাই? বহু বসন্ত এসেছে, গেছে, কতো হর্ষ দিয়ে গেছে, কতো বেদনাও দিয়ে গেছে, তার কতটুকু সংবাদই বা আপনাকে দিতে পারব?

আবার সেই বাউলের মতোই বলে উঠি,

'সে যে, প্রাণ পেয়েছে পান করে যুগ-যুগান্তরের স্তন্য,
ভুবন, কতো তীর্থজলের ধারায় করেছে তায় ধন্য,
ও তার অন্ত নাই গো নাই!'

কোন্ তীর্থের কথা দিয়ে শুরু করব? তারা সবাই এক-একটি কাহিনী,

সবাই নায়ক, সবাই নায়িকা। বিচিত্র তাদের মন, কারোর সঙ্গে কারোর মিল নেই। বিচিত্র তাদের বেশ, কারোর সঙ্গে কেউ যেন এক হয় না। ঝলমলে পোষাকে এসে একে একে তারা সামনে দাঁড়াচ্ছে, কথা বলছে, আবার চলে যাচ্ছে। তাদের হাসি, তাদের গান, তাদের নৃত্য, তাদের ক্রন্দন, সব যেন এক-এক সময় এক-এক মহাসমুদ্রের হাহাকারের মতো কানে এসে বাজে।

বুঝি-বা তারা মহাসমুদ্রই। অজস্র ঢেউ হ'য়ে তটরেখায় ভেঙে পড়ছে, আবার ফিরে যাচ্ছে। যেন সারা জীবন দিয়ে বিশেষ কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা, অথচ পাচ্ছে না। নির্মম মহাকাল দিচ্ছে না উত্তর। কথা কও? কথা নেই। নিরাশ হ'য়ে স্তিমিত-শক্তি ব্যর্থ তরঙ্গের মতো শূন্য বেলাভূমি দিয়ে বয়ে বয়ে মিশে যাচ্ছে অগাধ অনন্ত বারিরাশির মধ্যে।

প্রথমেই যার কথা মনে পড়ছে, তিনি গোকুলবাবু। আমি নিজে দরিদ্র, দরিদ্র পিতা-মাতার সংসারেই এসে জন্মেছিলাম, কিন্তু ছোট থেকেই আমার যে পরিবেশ, তার থেকে গোকুলবাবুদের পরিবেশে যে কোনদিন গিয়ে পড়ব, একথা স্বপ্নেও ভাবি নি।

কথাটা প্রথম থেকেই বলা যাক। আমি বড়ো হলাম। নানান্ দিকে ছিট্‌কে পড়লাম, আপনার মতো এদেশ-ওদেশ নয়, কলকাতারই এদিক থেকে ওদিকে। আঠারো-উনিশ বছর বয়স থেকে যাকে সংসারের কথা ভাবতে হয়েছে, তার জীবনটা যে কী হ'তে পারে, সহজেই অনুমান পাবেন আপনি। অধিকাংশ গরীব—অর্থাৎ ভাল ভাষায় নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারের যা অবস্থা হয়, আমাদেরও তাই হয়েছিল, নূতনত্ব কিছু নেই। আমি বাপ-মার মেজো ছেলে, আমার বড়দা আই-এস্-সি পরীক্ষা পাশ করতে পারে নি বলে বাবার কাছে বকুনী খেয়েছিল; আর সেই রাত্রেই সে রেলের লাইনে মাথা দিয়ে আত্মহত্যা করে। যেখানটা কালিঘাট রোড মোড়লদের রাসবাড়ীর দিকে চলে গেছে, মাথার ওপরে রেলের পোল, তারই কাছে ঘটেছিল ঘটনাটা। সেই থেকে বাবাও যেন কেমন হ'য়ে গিয়েছিলেন।

থেকে থেকে বলতেন—হ্যাঁরে, রাখাল সত্যিসত্যি চ'লে গেল?

বড়দার নাম ছিল রাখাল। বাবার এদিকে কাজকর্মে মন নেই, ফলে তাঁর সওদাগরী অফিসের চাকরীটাও একদিন গেল। আমাদের একটিমাত্র ছোট বোন ছিল, হাতের গয়না-টয়না বেচে অতি কষ্টে তার বিয়ে দিয়েছিলো মা। সে-ও

এক পাড়াগাঁয়ে; রাণাঘাটের ওদিকে চাকদহের কাছে। রইলাম আমি আর আমার ছোট ভাই। বাবা ক্রমে ক্রমে কেমন যেন পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। শ্মশানে-টশানে ঘুরতেন, বলতেন—আজ এক অদ্ভুত সাধু এসেছে নিমতলার ঘাটে। একদম কথা বলে না। মৌনী বাবা।

অন্যদিন বললেন—দক্ষিণেশ্বরের চত্বরে ব'সে আছি। পাগলের মতো ছেঁড়া কাপড় ছেঁড়া জামা গায়ে একটা লোক কোত্থেকে কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে—বেলা যায় দেখছিস না? সরে পড। শিকল কেটে আকাশে উড়ে যা।

এরপব থেকেই বাবা কেমন যেন আরও উদাস, আরও অন্যমনস্ক হ'য়ে গিয়েছিলেন। তাবপরে, একদিন সকালে উঠে দেখি, তাঁর বিছানা খালি, তিনি নেই, বাইরেব দরজাটাও খোলা।

ভেবেছিলাম, কী খেয়ালে আবার হয়ত কোনো সাধু-সন্ন্যাসীর খোঁজে গেছেন। তিনদিন গেল, চারদিন গেল, খুঁজে খুঁজে আমি হয়রাণ। পরে বুঝলাম, তিনি নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেছেন।

তারপরে, মা, আমি আর আমার ছোটভাই মধুসূদন, আমরা যে কী ভাবে সংসাব-সমুদ্রে ভেসে বইলাম, তাব বর্ণনা আজ আর দিয়ে লাভ নেই শচীনবাবু। কতো দিন না খেয়ে কাটিয়েছি, আজ তা' বলতেও ভালো লাগছে না, আপনার শুনতেও ভালো লাগবে না। এমনি করে দুঃখ-কষ্ট আর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে বড়ো হ'লাম। মা কবলেন কী, আমাব এক উপযুক্ত অভিভাবক পাবার আশায় একদিন আমার বিয়েও দিয়ে বসলেন। তাবপরেব ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। একদিন কাশী থেকে একটা চিঠি পেলাম এক সেবাশ্রম সংঘের। তাতে বোঝা গেল, উপযুক্ত গুরু খুঁজতে খুঁজতে বাবা গিয়েছিলেন দুর্গম সব হিমালয় তীর্থে, কেদাব-বদবী থেকে গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী, তারপরে বোগজীর্ণ অবস্থায় এসে পৌঁছলেন কাশীব ঐ সেবাশ্রমে, নিজের পরিচয় মুখে মুখে তাঁদের কাছে দিতে দিতে তিনি চিরতবে চোখ বুজেছেন।

মা হাতেব শাঁখা ভাঙলেন, শাড়ি ছেড়ে থান পরলেন। আর, আমার তখন মনে হ'লো, সাবাটা জীবন ধরে বাবা কী যেন খুঁজেছেন, কিন্তু খোঁজাই সার হলো, শেষ পর্যন্ত তিনি পেলেন না কিছুই। তার এই না-পাওয়ার বেদনাই যেন অন্তরে তীব্রভাবে অনুভব করেছিলাম সেদিন। আর কিছু না, শোক না, তাঁকে হারানোর বিয়োগ-ব্যথাও না।

পরের বছর মা-ও গেলেন। খুব স্বাভাবিক ভাবে। আমি বাড়িতে ছিলাম না, মধুও কাজের চেষ্টায় কোথায় কোথায় যেন ঘুরতে বেরিয়েছে।

মা হঠাৎ নাকি বললেন, আমার বুকের ভিতরটা কেমন করছে, আমাকে ধরো ত বৌমা।

বলতে বলতে ঢলে পড়লেন তার বৌমার কোলে, শুয়ে পড়লেন যেন ছোট্ট মেয়ে। সেই যে পড়লেন, আর উঠলেন না।

সেই থেকে পুত্র-কন্যা পরিকীর্ণ হ য়ে একবার একূলে, আরেকবার ওকূলে ঠোক্কর খেতে খেতে এগিয়ে চ'লেছি। মধু একটা চাকরী জোগাড় ক'রে চ'লে গেল জব্বলপুরে, বিয়ে-থা ক'রে সেখানেই আছে। অর্থাৎ, যে-যার চক্রে আবর্তিত হচ্ছি। আপনাকে বলতে বাধা নেই শচীনবাবু, আপনাদের মতো লেখার অভ্যাস আমারও একটু আধটু ছিল। কবিতা লিখিতাম এককালে, গানও লিখতাম। খান দুই নাটকও লিখেছিলাম, এক অ্যামেচার ক্লাবের ছেলেরা সেসব প্লেও করেছিল। কিন্তু, কোথায় চলে গেছে সে-সব!

সে মনও নেই, সে ক্ষমতাও নেই। সংসারের প্রতিদিনের দাবী মেটাতে মেটাতে সবই গেছে ক্ষয় হ য়ে। কথা আজও বলতে পারি, কিন্তু লিখতে পারিনা! কেউ যদি লিখে রেখে দিতো আমার মনের সমস্ত কথাগুলি, তাহলে বোধহয়, কিছুটা হালকা হয়ে বাঁচতাম।

শেষ যে-চাকরীটা আমি করছিলাম, সেটা এক মারোয়াড়ীর গদিতে। অতি তুচ্ছ কারণে সে চাকরীটা আমার একদিন চলে গেল। চাকরীটাও করতাম, আর সারাদিন কাজ করার পর রাত্রের কলেজে গিয়েও পড়তাম। আজ আমার বয়স উনচল্লিশ, সুতরাং বেশ বেশী বয়সেই পড়ছিলাম বলতে হবে। এমনি ক রে ক রে বি-কম্ পাশ ক'রে বেরুলাম। মনে মনে এমন একটা আশা জন্মেছিল যে, আর যাই হোক, চাকরীর অভাব আমার হবে না কোনোদিন। বাবা ত পড়িয়েছিলেন আমাকে প্রবেশিকা পযন্ত। তার পরেই ত সংসারের ভার এসে পড়ে আমার ওপরে। টুক-টাক্ কতো কাজই না করেছি! বিস্কুটের কারখানা, ওষুধের দোকান কিন্তু যাক্ সে-সব। বিয়ের পর শ্বশুর মশাইয়ের আনুকূল্য অবশ্য পেয়েছিলাম। না পেলে, আর সব ছোট-খাটো চাকরী আমার করা হ'তো না। শুধু বলতেন—একটু পাশ-টাশ হ'লে ভালো হতো।

অগত্যা রাত্রের কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু আমি পাশ ক রে বেরোতে না বেরোতে শ্বশুর মশাইও চলে গেলেন হৃদ্‌রোগে।

এই ত আমার পরিবেশ। তখন আমার স্বাস্থ্য বলতে গেলে কিছু নেই, যেন ধুঁকছি। তার ওপর গেল মাড়োয়ারীর চাকরীটা। ভেবেছিলাম, নতুন

চাকরীর জন্য বোধহয় বেশী ঘুরতে হবে না। কিন্তু, দুদিনেই সে-[illegible] আমার চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেছে।

তখন হন্যে হ'য়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। দরখাস্ত লিখে লিখেও বুঝি হয়রাণ হ'য়ে গিয়েছিলাম। জব্বলপুরে মধুকে লিখলাম। ও উত্তর দিলে, এখানে চাকরী কই?

ও নিজেও ছাঁটাইয়ের মুখে কিনা বুঝতে পারছে না। এতদিন চাকরী করেও পার্মানেণ্ট হ'তে পারেনি।

লিখলাম—কিছু অর্থ সাহায্য করবি?

মধু মণিঅর্ডারে পাঠিয়েছিল, দশটি টাকা।

ও কী করবে? করে কারখানার সামান্য চাকরী। পুত্রকন্যা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। দৈনন্দিন সংসার-খরচ চালানোই যেখানে দুষ্কর, সেখান থেকে তুলে দশটা টাকা কাউকে পাঠানো যে কী কঠিন, আমি তা জানতাম। কিন্তু একথাও মনে আছে, ওর পাঠানো দশটি টাকাও সেদিন আমার সংসারে একশো টাকার কাজ করেছিল।

এমনি করে পুরো বারোটি মাস বেকার জীবন কাটিয়ে গেলাম। কী ক'রে যে কাটিয়ে গেছি, সে আমিই জানি। স্কুল থেকে ছেলেমেয়ে গুলির নাম কেটে দিয়েছে। স্ত্রীর গায়ে গয়না বলতে কিছু নেই, চারিদিকে ঋণ আর ঋণ। বাড়ীওয়ালা আজই উঠিয়ে দেয়, বা কালই উঠিয়ে দেয়। আমি পাগলের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি, যেমনি হয়েছে পোষাকের শ্রী তেমনি চেহারা, চুরিই করব, না পকেটই কাটব, কে জানে! না কি, দাদার মতো রেল লাইনের ওপর মাথাটা দিয়ে সকল জ্বালা জুড়োবো? বিশ্বাস করুন, ইঞ্জিনের আলো প'ড়ে দুটি রেলের লাইন ঝলমল ক'রে উঠেছে, এ যেন তখনকার দিনে চোখ বুঝলেই আমি দেখতে পেতাম। দুটি রেলের লাইন যেন অনুক্ষণ আমায় টানছে। সেই মোড়লদের বাসবাড়ীর সন্নিহিত টালিগঞ্জের পোল, আর পোলের ধারের সমান্তরাল দুটি রেলের লাইন, যেখানে দাদার মাথাটা গলার কাছ থেকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে দূরে ছিটকে পড়েছিল।

এই যখন মানসিক অবস্থা, কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে যেন বিফল মনোরথ হ'য়ে বৌবাজারের মোড়ে যে সিনেমাটা আছে, তার বিপরীত দিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছি বাসের আশায়, হঠাৎ কানে এলো মৃদু মেয়েলী কণ্ঠস্বর, শুনছেন?

এতো কাছ থেকে সে ডাক, যে রীতিমত চমকে উঠে তাড়াতাড়ি মুখ তুলে দেখি

আমারই মুখের দিকে উৎসুক দুটি চোখ তুলে তাকিয়ে আছেন একটি মহিলা। কালো পাড়ের সিল্কের সাদা শাড়ী পরা, হাতে জরির কাজকরা কালোরঙের ছোট লেডিস্ ব্যাগ। মোটামুটি সুশ্রী চেহারা বলেই মনে হ'লো। বেশ ফর্সাই গায়ের রঙ। চোখে চশমা। বললেন—আচ্ছা, আপনার কি কালিঘাটে বাড়ি ?

জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে আছি লক্ষ্য ক'রে মহিলাটি আবার বললেন—কালিঘাটে, মানে, নেপাল ভট্টাচার্জি স্ট্রীটে ?

বলতে গিয়েছিলাম, সে একদিন ছিল বটে, এখন নেই। অর্থাৎ, ছোট বেলায় ও পাড়ায় একটা বাড়ীতে বহুদিন আমরা ভাড়া ছিলাম। সে-ই আদি গঙ্গার ধারে।

কিন্তু, অতো কথা না বলে সংক্ষেপে প্রশ্ন করলাম—কেন বলুন ত ?

মহিলাটি পুনর্বার প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, আপনার নাম কি যদুগোপাল লাহিড়ী ?

এবার কিন্তু সত্যিই বিস্মিত হলাম আমি, বললাম—হ্যাঁ। কিন্তু, আপনাকে ত—

মৃদু একটু হাসলেন মহিলাটি বললেন—তাহলে আমি ঠিকই চিনেছি। বাসা সেই নেপাল ভট্টাচার্জি স্ট্রীটে, না কী—

বললাম—সে ত ছোটবেলার কথা। এখন থাকি আরও একটু দূরে। সা'নগরে। টালিগঞ্জের রাসবাড়ির পোলের কাছে।

বললেন—তাহলে ত আমাদেরই ওদিকে। আমাদের বাসা ত আজকাল সা'পুরে।

—সাপুর ?

—সেই নিউ আলিপুর ছাড়িয়ে, বেহালা যেতে গেলে যে পল্লীটা পথে পড়ে ? কিন্তু আমাকে এখনো চিনতে পারেন নি, না যদুদা ?

আমার বিস্মিত হওয়া দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে মহিলাটি মৃদু কণ্ঠে বলে উঠলেন—আমি পঙ্কি। সেইসব ছোট বেলাকার কথা। নেপাল ভট্টাচার্জি স্ট্রীটেই। মনে আছে ?

পঙ্কি ! মুহূর্তে চোখের সামনে অতীতের একটা চলমান দৃশ্যপট মেলে ধরল কে যেন।

ছোট বেলায়, সেই যখন আমরা আদি গঙ্গার ধারে নেপাল ভট্টাচার্জি লেনের বাসায় থাকি, তখন আমাদের পাড়ায়, একটি মাটির বাড়িতে একটি মেয়ে

মানুষ থাকত, তার নাম মনে নেই, বড়ো হ'য়ে তার নাম শুনলাম, পক্ষির মা। কারণ, পক্ষি ব'লে তার একটি মেয়ে ছিল। অবশ্য আমাদের যখন ষোলো-সতোর বছর বয়স, তখন থেকেই পক্ষির মার বাড়ি যাওয়া আমাদের নিষিদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল।

সেই পক্ষির মার মাটির বাড়ির ঘরখানা, যা আমরা ছোট বেলায় দেখেছিলাম, তার প্রধান আকর্ষণ ছিল, এক আলমারী-ভরা সাজানো পুতুল। ভারী সুন্দর ছিল সেই পুতুলগুলি। পক্ষি তখনো জন্মায় নি, ওর বাড়িতে ওর এক বুড়ী ঝি ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেতাম না। তাই পক্ষির মাকে জিজ্ঞাসা করতাম, ঐ পুতুলগুলি কে তোমায় দিয়েছে?

পক্ষির মা হেসে আমাকে কোলের কাছে টেনে নিতো দু'হাত বাড়িয়ে, আর কিছু বলতো না।

সেই বয়সের বিশেষ কিছু আজ মনেও নেই আমার। মনে আছে শুধু সেই তার ঝকঝকে আলমারীর কথা। ঠিক কবে থেকে যে ঐ মেয়ে মানুষটি পক্ষির মা বলে পাড়ার লোকের কাছে আখ্যাত হ'তে লাগল আজ মনে নেই, তবে পরে পক্ষি বলে যে গোলগাল ফুটফুটে একটি মেয়েকে কোলে নিয়ে সে তার দাওয়ায় বসে থাকত, এ ছবিটা মুদ্রিত হ'য়ে আছে মনে।

সেই পক্ষি বড়ো হলো, আমাদের সঙ্গে খেলতে আসত। আমাদের গলির মধ্যে তখন একটা ঝোপ-জঙ্গলে-ঘেরা ছোট্ট পুকুর ছিল। বেলা গড়িয়ে বিকেল প'ড়ে এলে সেই পুকুর থেকে হাঁস উঠিয়ে নেবার জন্য পুকুরের ধারে এসে দাঁড়াতো পক্ষি, ডাকত, আয়-আয়—চৈ-চৈ!

সেই পক্ষিকে নিয়ে পক্ষির মা যে একদিন কোথায় চলে গেল, তাও ঠিক বলতে পারব না। একদিন হঠাৎ-ই আমাদের চোখে পড়ল। সেই বয়সেই শাড়ী পরত পক্ষি, নাকে নোলক। দাদা বললেন, নোলক-পরা পক্ষি ত আর খেলতে আসছে না। কেন রে?

'নোলক পরা পক্ষি বাঁশের আগায় কঞ্চি' বলে পাড়ার ছেলেরা ওকে খ্যাপাতো। দাদাও খ্যাপাতো। আমি কিন্তু ছড়া কাটতাম না। সেটা বুঝে পক্ষি এসে কাছ ঘেঁষে দাঁড়াতো আমার। বলতো—ওরা ওরকম করলে ওদের সঙ্গে খেলব না। তোমার সঙ্গে শুধু খেলব, জানো যদুদা?

যাই হোক, দাদার সঙ্গে ওদের বাড়ির দিকে গেলাম। দেখি, বাড়ির দরজা-টরজা হাট ক'রে খোলা, আর একটা হিন্দুস্থানী দরওয়ান-গোছের লোক

খালি দাওয়ার ওপর হারিকেন জ্বালিয়ে মাদুরের ওপর ব'সে রামা হো গান ধরেছে। ঘরের ভিতর কিছুই নেই।

খোঁজ নিয়ে জানলাম, পঞ্চি নেই, পঞ্চির মা-ও নেই। বাড়িটা বিক্রী ক'রে দিয়ে পঞ্চির মা কোথায় যেন চ'লে গেছে।

গেছে ত গেছে, তারপর আর ওদের কথা কখনো তেমন মনে পড়েনি। দু একবার যা মনে পড়ত কিছুদিন পর্যন্ত, তা মাত্র একটি দিনের কথা। সেই পুকুরটার ধারে একদিন মাছ ধরব বলে ছিপ নিয়ে গেছি, পঞ্চি এসে বললে—একটা ধনুক বানাতে পারো যদু দা?

—কী হবে ধনুক দিয়ে?

—ঐ দেখ না কী করেছে?

—কে কী করেছে?

আমার হাত ধ'রে টানলো, বললে—এসো না ওদিকটায়।

গেলাম। দেখি, একটা হাঁসের গলার কাছটা ছিন্নভিন্ন করা। মরে প'ড়ে আছে হাঁসটা। পঞ্চি বললে আমাদের হাঁস। শেয়ালে ধ'রেছিল। তাড়া দিতেই ফেলে পালিয়েছে। মা কাঁদছে। বড়ো ভালো ছিল হাঁসটা। আমি মাকে বললাম, খবরদার কেঁদো না। ও শেয়ালকে আমি মেরে তবে ছাড়ব। তৈরী ক'রে দেবে একটা ধনুক?

বয়স তখন আমার ষোলো-সতেরো। ওদের বাড়ি যাওয়া আমাদের বারণ হয়ে গেছে। তাই, সেই পুকুর ধারে বসেই খুব হয়েছিল আমাদের ধনুক তৈরী করার ধান্দা। ধনুক তৈরী হলো, কিন্তু শেয়ালের আর দেখা পাওয়া গেল না। অবশ্য খুব বেশীদিন খুঁজতে হয় নি, এরই কিছুদিন পরে আমাদের সংসারে ঘটেছিল সেই চরম দুর্ঘটনা। দাদার আত্মহত্যা। সেই শেয়াল-কামড়ানো হাঁসটার মতোই ছিন্নভিন্ন হ'য়ে পড়েছিল দাদার শরীরটা।

সেই দাদার কথাও ত এখন আমরা ভুলে গেছি। এর ওপর পঞ্চিদের কথাও যে ভুলে যাব, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সমস্ত জীবনটাই ত আমাদের এক পথযাত্রার ইতিহাস,—কতো লোক কাছে আসে, কতো লোক চ'লে যায়, কতো মানুষের সঙ্গেই না দেখা হয় আসা-যাওয়ার পথের ধারে, ক'জনকেই বা আমরা মনে করে রাখি, বা রাখতে পারি?

ভালো ক'রে তাকালাম মহিলাটির দিকে। সেই নোলক-পরা ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েটির সঙ্গে মনে মনে মিল খুঁজতে লাগলাম। এতক্ষণ পরে মনে হ'লে, চিনে নেবার মত মিল সত্যিই খুঁজে পাওয়া যায়! ঠোঁট টিপে হাসির

ভঙ্গিটুকু ঠিক তেমনই আছে। কপালটা তেমনি ছোট; আর, চিবুকের কাছটাও আছে তেমনি কচি, মেদ বাহুল্যে ভরাট হ'য়ে যায় নি।

অস্ফুট কণ্ঠে শুধু বললাম—চিনেছি।

সে বললে, এদিকে সরে এসো দেখি? লোকের অযথা কৌতূহল বাড়িয়ে লাভ নেই। কেমন ক'রে তাকাচ্ছে লোকগুলি, দেখছ না? চশমার ভিতর থেকে চোখগুলো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

অতএব, মোড়টা ছাড়িয়ে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম দু'জনে। ভীড় বাঁচিয়ে, হাঁটতে হাঁটতে একেবারে ওয়েলিংটন স্কোয়ার।

চলতে চলতে আমার সব কথাই ও জেনে নিলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। দাদার কথা ত ওরা জেনেই গিয়েছিল, জানত না বাবার কথা, মায়ের কথা, আমার বিয়ের কথা, মধুর প্রবাস-বাসের কথা। বোনের চাবদহে বিয়ে হওয়ার কথাটা অবশ্য জানত। বললে—এখন কী করছ যদুদা?

কী জানি, কোনো কথা লুকোতে ইচ্ছা করল না। বলে ফেললাম—কী আর করব। ভেরেণ্ডা ভাজছি। কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে কোথায় চাকরী কোথায় চাকরী করে টই-টই ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ও কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল কথাটা শুনে। কী যেন তন্ময় হ'য়ে ভাবছে। তারপরে, হঠাৎ একসময় যেন জেগে উঠল স্বপ্ন থেকে, বললে—এখন আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ি যাবে যদুদা? তোমাকে দেখে মা খুব খুশী হবে।

একটু ইতস্ততঃ করছি দেখে, মুখ টিপে হাসল। সেই ওর ছোটবেলাকার হাসির ভঙ্গি। বললে—চলোই না। ইচ্ছে করলে মা তোমাকে একটা চাকরীও করে দিতে পারে।

—চাকরী!

ও আবার হাসল।

খুব যে একটা আস্থা স্থাপন করলাম ওর কথায়, তা নয়। তবু, মনে হ'লো, যাওয়াই যাক্, অন্ততঃ সারাটা দিন উপোসে-কাটানোর পর বরাতে একটু জলখাবার জুটলেও জুটতে পারে। মুহূর্তে স্ত্রীর শুকনো মুখ, আর ছেলেমেয়েদের বিবর্ণ চেহারা ভেসে উঠল চোখের সামনে। সেই কোন্ সকালে উঠে বেরিয়ে এসেছি বাড়ি থেকে, উনুনে আজ আগুন দেওয়া হয়েছে কিনা কে জানে। ছেলেমেয়েদের পেটে দু'মুঠো মুড়ি প'ড়েছে ত? কে জানে!

মনে হ'লো, তবু যাই পক্কির সঙ্গে। অন্ততঃ চাইলে দুটো টাকা ধারও ত পেতে পারব।

সুতরাং, যেতে হ'লো সা'পুরে। বুড়ো শিবতলাটা ছাড়িয়ে রাস্তাটা যেখানে বাঁদিকে বেঁকে গেছে, সেদিকে না গিয়ে, সোজা পথটা ধরতে হয়। সেই পথে কিছুদূর গেলেই ওদের বাড়ি। বাড়িটা একতলাই বটে। দুখানি ঘর, মাথায় টিনের চাল। পাশেই একটু খালি জমি পড়ে আছে, ফাঁকা।

পক্ষির মা বললে, ঐ জমিটুকুর জন্যই ত এ বাড়ি পঁয়তাল্লিশ টাকায় ভাড়া নেওয়া হয়েছে বাবা।

আমি চুপ ক'রে ব'সে আছি দেখে, পক্ষির মা আবার বললে—পক্ষি ঐ জমিটুকু কিনেছে, বুঝলে বাবা? এখন, তোমার বাপ-মার আশীর্বাদে কোন রকমে একটি মাথা গুঁজবার ঠাঁই গ'ড়ে তুলতে পারলে মা শেতলার পুজো দেব।

ধীরে ধীরে সবই জানলাম ওদের। এই যে ছিপ্‌ছিপে গড়নের রোগা প্রৌঢ়া মহিলাটি কথা বলে চ'লেছে আমার সঙ্গে, এ-ই পক্ষির মা। আমাকে প্রথম দেখে আমার পরিচয় পেয়েই যাকে বলে, আনন্দে আত্মহারা! তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে পরণের কাপড়টা বদলে, গলায় আঁচল দিয়ে আমার পায়ে ঢিপ্‌ করে প্রণাম করলো। আমি অপ্রস্তুত হ'য়ে ব'লে উঠলাম—একী করছেন! আপনি বয়সে আমার মায়ের মতো।

জিভ কেটে বললে—কী বলছ বাবা। কেউটে সাপের বাচ্চা। বামুন মানুষ, পেন্নামটা করব না? সত্যি কথা বলতে দোষ নেই বাবা, আমরা সেকেলে মানুষ, তায় জাতে ছোট, দেবতা আর বামুনকে মেনে চলি।

তাকিয়ে দেখলাম। গায়ের রঙ ছাড়া মেয়ের সঙ্গে আর কোনো মিল নেই চেহারায়। মাথার সামনের দিকে চুল উঠে উঠে কপালটা চওড়া হয়ে গেছে, মুখের চামড়া কুঞ্চিত হয়ে গেছে, চুলেও ধরেছে যথেষ্ট পাক। গলায় কন্ঠির মালা, পরণে সরু পাড় সাদা ধুতি। হাতে দুগাছি ক'রে সোনার চুড়ি, গলায় সরু সোনার হার, পানের আকারের একটি লকেট ঝোলানো। বললে—চীৎপুরে আমার মস্ত তেতলা বাড়ি ছিল বাবা, তিনকাঠা ছ'ছটাক জমির ওপরে। তোমাকে বলবো কী, তুমি আমাদের আপন লোক, সেই কতো দেখেছি, তোমার দাদা ওভাবে গেল, সে-ও ত দেখেছি এই দুটো পোড়া চোখ দিয়ে।

বলতে-বলতে গলাটা একটু ধরে এলো, একটুক্ষণ চুপ করে থেকে, সামলে নিয়ে তারপরে বললে—বাবু যদ্দিন বেঁচে ছিলেন, ও-বাড়ি ভাড়াটাড়া দিয়ে ভোগ-দখল আমিই ক'রে এসেছি চিরটা কাল। সবাই জানে, ও-বাড়িটা

আমাকেই দিয়ে গেছেন বাবু। কতোবার কথাটা বলেওছি। বলেছি, বাবু লেখাপড়াটা ক'রে দিয়ে যাও। বাবু বলতো—দেবো গো দেবো। আমি কি এক্ষুণি ম'রে যাচ্ছি যে, তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছো। তা' আমারই পোড়াকপাল, অকালেই চ'লে গেল।

এখানেও গলাটা আবার ধ'রে এলো পক্ষির মার। বললে—মরবার বয়স কি তার হয়েছিল বাবা! আমারই ভাগ্য। ছাই পাঁশ গিলে গিলে পেট প'চে উঠেছিল।

এই বাবু যে কে, পক্ষির বাবা কিনা, তা-ও আমার জানা ছিল না। জিজ্ঞাসাও করিনি সেদিন। করবার মতো কৌতূহলও আমার ছিল না ওদের সম্বন্ধে। পক্ষির মা কিন্তু চোখে আঁচল দিয়ে কিছুক্ষণ কাঁদলে আমার সামনে। পক্ষি তখন ঘরে ছিল না, পাশের ঘরে বুঝি বেশ পরিবর্তন করছিল।

একটু সামলে নিয়ে পক্ষির মা বললে—সেই বাড়ি, বুঝলে বাবা, বাবুর ত ছেলেপুলে ছিল না, বিধবা বৌ আর ভাইপোরা মিলে মামলা লাগিয়ে আমাকে ভিটেছাড়া করে ছাড়লে। অথচ, ঐ ওপরের তিনি জানেন— বলে দুটি হাত জোড় ক'রে কপালের ওপর রাখল পক্ষির মা কয়েক মুহূর্ত। তারপরে বললে—বাবুর শেষ সময়টা যা করবার এই আমিই করেছি। দুটি হাত দিয়ে সেবা করেছি, জানলে বাবা! নিজের টাকাপয়সা খরচা ক'রে ডাক্তার ডাকরে, বৈদ্যি ডাকরে, হেন করোরে, তেন করোরে—সব করেছি এই একা। তখন কোথায় ছিল বৌ আর ভাইপোরা! এমনি নেমকহারাম, আমায় বাড়ি ছাড়া ক'রে ছাড়লে! তোমায় বলব কী বাবা, মামলায় আমার খরচাও হয়েছে কি কম? উকিলপত্তরের খরচা নেই? কোর্টঘরের খরচা নেই?

প্রসঙ্গ কিন্তু এখানে ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হ'লো। পক্ষি এলো ফিরে। ছাই রঙের সাধারণ একখানা শাড়ী পরেছে, মাথার একরাশ চুল পিঠময় ছড়ানো। বললে—তুমি ওসব থামাও দেখি মা? বকবকানি পেলে আর কিছু চাও না।

—ওমা, বাইরের লোকের কাছে বক্‌বক্‌ করছি! যদু আমাদের কতো আপন লোক!

পক্ষি একটু হাসল বোধ হয়, কিন্তু সে হাসি গোপন সে ক'রে মার দিকে তাকালো, বললে—এখন আপন লোকটির জন্য মোড়ের মাথা থেকে একটু মিষ্টি এনে দাও। ফিরে এসো, তখন ওই আপন লোকটি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা তোমাকে বলব'খন।

একটু যেন বিস্মিত হলো পঙ্কির মা, অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করলো মেয়ের দিকে তাকিয়ে—কী কথা ?

মার ভঙ্গি দেখে এবার স্পষ্টই হেসে ফেলল পঙ্কি, বললে—আকাশ থেকে প'ড়ো না। এমন কিছু ভয়ানক কথা নয়।

—আহা, কী কথা, সেটা বলবি ত ?

পঙ্কি বললে—তোমার ওই আপন লোকটির চাকরী নেই। চাকরী ক'রে দিতে হবে।

—আমি!—পঙ্কির মার বিস্ময়ের সীমা নেই—আমি চাকরী করে দেবো কী রে!

পঙ্কি বললে—পারলে তুমিই পারবে। আমি পারব না। এসো দোকান থেকে ঘুরে, আমি সব বলছি।

আমি একটু অপ্রস্তুত বোধ করে কী যেন বলতে গিয়েছিলাম, পঙ্কি প্রায় ধমকেই উঠল বলা যায়। বললে—মায়ে-ঝিয়ে কথা হচ্ছে, তুমি বাধা দিচ্ছ কেন ?

তারপরে মায়ের দিকে ফিরে—যাও ত মা!

মা চলে গেল। পঙ্কি আমার সামনাসামনি জানালা আশ্রয় ক'রে দাঁড়ালো। বললে—পঙ্কি পঙ্কি ক'রে যেখানে-সেখানে ডেকোনা যদুদা, আমার নাম—শীলা। শীলা রায়। ওই নামেই সবলে জানে।

সকলে জানে—মানে ? কথাটা ঠিক মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারি নি, তবে, আমার চোখে বোধ হয় এই জিজ্ঞাসাই তখন ফুটে উঠেছিল। পঙ্কি সেটা বুঝেই বললে—অ্যামেচার থিয়েটার ক্লাবগুলিতে প্লে করে বেড়াই। অভিনেত্রী, বুঝলে ?

বুঝলাম। আজকাল অফিসে অফিসেও থিয়েটারের ক্লাব হয়েছে, টাকা নিয়ে সেখানে বাইরের মেয়েরা অভিনয় করে। অফিস-কর্তৃপক্ষ এই থিয়েটার-প্রয়াসকে বেশ প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন সাধারণতঃ। কর্মচারীরা রাজনীতি থেকে সরে যে ক্রমশ অভিনয় নিয়ে মেতে উঠ্ছে, এতে তারা আনন্দিত ছাড়া দুঃখিত নন। রাজনীতি মানেই বেতন বৃদ্ধির দাবী, বোনাসের দাবী, ছাঁটাই কর্মচারীর পুর্ববহালের দাবী ইত্যাদি। এ সমস্ত ব্যাপার থেকে ওদের মন সরে গিয়ে অভিনয় নিয়ে মেতে উঠুক, এটা পুঁজিবাদী মনিবরা চাইবেন না কেন ? 'সব্যসাচী'র ভূমিকা নিয়ে অধীরবাবু আর রতনবাবু শেষ পর্যন্ত হাতাহাতি লাগিয়ে দিক, বিশেষ এক প্রবেশ অথবা প্রস্থান নিয়ে দলের

মধ্যে গর্ডন ক্রেগ আর ষ্ট্যানিস্লাভস্কীর উল্লেখ উঠে চুলচেরা আর্টের তর্ক বসে যাক, তাতে কর্তৃপক্ষের উল্লাসই বৰ্দ্ধিত হবে, উদ্বেগ বাড়বে না।।

পঙ্কি বললে—এটাই আমার আসল উপার্জন। তবে মাঝে মাঝে সিনেমাতেও চান্স পাই।

—কীরকম?

বললে—এই ছোটখাট ভূমিকা আর কী! কখনো দু তিনদিন, কখনো সাত আট দিনের পর্যন্ত কাজ থাকে। প্রতিটি স্যুটিং তারিখের জন্য পাই তিরিশ টাকা। দৈনিক তিরিশ টাকা, বুঝলে? কখনো সখনো চল্লিশও পাওয়া যায়। একবার এক মারোয়াড়ী প্রডিউসারের বইতে পঞ্চাশও পেয়েছিলাম।

এই ধরণের সব বাক্যালাপ চলছে, এমন সময় ফিরে এলো পঙ্কির মা।

ওরা দুজনে ভিতরে গেছে। কিন্তু, পরক্ষণেই পঙ্কির মা চলে এলো এঘরে। বললে—সভাই তুমি আমাদের আপন লোক বাবা। সেই ছোট বেলায় দেখেছি। তোমাকে দেখে সেদিনকার সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তুমি এলে, বড়ো আনন্দ পেলাম বাবা।

বললাম—আচ্ছা? বিয়ে দাওনি মেয়ের?

—বিয়ে! পঙ্কির মার মুখের ওপর দিয়ে মুহূর্তের জন্য একটা ম্লান ছায়া সরে গেল যেন। একটু যেন ইতস্ততঃ করল। তারপরে ম্লান হেসে বলেই ফেলল কথাটা শেষ পর্যন্ত। বললে—আমাদের ঘরে আবার বিয়ে! সে হয়েছিল ওর ছোটবেলায়, চালকুমড়োর সঙ্গে। বুঝলে না বাবা? মেয়ে বড়ো হলে, যদি পাত্র তাকে বরে আনবার না জোটে। দিয়ে রাখি। তুমি বললে পেত্যয় যাবে না, মানুষ না পেলে, শেষকালে তারও বরাবরীর সঙ্গে। তবে, আজকাল অবশ্যি এসব পাট উঠে গেছে। আমরা সেকেলে মানুষ, আমরা বাবা জাতেও নীচু, ওসব আচার-বিচার না মেনে চলতে পারলে বুক ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করতে থাকে ভয়ে। বিশেষ করে, মা শেতলার ভয়টা আজও করি। মার কৃপা হয়ে যদি মুখখানা কুচ্ছিৎ হয়ে যায়। তাহলে আর রইল কী! এই দেখ না, পঙ্কি ত এত ঘোরাঘুরি করে বেড়ায়, কখনো ভুলেও চালকুমড়ো খাবে না। শুনবে তবে একটা ঘটনা?

সাগ্রহে বলে উঠলাম,—শুনি?

পঙ্কির মা বললে—একবার এক থিয়েটারের দল দিল্লী যাচ্ছে থিয়েটার করতে—কিসের যেন বায়না নিয়ে। ওরা পঙ্কিকে নিয়ে গেল সঙ্গে। তা'

দিয়েছিল, একশোটি টাকা দিয়েছিল, আসা-যাওয়া থাকা-খাওয়ার খরচ-খরচাদি বাদ দিয়ে। মেয়ে সেবার ফিরতি পথে তিথি ক'রে এলো মথুরা-বৃন্দাবন। বললাম—হ্যাঁ রে, তিথি করলি, নিজের মায়ের কথাটা মনেও পড়ল না? তা' বললে, দলের সঙ্গে গেছি, কাজ করতে গেছি, তোমায় ওরা নেবে কেন সঙ্গে? সত্যি কথাই। ভেবে দেখলাম, পঞ্চি অন্যায্য কথা কিছুই বলেনি। বললাম, হ্যাঁ মা, বৃন্দাবনের সোনার তালগাছ দেখলি? মেয়ে সেসব কথার ধার দিয়েও গেল না। দিলে হাতে একটা রঙীন ছাপা কাগজ। বললে, এই নাও একশো টাকার চেক। এরা নগদ না দিয়ে চেক দিয়েছে। ওটা ভাঙিয়ে আনতে হবে ব্যাঙ্ক্ থেকে। ও বললে, সবাই নগদে কারবার করে, এদেরই কারবার চেক-এ। চেক পাওয়া মেয়ের ভাগ্যে সেই প্রথম। তা' যাকগে, যা বলেছিলুম বাবা। সেবার পশ্চিম থেকে পঞ্চি নিয়ে এসেছিল এক বড়ো ঠোঙার এক ঠোঙা মেঠাই। বললে, এর নাম পেটা। এলাহাবাদ স্টেশন থেকে কিনেছি। তুমি খাও। বললাম, তুই খাবি নি? তা বললে, ও মেঠাই 'অমুক' দিয়ে তৈরি, ও' আমি খাবো না। বুঝলুম, মেঠাই চালকুমড়ো দিয়ে তৈরী। মেয়ে ত আমার চালকুমড়োর নাম মুখেও আনবে না। বললুম তাহ'লে তুই এ'মেঠাই আনতে গেলি কেন? মেয়ে বললে, ভালো মেঠাই নতুন ধরণের জিনিষ—দলের সবাই নিচ্ছে, আমিও নিলুম। তুমি খাও না, তোমার খেতে ক্ষতি কী? আমি জিভ কেটে বললুম, তুই মেয়ে হ'য়ে মুখে তুললি নি, আমি মা হ'য়ে পেটে পুরব? বলব কী বাবা, সব মেঠাই আমি পাড়ায় বিলিয়ে দিলুম। শাউড়ী হ'য়ে জামাই খাবো কী গো? মেয়ের অখণ্ড এয়োতির 'খণ্ডন' করব?

কথাটার ধরণে হাসি পেলেও, সে হাসি গোপন ক'রে, পঞ্চির মার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম কয়েক মুহূর্ত। সে দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটে থাকবে হয়ত। আসলে সত্যিই ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি নি।

পঞ্চির মা নিজেই বুঝিয়ে দিলে পরমুহূর্তে। গলার স্বর একটু নামিয়ে বললে—চালকুমড়ার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলুম কেন জানো? তরকারী ত কখনো মরবে না? আমার মেয়ের এয়োতিও ঘুচবে না, যতদিন পৃথিবীতে চালকুমড়ো আছে।

এবার স্পষ্টতই ফেললাম হেসে।

পঞ্চির মার গাম্ভীর্য কিন্তু অটুট। বললে—হাসছ বাবা? এ আমাদের বিশ্বাস। মা-মাসীদের কাছ থেকে বরাবর শুনে এসেছি। হাল আমলে দেখছি ত অনেক, পঞ্চির মতো কতো মেয়েই না আজকাল থিয়েটার ক'রে বেড়ায়,

তাদেব কতজনের কতরকম ব্যাপার! তার থেকে, আমরা নীচু জাতের মেয়ে, আমাদের ঐ পুবানো বিশ্বাসটা অনেক ভালো।

এবাবও মেয়ে আমাকে উদ্ধাব কবলে তাব মায়ের হাত থেকে। সে রান্নাঘব থেকে চা তৈবী কবে নিয়ে এসে বাখলো আমাব সামনেব টেবিলে। বললে, খাও যদুদা। মা বুঝি আবার বকব বকব শুরু কবেছে?

—আহা, বকব-বকব দেখলি কোথায়? বলতে বলতে মেঝে থেকে উঠে দাঁডালো পক্ষির মা, বললে—যদু কি আমাদেব পব? কত ছোট দেখেছি ওকে! বাড়ীতে কতো আসত খেলা কবতে। বড়ো সখ ছিল পুতুল নেবাব, একটা পুতুলও দেই নি। সত্যি বাবা, প্রাণে ধবে একটা পুতুলও কাউকে দিতে পাবতুম না। কোথায় গেল সেই সব পুতুল! একে একে সব ভেঙে গেল।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলেই অন্য ঘবেব দিকে চলে যাচ্ছিল পক্ষিব মা। পক্ষি পিছন থেকে ডেকে বললে—ও ঘবে বসে একটা কাজ কবো দেখি। ধাডামশাইকে একটা চিঠি লেখো যদুদাব নাম কবে।

—ধাডামশাই!

—হ্যাঁ গো, আকাশ থেকে পড়লে যে! পক্ষি বললে—গোকুলচন্দ্র ধাডামশাই, সেই পোস্তাব ধাব দোকান।

—বুঝেছি। কিন্তু তাকে চিঠি লিখলে—

বাধা দিয়ে পাক্ষি বললে—ধাডামশাইব মস্ত দোকান। হিসেব লেখা টেখাব জন্য ত লোকেব দবকাব হতে পাবে। লেখো না চিঠি যদুদাব নাম কবে। যদুদা তিনটে পাশ দিয়েছে লিখতে ভুলো না যেন।

—তা লিখছি। কিন্তু ওতে কী কাজ হবে? দেখা নেই সাক্ষাৎ নেই সেত এক যুগ। চিৎপুবেব বাড়ীটাও গেল, সেও গেল।

হয়েছে, আব বকবক্ কবতে হবে না। পক্ষি বললে, লেখো গিয়ে শিগ্গিব, ওঘবেব টেবিলে কাগজও আছে, কলমও আছে।

আব বাক্যব্যয় না কবে ভিতবে চলে গেল পক্ষিব মা। আমি একটু আশ্চর্য হয়েই প্রশ্ন কবে বসলাম—লিখতে পারে তোমাব মা?

হেসে উঠল পক্ষি। বললে—বেশ বলেছ! পডতে লিখতে আব বলতে না শিখলে আমাদেব চলে! আমবা ত পডিই। মা-ও এককালে পডত খুব। কতো নাটক-নভেল ছিল বাড়িতে। তা, হ্যাঁ যদুদা, তোমাব আপত্তি নেই ত, মশলা-পাতিব ব্যবসায়ে কাজ কবতে? ধাডামশাইয়েব দোকান মশলা-পাতিব, সেই পোস্তাতে।

—আপত্তি! ম্লান একটু হেসে বললাম, বরং বেঁচে যাবো।

পঙ্কি বললে—ধাড়ামশাই আমাকেও চিনবেন। ওর মেজো ছেলেও চিনবে, তবে পঙ্কি নামে চিনবে কিনা জানি না, শীলা নামে চিনবে।

বললাম—তোমার ভালো নাম শীলা?

মুখ টিপে হেসে শীলা বললে—হ্যাঁ। শীলা রায়। কেমন ভালো না নামটা?

—ভালো।

পঙ্কি তখনো মুচকি মুচকি হাসছে, বললে—পাঁচ যায়গায় ঘুরতে গেলে পোষাকী একটা নাম চাই ত? পঙ্কি রায় বললে কে আমায় কাজ দিচ্ছে বলো?

ওদের অন্তরঙ্গ কথা-বলার ধরণই হয়ত আমার মনে বিভ্রম জাগিয়ে তুলেছিল, নইলে হঠাৎ-ই আমি প্রশ্ন করে ফেললাম কেন—আচ্ছা, তোমরা বুঝি রায়?

শীলা বললে—ওটা বানানো না, ওটা খাঁটি। আমার বাবার উপাধি রায়।

বললাম—কায়স্থ?

—না, ব্রাহ্মণ।

এবার অবাক হবার পালা আমার, বললাম—তাহলে তোমার মা ছোট জাত বলে পরিচয় দেয় কেন?

—কী মুসকিল! আমরা যে ছোট জাত।

—তাহলে?

আমার প্রশ্নের ধরণ দেখে শীলা এবার হেসে ফেলল, বলল—আমায় কী ভেবে নিচ্ছ তুমি? এখনো বুঝতে পারোনি, আমরা কী? তোমার কাছে লুকাবো কেন? অন্য কাউকে বলো না, তুমিও কখনো বোলো না কাউকে, আর বললেই বা কী, অতো ঢাকাঢাকি করাও ভালো নয়, আমার মা ত বাবার বিয়ে-করা বউ ছিল না। আমি হয়েছি, আমার বাবাও সরে পড়েছেন, আর আসেন নি। মা দিনকতক তার খোঁজখবর রাখত, তারপরে আর কিছু জানবার চেষ্টা করত না। খালি মরেছেন খবরটা পেয়ে আমাকে গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে চান করিয়ে দিলো, নিজেও চান করে এলো। কোন গঙ্গায় জানো? আমাদের ছোটবেলার সেই আদি গঙ্গা। আদি গঙ্গার সেই আমাদের ছোটবেলাকার ঘাটেই চান করতে গিয়েছিলাম আমরা।

বললাম—তোমার বাবাকে তুমি দেখ নি?

—না। তবে নাম-ধাম জানতাম। অর্থাৎ যারা আমার ভাই, তারা সব এখন সে পাড়ার মাতব্বর লোক, পয়সাওয়ালা লোক।

—যাও না তাদের কাছে ?

শীলা ঠোঁট ওলটালো, বলল—ছিঃ! মা-ও কখনো যায় নি, আমিও না। কী করতে যাবো? কে ওরা আমাদের ?

শীলার পিতৃকুল নিয়ে সেইদিনই মাত্র এইটুকু আলোচনা হয়েছিল, আর কখনো হয়নি, কোনো প্রসঙ্গেই এসে পড়েনি ওর পিতৃপরিচয়ের কথা।

ঘরে এসে পড়ল পঙ্কির মা, বললে—এই চিঠি লিখলুম বাছা, দেখ।

পঙ্কি চিঠিটা হাতে নিয়ে প'ড়ে বললে—ঠিক আছে। দাঁড়াও, আমিও একটু লিখে দেই। বলে, কলম নিয়ে এসে খস্-খস্ ক'রে ঐ চিঠির উলটো পৃষ্ঠাতেই কী যেন লিখল, তারপরে লেখাটা শেষ ক'রে আমার দিকে এগিয়ে দিতে-দিতে বললো— দেখতো, ভাষা টাষা ঠিক হয়েছে কি না ?

পড়ে নিয়ে উত্তর দিলাম—ঠিক হয়েছে।

খুব একটা আস্থা ছিল না, তবু কী অদ্ভুত আশ্চর্যের কথা, ওদের চিঠিতে সত্যিই কাজ হলো। কতো বড়ো-বড়ো লোকের চিঠি নিয়ে কতো বড়ো-বড়ো লোকের কাছে গেছি, হেঁটে-হেঁটে জুতোর সুখতলা ছেঁড়াই সার হয়েছে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু, এখানে এসে কাজ হয়ে গেল বলা যায় এক কথায়।

পোস্তায় ওঁদের মশলাপাতির ব্যবসা, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড আর ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের সংযোগ-স্থলের আশেপাশে যে-সব মশলা-পাতি হলুদ-লঙ্কার বস্তা সাজানো দোকান আর গুদাম দেখা যায়, তারই একটি দোকান হচ্ছে ধাড়ামশাইদের। শীলার দেওয়া ঠিকানা মিলিয়ে-মিলিয়ে কাছে এসে দাঁড়ালাম, 'ধাড়া এণ্ড্ সন্স'—সাইনবোর্ডে লেখা।

—কি চাই মশাইয়ের ?

একটু চমকে তাকিয়ে দেখি, পর পর খোলা যে তিন-চারটি দরজা ছিল দোকানের, তার একটির পাল্লা ঘেঁষে নীচু তক্তপোষ পাতা গদির ওপরে ব'সে আছেন প্রায় আমারই বয়সী একটি লোক, খাটো ধুতি আর ফতুয়া পরা, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে নমস্কার জানিয়ে বললাম—গোকুলচন্দ্র ধাড়া মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আপনি কি—

লোকটি বললে—আমি তাঁরই ছেলে। কী চাই বলুন ?

—একটা চিঠি এনেছি তাঁর।

চিঠিটা তাঁর হাতে দিতে তিনি খামটা উল্‌টে-পাল্‌টে দেখে নিয়ে ফেরৎ

দিলেন আমার হাতে, বললেন—বাবা ত আজ দোকানে আসবেন না। দোকানে আসেন তিনি বুধবার-বুধবার। আপনি বরং বাড়িতে যান।

একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললাম—বাড়ির ঠিকানাটা?

—চিঠিতে নেই, না?

—না।

বললেন, শোভাবাজার অঞ্চলের একটি রাস্তা আর বাড়ির নম্বর।

গেলাম খুঁজে খুঁজে। কিন্তু, বাড়িতে তখন তিনি নেই। চিঠি নিয়ে সেদিন যখন খোঁজাখুঁজি করছিলাম, তখন সময়টা ছিল বিকেলবেলা। সারাটি দিন 'যাব কি যাব না'—করতে করতে বিকেল হ'য়ে গিয়েছিল বেরুতে। আসল কথা, ওদের চিঠিতে যে আমার চাকরী হ'তে পারে, এ আমার স্বপ্নেরও বাইরে ছিল।

একটা গলির মোড় পেরিয়ে দু'তিনখানা বাড়ির পরেই খুঁজে পেলাম বাড়িটা। মাঝারী পুরাণো ধরণের, দোতলা বাড়ি, রাস্তার ধারে উঁচু রকের ওপরে থাম-বসানো, খড়খড়ি দেওয়া জানালা, জানালার ওপরে লালনীল সব রঙীন কাঁচ ছিল বোঝা যাচ্ছে, এখন কোথাও বা কাঁচ আছে, কোথাও নেই, তার বদলে কাঠের টুকরো বসানো। থামের ওপরের ফাঁকগুলিতে পায়রার দল ব'সে আছে, চলাফেরা করছে, বক্‌বকম্ করছে।

বড়ো দরজাটারর কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছি, কাকে ডাকব, কী নামে ডাকব, তাই একটু ভেবে নিচ্ছি, এমন সময় দেখি ধবধবে কোঁচানো ধুতি আর গিলে-করা পাঞ্জাবী পরা, মাথার কুচকুচে কালো চুলে বাহারে টেরি কাটা এক ভদ্রলোক বেরিয়ে আসছেন।

ভদ্রলোকের টেরি-কাটা চুল কপালের ওপর দিয়ে যেভাবে তাঁর ডান ভ্রূর কাছ থেকে বেঁকে গেছে, তাই দেখে আমার কোনো এক বাবুয়ানীর গল্প মনে পড়ে গিয়েছিল। কে একটি বাবু-লোক নাকি আধুলি-সিকি-আধলা সব কপালে বসিয়ে বসিয়ে তার মাপে চুলের কেয়ারী তৈরী করতেন, আর তাঁর এই কেশপ্রসাধনেই নাকি সময় লাগত কম পক্ষে একটি ঘণ্টা। জানিনা, এর কেশ-কলাপ প্রস্তুতিতে সময় কতো লাগে। ভদ্রলোকের দিকে অগ্রসর হ'য়ে নমস্কার জানালাম।

ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে বললেন—কী চাই?

—গোকুলচন্দ্র ধাড়ামশাই আছেন?

—না। তাঁর তো এসময় এখানে থাকবার কথাও নয়। কোত্থেকে আসছেন?

বললাম।

তিনি বললেন—চীৎপুরে যান, দেখা পাবেন।

'চীৎপুরে যান' কথাটা দিয়ে তিনি কী বোঝাতে চাইলেন, তা সঠিক বোধগম্য না হওয়ায় একটু বিস্মিত হয়েই বলে উঠলাম—আজ্ঞে?

বললেন—যাত্রা পার্টির উমেদার তো? ওখানে যান, খোঁজ পাবেন। বাড়িতে ওসব ব্যাপার নিয়ে কারুর সঙ্গে তিনি দেখাও করেন না।

তখনো অবাক হ'য়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন, বললেন—কী হলো? আপার চীৎপুর যে যাত্রার দলের সব আড্ডা, তাতো জানা আছে, না কী? গিয়ে বলবেন, 'দি নিউ সরস্বতী অপেরা পার্টি' কোনটা? সবাই দেখিয়ে দেবে। তাছাড়া, ও পাড়ায় বাবার নাম বললেই বা চিনবে না কে?

মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল—আজ্ঞে, বাবা—

স্পষ্টতই বিরক্তি ফুটে উঠলো ভদ্রালোকের মুখের রেখায়, বললেন—যাঁকে খুঁজছেন, তিনি আমার বাবা। ওঃ! আচ্ছা মুসকিল! সকাল নেই বিকেল নেই বাবার কাছে উমেদারী করতে লোক আসছে তো আসছেই! এত বলি, বাবা ঝামেলা হঠাও—

গজগজ করতে করতে ভদ্রলোক চ'লে গেলেন। আর আমি দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। 'নিউ সরস্বতী অপেরা'—'চীৎপুর'—আমার মাথায় কিছুই ঢুকছিল না যেন।

সেদিন আমি বিফলমনোরথ হয়ে ফিরেই আসতাম, কিন্তু সব মিলিয়ে বিশেষ কৌতূহলী ক'রে তুলল আমাকে। মনে হ'লো, দেখাই যাক্ না, ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায়। তাই পায়ে-পায়ে 'চীৎপুরে' গিয়ে খুঁজে বার করেছিলাম 'নিউ সরস্বতী'কে, দেখা ক'রেছিলাম গোকুলবাবুর সঙ্গে। খাটো-পায়া তক্তাপোষের ওপর সাদা ধবধবে চাদর আর তাকিয়া পাতা, তাতে হেলান দিয়ে ব'সে, মুখে সট্‌কার নল লাগিয়ে তামাক সেবন করছিলেন গোকুলবাবু। গায়ে একটা লংক্লথের ঝোলা-হাতা আধময়লা পাঞ্জাবী, গলায় কণ্ঠি, মুখখানি শ্মশ্রুগুম্ফবর্জিত। রঙ্‌ হয়ত ফর্সাই ছিল এককালে, এখন তামাটে হয়ে গেছে, গালের দু'পাশে কালো মেচেতার দাগ বেশ স্পষ্ট, মাথার চুল সাদা-কালোয় মেশানো, ঠিক কদম ছাঁট নয়, একটু বড়ো-বড়ো। ওঁর পায়ের কাছে, একটি ছেলে, বছর বারো-তেরো বয়সের হবে, ওঁর পদ সেবা করছিল। আর ওঁর সামনে মেঝের ওপর বসে একটি লোক হাত-পা নেড়ে কী যেন বলছিল ওঁকে।

আমাকে একটি ভৃত্য-গোছের লোক দোতলায় ওঁর ঘরের দরজা পর্যন্ত

পৌঁছে দিয়ে চ'লে গেছে। আমি ওঁর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেও কেমন যেন অপ্রতিভের মতো স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি কয়েক মুহূর্ত। ওঁদেরও গল্পে পড়েছে বাধা, সাদা দেয়ালের একস্থানে নতুন-দেওয়া বসুধারার তিনটি রক্তিম ধারার ওপর আমার দৃষ্টি গিয়ে ফিরে এসেছে ওঁর মুখের দিকে। উনি মুখ থেকে নলটা সরিয়ে একটু সোজা হ'য়ে উঠে বসেছেন, বললেন—কী চাই আপনার?

বললাম আমার যা বক্তব্য।

উনি সব শুনে চিঠিটা হাতে নিয়ে খামটা ছিড়ে ফেলে পড়তে লাগলেন। তারপরে সেই ছেলেটি আর লোকটির দিকে মুখ তুলে বললেন—এই, তোরা একটু বাইরে যা তো।

ওরা চলে গেল। উনি বললেন—বসুন।

জড়োসড়ো হ'য়ে বসলাম খাটের একপাশে। উনি কিছুক্ষণ ধ'রে নীরবেই পর্যবেক্ষণ করলেন আমাকে, বললেন—তিনটে পাশ আপনি?

বিনীত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে জানালাম—হ্যাঁ।

বললেন—বহুদিন পঞ্চির মাকে দেখি না। কেমন আছে?

—ভালো।

—পঞ্চি ভালো আছে তো?

—আছে।

—চিঠিতে ঠিকানা দেয় নি, কোথায় আছে ওরা?

—সাপুর।

—আচ্ছা।

বলে, মুখে সট্‌কার নলটা আবার তুলে দিয়ে চোখ বুজে ভাবলেন কিছুক্ষণ, তারপরে বললেন —কাল সকালে একবার আসবেন।

—আসব।

—আটটার মধ্যে। নইলে আমার বড়ো ছেলে জগৎ আবার দোকানে বেরিয়ে যাবে। ও-ই আমার পোস্তার দোকানটা দেখে কিনা? মানে, বুঝলেন তো? লোক তো আমার দরকার, ওদের সঙ্গে একটু পরামর্শ ক'রে নিতে চাই। ভালো কথা, আমার বাড়িটা চিনবেন তো?

বললাম—আজ্ঞে, আপনার বাড়ি থেকেই আসছি।

—আচ্ছা? বাড়ির ঠিকানাতেই পঞ্চিরা তাহলে চিঠিটা দিয়েছিল?

—আজ্ঞে না। চিঠি দিয়েছিল আপনার পোস্তার দোকানের ঠিকানায়। সেখানেই প্রথমে গিয়েছিলাম।

—তারপর ?

—সেখান থেকে পাঠিয়ে দিলে আপনার বাড়িতে।

—কে দিলে ?

বললাম—আপনার ছেলে বলেই তো পরিচয় দিলেন তিনি। খাটো ধুতি পরা—

একটু হেসে বললেন—ওই ওর স্বভাব, খাটো ধুতি পরবে। মানে হিসেবী মানুষ কিনা ? ও-ই আমার বড়ছেলে জগৎ। তারপর ?

বললাম—বাড়ি থেকে পাঠিয়ে দিল এখানে। তিনিও বললেন, আপনার ছেলে। আদ্দির গিলে করা পাঞ্জাবী পরা—

মুখে এবারও হাসি, বললেন—আর বলতে হবে না। মেজোকর্তা, ভুবন। বাহারে টেরি দেখেন নি ? আমার মেজো ছেলে। কাজকর্মে মন নেই মশায়, বাবুয়ানীটা রপ্ত করেছে। তা আপনাকে খুব ঘুরতে হয়েছে বলুন ?

কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে রইলাম।

বললেন—আসুন কাল। ছোট কর্তার সঙ্গেও আলাপ হবে। আমার ছোট ছেলে বিপুল। তার খাটো ধুতিও নেই, বাবুয়ানীও নেই, পেটে বিদ্যে কিছু আছে, কলেজে পড়িয়েছিলাম যে !

প্রথম সাক্ষাৎকারেই গোকুলবাবুকে সেদিন মোটামুটি ভালো লেগে গিয়েছিল। বেশ মিশুকে, সাদাসিদে মানুষটি বলে মনে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু, তা বলে সত্যিসত্যিই যে তাঁর কাছে এক কথায় এভাবে পঞ্চিদের চিঠি নিয়ে গিয়ে চাকরী পেয়ে যাবো, এটা ভাবতে পারি নি।

পরদিন সকাল আটটায় ওঁর বাড়ি গিয়ে ওঁর কাছে বসেছি ওঁর বৈঠকখানায়। সে-ও এমনি খাটো-পায়া তক্তপোষের ওপর চাদর আর তাকিয়া পাতা ঘর, তবে চীৎপুরের ঘরখানার থেকে বেশ বড়ো ঘর। দেওয়ালে সব ছবি টানানো, নানারকম পুরাণো বিদেশী ছবি, কোথাও রঙ্ গেছে বিবর্ণ হ'য়ে, কোথাও আছে। তারমধ্যে রেমব্র্যান্ট্ না, কার আঁকা তিন নগ্না নারী নিয়ে "প্যারিসের বিচার" ছবিখানাও ছিল। গোকুলবাবু আমার পাশের খবর আর কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার কথা শুনে বড়ো আর ছোট ছেলের সঙ্গে পরামর্শ করে (মেজো ছেলে তখনো ঘুম থেকে নাকি ওঠেন নি, তাই গোকুলবাবু তাঁর খোঁজ করা সত্ত্বেও, তিনি তখন বৈঠকখানায় এসে উপস্থিত হতে পারেন নি।) আমাকে একেবারে নিলেন

মাসিক দু'শো টাকায়। তবে তাঁর মশলাপাতির ব্যবসাতে নয়, তাঁর নবগঠিত যাত্রার দলে। বললেন—বারবার দল গড়তে গেছি, পারি নি। প্রতিবারেই 'লস্' গেছে। এবার বিপুলের চেষ্টায় নতুন ক'রে আবার দল গড়ব, নাম দিয়েছি—"নিউ সরস্বতী", দেখি মা সরস্বতী এবার কৃপা করেন কি না।

শেষ পর্যন্ত যাত্রার দল! ভাবতে গিয়ে নিজের মনেই হেসে ফেললাম। চুরি করতে রাজী ছিলাম, ডাকাতি করতে রাজী ছিলাম, শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করতেও হয়েছিলাম উন্মুখ। সেক্ষেত্রে, এতো হাত বাড়িয়ে আকাশের চাঁদ পাওয়া! সেই দিনই চলে গেলাম পক্ষিদের ওখানে। পক্ষির মা বললে—কালিঘাটে গিয়ে মায়ের কাছে ডালা দিও।

পক্ষি হাসছিল, বললে—কী? বলেছিলাম না প্রথম মাসের মাইনে পেলে খাইয়ে দিতে?

—নিশ্চয়ই।

কিন্তু, কথা আর রাখা হয়নি। দেখতে দেখতে দুটি মাস কেটে গেল, ওদের বাড়ি আর যাবার সুযোগই ক'রে উঠতে পারলাম না। তেমন কিছু যে কাজ করেছি তা নয়, তবে ঐ বেলা দশটায় বেরিয়ে রাত দশটায় ফেরা। ওঁদের দোকানেব মোটামুটি হিসাবটা ওদের বৈঠকখানায় ব'সে ঠিকঠাক ক'রে দিয়েছি, আর বিকেল হ'লে গোকুলবাবুব সঙ্গে এসেছি চীৎপুরের সেই দোতলা ঘরে, 'নিউ সবস্বতী'তে। আমাব জন্য ছোট্ট একটি কেরোসিনকাঠের টেবিল, চেয়াব, কাঠের ক্যাশবাক্স, কিছু খেরো বাঁধানো খাতা, দোয়াত-কলম আর কাগজপত্র আনিয়ে দিয়েছেন গোকুলবাবু। এবং এই দু মাসে তিনি আমার কাজকর্মে খুবই খুসী হয়েছেন বলে মনে হ'লো। আমাকে দু'মাসে অতি অন্তরঙ্গও ক'রে নিয়েছিলেন তিনি। বলতেন—আপনার সঙ্গে কথা বলে বেশ আরাম পাই সরকার-মশাই।

উনি আমাকে বলেন সরকার মশাই, কিন্তু ওঁর ছোট ছেলে বিপুলবাবু আমাকে বলেন ম্যানেজারবাবু। বিপুলবাবু পর-পর দু'বার আই এ পরীক্ষা দিয়েও পাশ করতে পারেন নি শুনলাম, এখন ওর বয়স বাইশ। বেশ উদ্যমশীল ব্যক্তি। গোকুলবাবু বলেন, ছোটটির আর যাই হোক, মেজোটার মতো বদখেয়াল নেই, বুঝলেন সরকার মশাই?

এসব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ যখন আসে, আমি চুপ ক'রে সব শুনে যাই, কোনো প্রশ্ন করা সাধারণতঃ আমি তখন যুক্তিযুক্ত মনে করি না, উনি বলে যান ওঁর নিজেরই আবেগে।

সেদিনও উনি বলতে লাগলেন—আসল কথা, আমার ছোট-টি মন্দ-মেয়ে মানুষের কারবারে নেই। যাত্রার ব্যবসায়ে এবার মন দিয়েছে। তা' দিক্, যা ইচ্ছে করুক, আমি তো বুড়ো হয়েছি, ক'দিক আর দেখব? বড়ো জগৎ অবশ্যি আমার হীরের টুক্‌রো ছেলে, একটা ফতুয়া আর ন'হাতি ধুতি প'রে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। কোনো দিকে চোখ নেই এক ব্যবসা ছাড়া। মুস্‌কিল হচ্ছে ঐ ভুবনটাকে নিয়ে। ধারে কাছে কেউ নেই, কথাটা তবে আপনাকে আজ বলেই ফেলি। আপনাদের ঐ পাঞ্চকে নিয়ে কী কম ঢলাঢলি করেছে একদিন?

বলেই, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে, একটু থমকে তারপরে প্রশ্ন করে বসলেন—আপনি কিছু মনে করলেন না তো সরকার মশাই?

একটু অবাক হয়েই বললাম—না-না আমি মনে করবো কী।

গোকুলবাবু একটু হাসলেন, বললেন—অবশ্যি, আজকাল ভুবনের মন গেছে অন্যদিকে। তবে এককালে একটু ও—

ব'লে, আবার থেমে গেলেন মধ্য পথে। বললেন—কী মশাই, চুপ ক'রে যে?

অগত্যা মুখ তুলে, কিছু একটা বলা উচিত মনে ক'রে, বলেই ফেললাম—আপনি কিছু বলতেন না?

সোজা হ'য়ে এবারে বসলেন গোকুলবাবু। বললেন—দেখ সরকার মশাই, তুমি আমার বয়সে অনেক ছোট হবে, তোমাকে আর আপনি-আজ্ঞে করব না, কী বলো? কতো হলো বয়েস?

—উনচল্লিশ।

বললেন—তাহলে জগৎ তোমাব থেকে পাঁচ বছরের ছোটই হবে। জগৎ এখন চৌত্রিশ। কিন্তু হ্যাঁ, যা বলেছিলাম।

ব'লে আরও একটু আমার কাছে ঘেঁষে এসে কণ্ঠস্বর একটু নীচু ক'রে গোকুলবাবু বললেন—ভুবনকে বলব কী তখন? পক্ষির মা রয়েছে না? আসল কথা, পাপ লুকোতে নেই, আমার বয়সকালে ওর সঙ্গেও যে আমার রঙ্ হ'য়েছিল দিন কতক।

উৎসাহের প্রাবল্যে একেবারে সোজা হয়ে বসেছেন ততক্ষণে, বললেন—ও তখন ওদিককার গুঁইদের বড় তরফের কাছে আছে চীৎপুরের সেই বাড়িতে। সে বাড়ির খবর তুমি বোধ হয় জানো না। আমি তখন যাত্রার মহড়া বসাই ওর বাড়ির তেতলায়। মহড়া যখন শেষ হয়, তখন বেশ রাত। সবাই একে-একে চলে যায়। সবার শেষে দোরে চাবি দিয়ে নীচে নামি আমি। নামতে নামতে দেখি, গুঁইমশাইও চলে গেছেন। তখন পা-টিপে পা-টিপে ওর ঘরে গিয়ে

ঢুকতুম। এসব গল্প আর কতো শুনবে? ভালো মানুষটি ছিলুম না। এ'বয়সে ভগবান তার শোধ নিচ্ছেন ভুবনকে দিয়ে। হবেই তো, দুনিয়ার নিয়মই এই, ঢিলটি মেরেছ কি, পাট্‌কেলটি খেতে হবে তোমাকে। বুঝলে? এখন সেই পাটকেল খাচ্ছি।

বড়ো-মেজোর সংবাদ শোনা গেল, ছোটবাবু বিপুল সত্যিই একটু অন্য ধরণের মানুষ। সে আমি এই দু' মাস ওর সঙ্গে যেটুকু মিশেছি, তাতেই বুঝেছি। বিপুল বলে সর্বত্র আখ্যাত হ'লেও, নামটা ওর পছন্দ নয়, খাতায়-পত্রে নিজের নাম লেখেন, বিপ্লব ধাড়া। মধ্যেকার 'চন্দ্র' পর্যন্ত নয়, শুধু নাম আর উপাধি। বলেন,—আকারে সামান্য একটু বিপুলতার আভাষ দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু প্রকারে বিপুল হ'য়ে উঠতে পারি নি এখনো। তার থেকে, নিজের নামকরণ করা যাক্, বিপ্লব। কিছুদিন কেটে যাক্, কোর্টে গিয়ে একেবারে এফিডেবিট করিয়ে আনব নামটা।

কথাটা বোধ হয় একদিন গোকুলবাবুর কানেও গিয়ে থাকবে, বললেন—নাম পছন্দ হচ্ছে না, ছেলের এর পর কিছুই পছন্দ হবে না হয়ত। বড়ো খুৎখুতে হ'য়ে উঠছে হে, ভাবনার কথা।

আরেক দিন বললেন—যাত্রা করব বলে আসর ত সাজিয়ে বসলাম। বিপুল তো ঘোরাঘুরিও করছে খুব। এই আসানসোল ঘুরে এলো, আসাম ঘুরে এলো—কিন্তু ব্যবসা জেঁকে উঠবে কী? কী বলো সরকার মশাই? আমি এর আগে বার কয়েক দল চালিয়েছি কিন্তু টিকতে পারিনি, শেষ পর্যন্ত সব ভেস্তে গেছে। খরচান্তও হয়েছি খুব।

সেদিনও সবাই চলে গেছে, আমি আর উনি বসে আছি, উনি শুরু করলেন অন্তরঙ্গ আলাপন। বললেন—সরকার মশাই, পোস্তার ব্যবসা দেখেই আমার দিন কাটতে পারত। বড়ো ছেলে জগতের ওপর সব অমনতরো ফেলে রাখতে হতো না। কিন্তু—'যাত্রার পোকা' রয়েছে যে ভিতরে। দল না খুলে যাবো কোথায়?

এটিও ওর কথার মাত্রা 'যাত্রার পোকা রয়েছে ভিতরে'—এ কথাটা প্রায়ই শুনতে হতো।

অকারণে গলা নামিয়ে গোকুলবাবু সেদিন ব'লে ফেললেন—ব্যবসা-ট্যবসা ছিল না কি ভাবছেন? সব ভোঁ-ভেঁা। কিছুই ছিল না। মায়ে-খেদানো বাপে-তাড়ানো ছেলে, তা-ও জাতে আমরা নীচু, বুঝলেন? তাহলে সত্যি কথাই বলে ফেলি। এক যাত্রার দলে সখী হ'য়ে ঢুকে পড়লাম, আট-ন' বছর

মাত্র বয়স তখন। কালি মাষ্টার নাচ শেখাতো। চিনলেন কালি মাষ্টারকে? ঐ যে বুড়োমানুষ, রোগে-রোগে জেরবার হ্য়ে গেছে দেহটা, সেদিন এসে পাঁচটা টাকা খয়রাৎ নিয়ে গেল। মনে নেই? বড়ো কষ্টে পড়েছে, বললে না এসে? তুমি তো ছিলে সামনে।

বললাম—হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে।

এ কয়দিন চাকরী করে এটুকু জেনেছি, গোকুলবাবু এমনিতে 'হাত-টান' লোক, কিন্তু গোপন দান-খয়রাৎ ওঁর আছে। যাত্রা দল সংক্রান্ত কোনো কিছু হ'লে, কিম্বা যাত্রাদলের কেউ দুঃস্থ হ'য়ে পড়েছে শুনলে উনি যা হোক কিছু সাহায্য করবেনই।

ওঁর বড়ো ছেলে জগৎ একদিন আমাকে বললে—বাবার এই আদিখ্যেতার জ্বালায় গেলাম। ওদিকে দোকানটা বাড়াতে বলি, বা ব্যবসা একটু ফলাও করবার কথা বলিতো অমনি খেঁকিয়ে উঠবে। হোক যাত্রা, অমনি ভেতরটা একেবার উথলে উঠল!

বলেই, একটু থেমে, কণ্ঠস্বর একটু নামিয়ে—অবশ্যি লোকটি ভালোই, ছেলে-বেলা থেকে ঐ নিয়ে মেতে আছে, ভিতরের টান, ওতে না থেকে পারেই না।

তা যাই হোক। যা বলছিলাম। গোকুলবাবু বললেন—জানলে সরকার মশাই? সেদিন ঐ কালি মাষ্টারেরই রোয়াব ছিল কতো? দিব্যি গোলগাল চেহারা, মাথায় একরাশ কালো বাবরী চুল, আসরে গিয়ে, মঞ্চের মাঝখানে ট্যাপ্ ডান্স নাচত। তখন যাত্রায় ঐ সবের আমদানী হতে সবে শুরু করেছে। তা বলে সব কোম্পানীতে কী? তা নয়। দু-একটা কোম্পানীতে। তখনকার লোক 'ট্যাপ-ড্যান্স' বলতো না, বলতো—ইংরেজী নাচ। তা-ও সব আসরে ও নাচ হতো না, আসর বুঝে, নায়েকরা ফরমাস দিয়ে রাখত। কবেকার কথা বলছি বুঝতে পারছেন তো? এই আমার উনষাট বছর বয়স হলো। যখনকার কথা বলছি, তখন আমার বয়স ন'বছর। তাহলে কোন্ সালের কথা হলো, এ্যাঁ?

—উনিশ শ' দশ।

—হ্যাঁ, তাই হবে। কালি মাষ্টার বেত মেরে নাচ শেখাতো। তা শিখেছিলুম, গানও শিখেছিলুম। চেহারাটাও ভাল ছিল। ছদ্মবেশী কৃষ্ণ-এর নম্বর থাকলেই ডাকো গোকুলকে। এমনি ক'রে ক'রে একদিন এক বাবুর নজরে পড়লুম, বুঝলে? আমাকে বেশী মাইনে কবুলে নিলে তার দলে টেনে। সেখানে

গিয়ে দেখলুম, দল ফল সব বাজে, বড়লোকের দু'দিনর খেয়াল। ঠিক তাই হলো, দুদিনেই দল ভাঙ্‌লো। কিন্তু বাবু আমাকে ছাড়ল•না। বলবো কী তোমাকে, আমি অন্য দ'লে গিয়ে নেচেছি, কি গান ধরেছি, বাবু তা শুনতে পেয়ে মদের ঝোঁকে একেবারে কেঁদে কঁকিয়ে অস্থির। এমন মানুষও যে হয়, তা তোমরা আজ হয়ত বিশ্বাসই করবে না। তা ছিল, এমন মানুষ সেই সেকালে ছিল। বলব কী তোমাকে, আমার শোভাবাজারের বাড়ীখানা কার দেওয়া? সেই তাঁর। এক কথায় একেবারে লিখে দিলেন। বললেন—এই নে। আর তো আমায় ছেড়ে যাবি নে। বোঝ একবার! কী করি? আপনি বাঁচলে বাপের নাম। দল-ফল ছেড়ে ওঁর সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরতে লাগলুম। অস্থানে-কুস্থানে কোথায় না ঘুরেছি! কিন্তু মন পড়ে থাকত আসরের দিকে। এক-একবার পালিয়ে পালিয়ে গিয়ে কোনও না কোনও দলে গিয়ে ভিড়ে যেতুম। বাবুর লোক গিয়ে আবার খোঁজ ক'রে ক'রে ধরে বেঁধে নিয়ে আসত। বলবো কী, তখন আমার উনিশ বছর মাত্র বয়স—ঐ বাবুই জোর ক'রে আমায় বিয়ে দিয়ে দিলে। জগৎ-ভুবন আর বিপুলদের মা ঘরে এলো, নোলক-পরা এগারো বছরের খুকী। আমার আর কেউ নেই, দেশে খোঁজ নিয়ে জানলুম, বাপ-মা মরে-হেজে গেছে। জ্ঞাতি-গোষ্ঠীদের ডেকে আর কী হবে? ঐ একরত্তি বউ নিয়ে একাই রইলুম ঘরে। শাশুড়ী এসে থাকত মাঝে মাঝে। কারণ, রাত-বিরেতে আমি তো বাবুর সঙ্গে প্রায়ই বাইরে। যেথানেই বাবু যাক, আমি না হ'লে তার চলবে না। আমি হারমোনিয়াম বাজিয়ে গোপাল উড়ের গান গাইব, সেই শুনে তবে তার শান্তি। শেষ পর্যন্ত ঐ পোস্তার দোকানখানা—সে অবশ্য দেখাশোনার অভাবে দোকানের তখন পড়্‌তি অবস্থা—ওখানাই দিয়ে দিলেন আমাকে। দিন কতক মন দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করলুম। বিয়ের বছর পাঁচেক পরে আমার বড় ছেলে জগতের জন্ম হলো—সে ১৯২৫ সালের কথা। ১৯২০ সালে বাবু মারা গেলেন। কর্ত্তা-মা তার আগেই গেছলেন। বাবুর দুই ছেলে ছিল। বড়োটি খুব ভাল লোক, মেজটি আমাকে মামলার ভয় দেখালে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত মামলা আর করে নি। যাই হোক, আমি আবার তখন একবার যাত্রার দল গড়বার চেষ্টা করলুম। কিন্তু জমাতে পারলুম না। মুকুন্দ দাসের নাম তখন দেশ ছেয়ে গেছে। আমার এক শালার হাতে দোকান ছেড়ে দিয়ে বছর দুই নট্ট কোম্পানীতে বিবেক সেজে গানও গাইলুম। কিন্তু মন বসল না। নিজের হাতে দল না গড়লে শান্তি কই? দল গড়তে গড়তে যাকে বলে ১৯৩৯ সাল। সরস্বতী অপেরা নাম দিয়ে বেশ জাঁকজমক ক'রেই

দল গড়েছিলুম,—এই ঘরখানাতেই, বুঝলে? চীৎপুরের এই ঘরখানা আর ওদিকের ড্রেস রাখার ঘরখানা এই দু'খানা ঘর বিশ টাকায় ভাড়া দিতুম তখন বরাতের ফের দেখ, সেই ঘর দু'খানাই আবার ভাড়া নিলুম কত্তোতে, না, আশী টাকায়। অবশ্যি আফ্‌শোষ নেই, আমার বাড়ীর ভাড়াও আমি অমনি বাড়িয়ে দিয়েছি। যাই হোক, তক্কে তক্কে ছিলুম বলে পুরণো ঘর দু'খানা পেলুম, কিন্তু পুরাণো সেই মহড়ার ঘরখানা আর পাওয়া গেল না। পক্ষির মা'র তেতলার ছাদের ঘরে তখন আমাদের মহড়া বসত।

বলে, তাকিয়ার ওপর হেলান দিয়ে বসলেন আরাম করে, গড়গড়ার নলটি মুখে রেখে বুজলেন দুটি চোখ। দেখে মনে হলো, সেই মুহূর্তের জন্য ওঁর মন বুঝি চলে গেছে ওঁর পুরাতন দিনগুলির মধ্যে। যা' আজ বিবর্ণ, বিশুষ্ক, ঝরে-পড়া ফুলের পাপড়ির মতো পড়ে আছে জীবনের একপ্রান্ত। হঠাৎ লক্ষ্যে পড়ে না, যখন চলার পথে মর্মর-ধ্বনি তোলে তখন থমকে দাঁড়াতে হয়, অন্ততঃ একটি মুহূর্তের জন্য।

উনি যে কয়েকবার দল গঠন করিয়াছিলেন, তখন দলের নাম রেখেছিলেন, "সরস্বতী অপেরা পার্টি"। কিন্তু এবার বিপুল বাবুর প্রচেষ্টায় যখন দল গড়ে উঠেছে তখন অনেক বাকবিতণ্ডার পরে এর নামকরণ হলো "নিউ সরস্বতী থিয়েট্রিকাল অপেরা পার্টি।"

'নিউ' অর্থাৎ 'নতুন' সরস্বতী গোকুলবাবুর আপত্তি ছিল না, আপত্তি ছিল 'থিয়েট্রিকাল' শব্দটা নিয়ে। বলেছিলেন,থিয়েটারের গন্ধ আবার কেন? ও হলো এক দ্রব্য, এ হলো আর এক। আমাদের আসর বসবার আগে কন্‌সার্ট বাজবে? সে কী যা তা দ্রব্য!

তারপরে নিজের দু'কানে একবার হাত ঠেকিয়ে নিয়ে উনি বলেছিলেন— পিয়ারীমোহনের নাম শুনেছেন? গুরুদেব ব্যক্তি। ডাক সাইটে ব্যায়লাদার ছিলেন সে যুগে। সে সব গল্প আর একদিন শুনবেন'খন। তিনি কনসার্টের নিয়ম করেছিলেন যে, পালা যতো জমজমাট, অর্থাৎ কি না উঁচু সুরে বাঁধা হবে, খুব জলদে চলবে গতি, সেই বুঝে তার কনসার্টের তালও হবে জলদ। আসরে গিয়ে পাকা লোক তা শুনে ঠিক বুঝতে পারবে, পালা ঠায়ের পালা, না জলদের পালা। তা' এসব বিচার কী আর তোমাদের ঐ থিয়েটারের আছে, এ্যাঁ? আমি জন্মে কখনো থিয়েটার দেখিনি, দেখবার ইচ্ছাও হয় নি। একবার কে যেন ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল একটা সিনেমায়।—'চণ্ডীদাস' পালা দেখেছিলুম। রাম রাম, ওকী অ্যাক্টো হয়েছিল! কেমন যেন সব জোলো-জোলো। তবে

হ্যাঁ, এক অন্ধ ভদ্রলোক গান গেয়েছিল বটে। তেমন তান-বাটের কাজ ছিল না অবশ্যি, তবে যিনি সুর দিয়েছিলেন, তিনি গুণী ব্যক্তি। একখানা ঠাঁটি মালকোষ শুনেছিলুম বটে। কালিমাষ্টার আবার মালকোষ বলতো না, বলতো 'মালবকৌশিক'। হ্যাঁ গো 'মালকৌশিক'। কথাটা মুখে মুখে এমন এমন রটে গিয়েছিল যে, হরিপদ বাবু তার একটা পালার একটা চরিত্রের নামই রেখে ফেললেন—মালবকৌশিক।

বলতে বলতে, মুখ থেকে নলটা এইবার সরালেন গোকুলবাবু, ডেকে উঠলেন—ফ্যালারাম!

দরজার আড়াল থেকে উত্তর এলো—যাই বাবু।

মধ্যবয়সী, শীর্ণকায়, বশংবদ যে লোকটা ঘরে এসে দরজার কাছে হাতজোড় ক'রে দাঁড়ালো, সে-ই ফ্যালারাম, দলের ভৃত্য স্থানীয়। মনে পড়ে, সেই প্রথম দিন ওই ফ্যালারামই আমাকে পথ দেখিয়ে ওপরে নিয়ে এসেছিল একেবারে গোকুলবাবুর সামনে।

গোকুলবাবু বললেন—একটু চা নিয়ে আয় ত, খাই। দুটো পাত্তর আনিস, আমরা দুজনে খাবো।

—যে আজ্ঞে।

বলে, চলে গেল ফ্যালারাম। চা নীচের দোকান থেকে আসে, কাপে নয়, কাঁচের গেলাসে আসে, তাই ওর ভাষায় দাঁড়িয়েছে—"পাত্তর"।

বললেন—সরকার মশাই, ছোটবাবু নতুন কাকে যেন ধরে আনলেন, না? তোমাকে বললে, খাতায় নাম-ধাম লিখে নিন, একশো টাকা করে মাইনে।

বললাম—হ্যাঁ, আপনি তো তা অনুমোদন করেছেন।

সোজা হ'য়ে বসলেন উনি। বললেন—এই দেখ, তুমি যে আবার পালার ভাষায় কথা কইতে শুরু করলে! অনুমোদন করব না? ছোটবাবু এনেছে গরজ করে, আমি কি তা নাকচ করে দিতে পারি? দিলুম "হুঁ" বলে। কথাটা হচ্ছে, যাকে আনল, সেই ছোকরার নামটা কী?

—অজিত দাস।

—তা কি করবে? থাকবে?

বললাম—হ্যাঁ। বিপ্লববাবু বলেছেন—

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—এই সেরেছে! তুমিও ঐ দলে? ছিল বিপুল, হলো বিপ্লব। বাবা! নামেরও বলিহারী, যেন খাঁড়া নিয়ে তেড়ে আসছে!

একটু হেসে বললাম—ঐ নামে ডাকলে ছোটবাবু একটু খুসী হন।

—তা ত হবেনই, কাজ করতে গিয়ে এখন সত্যি সত্যি না বিপ্লব বাধিয়ে বসে, তাই ভাবছি। তা' যাকগে, কী বলছিলুম যেন? হ্যাঁ, ঐ অজিত দাস না কি নাম যেন, ও কি সাজবে?

—না। প্রম্প্‌ট্ করবে। প্রম্প্‌টার।

—প্রম্প্‌টার!

গোকুলবাবু বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে কিছুক্ষণ। তারপরে বললেন—ও নতুন লোক, প্রম্প্‌ট্ করবে কী হে আসরে বসে? আসরের ধরণ-ধারণের ও কী জানে? আসর বলে কথা! সাক্ষাৎ মা সরস্বতীর থান! চালাকী নয়।

বললাম—বইতো ধরা হয় নি, বই ধরা হলে তখন বরং ও একটু দেখে শুনে নিতে পারবে—

—বই ধরা হয় নি মানে!—গোকুলবাবু বললেন—বই তো শুনলাম ছোটবাবু ঠিক করে ফেলেছে। একেবারে আনকোরা এক নতুন পালা—নতুন বাঁধনদারের, আজ আমাকে শোনাবার কথাও আছে। শোনো নি? ফ্যালারামকে চা আনতে পাঠালুম কি অম্‌নি-অম্‌নি? চা খেয়ে নাও, আজ উঠতে রাত দশটা, বুঝলে সরকার মশাই?

বলতে না বলতেই, ফ্যালারাম ঘরে ঢুকল দু'গেলাস চা নিয়ে। বড়বাবুকে একটা গেলাস দিয়ে, অপরটি আমার হাতে দিতে দিতে ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে বলে উঠল—ছোটকর্তা আসছেন আজ্ঞে। সঙ্গে নম্বরবাবু।

—নম্বরবাবু!

আমার বিস্ময় লক্ষ্য করে গোকুলবাবু একটু যেন হাসলেন মনে হলো, বললেন দলে ঢুকেছ এতদিন হ'য়ে গেল আর এটা শোনো নি সরকার মশাই? প্রম্প্‌টারকে বলে—নম্বর ধরিয়ে দেওয়া বাবু—"নম্বরবাবু"।

তারপরে, ফ্যালারামের দিকে তাকিয়ে—কীরে, ঠিক না?

মুখখানা অম্‌নি হাসিতে ভ'রে গেল ফ্যালারামের, বললে—আজ্ঞে।

—তা তুই জানলি কী ক'রে, যে আসছে সে দলের নম্বরবাবু? এখনো ত বই ধরা হয় নি, নম্বর কে ধরিয়ে দেব, সেটা তুই এখন থেকেই জানলি কী করে?

ফ্যালারাম হাসিমুখে মাথাটা নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল—আমি জানব না বড়বাবু? আপনার আশ্রয়ে আছি কতদিন? যেদিন থেকে কর্তা বাবুটিকে নিয়ে এলেন, শুনলুম চাকুরীও হয়ে গেল, তখন বাবুটি নীচে যাচ্ছে দেখে তরতর

করে সিঁড়ি দিয়ে নেবে গিয়ে ধরলুম পেছন থেকে। আলাপ সালাপ জমিয়ে নিলুম। জিজ্ঞেস করলুম, কী করা হবে আসরে? তা বললেন—যারা সাজবে, তাদের কথা ধরিয়ে দেবো। ব্যাপারটা সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেললুম। যাত্রা তো আর কম দেখলুম না বড়বাবু? তাই বললাম—ও আপনি নম্বরবাবু? বাবুটি বোধহয় নতুন এ নাইনে, হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বললাম, বুঝলেন না? আপনি তো কথা ধরিয়ে দেবেন সবাইকে? ঐ কথাকেই আমরা বলি নম্বর। তাই নম্বর ধরিয়ে দেওয়া বাবু কী হলেন আমাদের কাছে, নম্বরবাবু না?

ওর বলার ধরনে হেসে ফেলেছেন গোকুলবাবু, বললেন—হয়েছে। এখনো তোর জ্যাঠামি গেল না?

ফ্যালারাম কিন্তু এ মন্তব্য গায়েই মাখল না। সে উৎকর্ণ হ'য়ে কী যেন শুনল কান পেতে, তারপর বললে—সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাচ্ছি। আসছেন ওনারা।

বলেই তাড়াতাড়ি পালালো ছুটে। কিছুক্ষণ পরেই এলেন বিপ্লববাবুর সঙ্গে সত্যিই সেই ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের ছেলেটি, যার নাম ফ্যালারামের ভাষায়—নম্বরবাবু।

গোকুলবাবু বললেন—এসো পালা শোনাবে তো?

—হ্যাঁ।

বলে, ওর কাছ থেকে একটু দূরে ফরাসের ওপর বসে পড়লেন ছোটবাবু, তারপর অজিত দাসের দিকে তাকিয়ে বললেন—বসো অজিত?

অজিত আমাদের দুজনকে হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বসে পড়ল জড়ো-সড়ো হয়ে ফরাসের একপাশে, বিপ্লববাবুর পিছন দিকে। বিপ্লববাবু বললেন—আরম্ভ করি?

—করো।

গোকুলবাবু তাকিয়ায় ভর করে আধশোয়া অবস্থায় গড়গড়ার নলটা মুখে তুলছেন আবার।

বিপ্লববাবু শুরু করলেন। কোনো বই নয়। মুখে-মুখেই তিনি বলতে লাগলেন,—লক্ষ্মীর ভূমিকা সেদিন গ্রহণ করেছিলেন উর্বশী।

গোকুলবাবু সোজা হয়ে বসলেন, বেশ উৎসাহিত হয়েই বলে উঠলেন—উর্বশী! বাঃ—বেশ! তাহলে পালাটা পৌরিণিক, কী বলো?

বিপ্লব বললেন—হ্যাঁ। পৌরাণিকই ত আপনি পছন্দ করেন।

আরাম করে তাকিয়ায় হেলান দিলেন গোকুলবাবু, বললেন—কেন করব না! পৌরাণিক না হলে পালা কি তেমন জমজমাটি হয়? ওসব ছেঁড়া কাপড়-পরা সামাজিক পালা আমার দু'চখের বিষ! না—বলো, বলে যাও।

বিপ্লববাবু বেশ ভালোই বলতে পারেন দেখলাম। বলতে লাগলেন—লক্ষ্মীর ভূমিকা সেদিন গ্রহণ করেছিলেন উর্বশী, আর বারুণী হয়ে ছিলেন—মেনকা। অভিনয় হচ্ছিল "লক্ষ্মী স্বয়ম্বর"নাটক, আর রচনা হচ্ছে স্বয়ং সরস্বতীর। অভিনয় শিখিয়েছিলেন আচার্য ভরত। লক্ষ্মী-চরিত্রে সেদিন সত্যিই অভূতপূর্ব প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন উর্বশী, উপস্থিত সুধিবৃন্দ নির্বাক বিস্ময়ে নিরীক্ষণ ক'রে চলেছেন সেই অদ্ভুত অভিনয়-চাতুর্য,—এমন সময়, স্বয়ংবর-সভার দৃশ্যে ঘটে গেল অভাবনীয় ছন্দপতন।

—কী ঘটে গেল? ছন্দপতন!—বাধা দিয়ে বলে উঠলেন গোকুলবাবু—একেবারে পালার ভাষায় কথা বলছ যে! যেন ঝাড়া মুখস্থ বলছ! একটু সোজাসুজি কায়দায় বলো বাপু, বড়ো খটোমটো লাগছে শুনতে।

বিপ্লববাবু একটু হাসলেন, একবার দৃষ্টি বিনিময় করলেন অজিতের সঙ্গে, তারপরে বললেন—বেশ। তাই বলছি। শোনো। সেই সভায় কারা উপস্থিত ছিলেন জানো? ত্রিলোকের সব লোকপালবৃন্দ, এবং সর্বোপরি—স্বয়ং পুরুষোত্তম।

—ত্রিলোক?—গোকুলবাবু আবার চোখ খুললেন,—কথাটা কি সোজা হলো? স্বর্গ বলো না, ল্যাটা চুকে যায়।

হাসলেন বিপ্লববাবু, বললেন—নৃত্যগীত, মানে, নাচগান চলেছে।

—আচ্ছা!—উৎসাহিত হলেন বড়বাবু, বললেন—তাহলে সখির ব্যাচ রইল, কী বলো?

—রইল বই কি?—ছোটবাবু বললেন—তারপরে শোনো। সভায় বারুণী হাতে ধ'রে নিয়ে এলেন লক্ষ্মীকে, হাতে তার একগাছি মালা। অতিথিদের সবাইকে একে একে দেখিয়ে, আর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বারুণী জিজ্ঞাসা করলেন লক্ষ্মীকে—এদের মধ্যে কার ওপরে তোমার অন্তরের টান, খুলে বলো দেখি?

উর্বশীর বলা উচিত ছিল,—'পুরুষোত্তমের প্রতি,' কিন্তু, অন্যমনস্কতার জন্য ভুলে ক'রে তিনি বলে ফেললেন—"পুরূরবার প্রতি।"

সোজা হয়ে বসেছেন গোকুলবাবু, উর্দ্ধশ্বাসে বললেন—তারপর?

তারপর আর কী—ছোটবাবু বললেন—আসরে রেগে ফেটে পড়েন আচার্য

ভরত। বললেন—ছিঃ! এ তুমি কী করলে? ভুল সংলাপ বললে! এ অপরাধের ক্ষমা নেই। স্বর্গরাজ্য থেকে তুমি আজ নির্বাপিত হ'লে।

মাথা নীচু করে একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, করবেনই বা কি তিনি এরপর।

দেবরাজ ইন্দ্রের অনুরোধে সবাই ছেড়ে গেলেন সভা, অমন কি বারুণী পর্যন্ত।

সবাই চলে গেলে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন উর্বশীকে—কী করে হলো এটা? নাট্য-কলায় তোমার অদ্ভুত নিষ্ঠা, এ'রকম ভুল ত কখনো হয় না তোমার।

দু'হাতে মুখ ঢেকে এবারে কান্নায় ভেঙে পড়লেন উর্বশী, বললেন—আমি ক্লান্ত, আমি ক্লান্ত!

ঈষৎ আশ্চর্যান্বিত হলেন মহেন্দ্র—ক্লান্তি! উর্বশীর ক্লান্তি!

কিন্তু, নৃত্যের উৎসবে যদি তালভঙ্গ হয়, কে করতে পারে নর্তকীকে ক্ষমা?

মহেন্দ্র ধীরে ধীরে ওর কাছে এসে দাঁড়ালেন, কোমল কণ্ঠে বললেন—ক্লান্তি! কিন্তু, কেন?

অশ্রুপ্লাবিত মুখ খানা তুলে ওর দিকে তাকালেন উর্বশী, বললেন—এই নৃত্যগীত, এই বাঁধা ধরা সংলাপ আবৃত্তি করে যাওয়া দিনের পর দিন,—এ'আর আমার ভালো লাগছে না। আমার পক্ষে নির্বাসন-দণ্ড মাথা পেতে নেওয়াই শ্রেয়।

মহেন্দ্র একটু নীরব থাকবার পর, আবার বললেন—তোমার মনের গহনে পুরূরবার নাম উৎকীর্ণ হয়ে গেছে, তা' না হলে তোমার কণ্ঠে অতর্কিতে উচ্চারিত হতো না ও নাম। পুরূরবা মর্তের রাজা এবং আমার সুহৃদ, কিন্তু, তাকে তুমি ভালবাসলে কেমন করে? কেমন করে সাক্ষাৎকারই বা ঘটল?

উর্বশী মহেন্দ্রের হাত ধরে ত্বরিত-গতিতে একেবারে প্রস্থান-পথের কাছে এসে দাঁড়ালো, বললে—তুমি শুনবে আমার কাহিনী?

—শুনবো।

তবে এসো। নিভৃতে ঐ কুঞ্জ-তলায় বসে আমি শুনাবো তোমাকে আমার সব কাহিনী, তারপরে, তুমি করো আমার শেষ বিচার।

বলেই, দুজনে হাত-ধরাধরি করে ছুটে গেল প্রস্থান-পথ দিয়ে অন্তরীক্ষের দিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল চারিদিকের সমস্ত আলো। শুধু, নেপথ্য-গৃহ থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে একটা আলোর রেখা এসে ছুঁয়ে রইল ওদের। ওরা ক্রমে ক্রমে বিলীন হয়ে গেল নেপথ্য-গৃহে। তার পরক্ষণেই রঙ্গ-ভূমিতে জ্বলে

উঠল উজ্জ্বল আলো। দেখা গেল কেশী নামক দৈত্যের প্রমোদ-সভায় নৃত্যগীত করতে আসছে সভা নর্তকীর দল।

তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে মুখে সট্‌কার নলটা রেখে একমনে গল্পটা শুনছিলেন বড়বাবু।

উপরি-উক্ত অংশটুকু পর্যন্ত শুনে উঠে বসলেন সোজা হয়ে, গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে সরিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন,—না-না, এ চলবে না। আলো নিভে গেল, মানেটা কী? আলো তোমরা নেভাবে ক্যামনে? আসর বলে কথা! মা-সরস্বতীব থান। আলো নেভালেই হলো?

ছোটবাবু অজিতের সঙ্গে একবার দৃষ্টি বিনিময় করে বলে উঠলেন—আলো খুব নেভান যাবে। আজকাল কোন শহরে বিজলী বাতি নেই? আমাদেব সঙ্গে দু'জন ইলেকট্রিসিয়ান থাকবে। লইন-ফাইন যা টানবার তারাই টানবে, আলাদা স্থইচ বোর্ড থাকবে তাদেরই হাতে। আসরের আলো যখন খুসী তখন জ্বালাবো আব নেভানো। আব, যেখানেই আমবা আসব বসাবো তাব ত্রিশ ফুটের মধ্যে থাকবে সাজঘবেব দরজা। সেইখানেই বসবে একজন ইলেকট্রিসিয়ান, আসরে সে সেখান থেকে জোবাল স্পট আর ফোকাস ফেলবে। কিনতে হবে এসব যন্ত্রপাতি, আমি সমস্ত দেখে-টেকে এসেছি, সবশুদ্ধ দাম পড়বে গিয়ে তোমার—

এতক্ষণ বিস্ফাবিত নেত্রে সব কিছু শুনছিলেন গোকুলবাবু। যাত্রায সখী সাজতেন, পবে বিবেক সেজেছেন, 'পার্ট' অর্থাৎ 'নম্বব' বলে বলে ভাষাটা দুবস্ত আছে, কথা বলেন ভালোই, কিন্তু কোন কারণে একটু 'নার্ভাস' হয়ে গেলেই আসল কথাবার্তার ধরণটা বেরিয়ে আসে। এবাবও হল তাই। বললেন--আরে থাম থাম। ইসব কি বললে হে? অ্যাঁ? বলি আসবে ফটাস্ ফেলবে!

—ফটাস নয় ফোকাস!

—নাও, ঐ হলো। ফোকাস্ কথাটা জানব না কেন? আমরা ঐ ওকেই তামাসা করে বলতুম ফটাস। তা ওসব যে লোকের চোখের ওপরে ফেলবে, চোখ পিট্‌পিট করবে না তো অ্যাক্টরদের? আর তাছাড়া আসরের লোকেরা আলো নিভলে চেচাবে না তো?

ছোটবাবু বললেন—তুমি ভুল করছ বাবা, তোমাদের যুগ আর নেই। সিনেমা দেখে দেখে গাঁয়ের লোকেরা অনেক কিছু বুঝে গেছে। গাঁয়ের ছোট ছেলেটিও সিনেমা দেখে এসে 'টেম্পো'র আলোচনা করে।

—কি করে বললে? 'এক্সটেম্পো'? আসরে 'এক্সটেম্পো' কি ছেলো না বলতে চাও? মুকুন্দ দাসের আসব তো গ্যাখো নি। মা সরস্বতী বিরাজ করতো আসরে। কথায়-কথায় বানিয়ে বলতো, ঝোপ বুঝে কোপ মারত। তা কি বললে? লোকে আজকাল বুঝে ফেলবে, যে নম্বর ছাড়া বানিয়ে কথা বলছে অ্যাক্টরে?

—না বাবা—ছোটবাবু বললেন, ওকথা বলছি না। টেম্পোর কথা বলছি, গতির কথা বলছি। তোমার পালা জলদে চলছে, না, ঠায়ে চলছে, সেই বিচারটার কথা বলছি।

চোখ বড় বড় করে এ কথাটাও শুনলেন গোকুলবাবু, বললেন—তা হলে তো 'অডিয়্যান্স' খুব লায়েক হয়ে উঠেছে হে!

'অডিয়্যান্স' কথাটা বোধ করি হালে শিখেছেন গোকুলবাবু, সুযোগ পেলেই ব্যবহার করবেন কথাটা এবং ভুল ধরিয়ে দিলেও ভুল করে 'অডিয়্যান্স' ছেড়ে 'অডিয়েন্স' বলবেন না।

যাই হোক, ছোটবাবু বললেন—আপনি কিছু ভাববেন না, আমার ওপর সব ছেড়ে দিন। দেখুন আমি কেমন দল তৈরী করি, আর কেমন নাটক।

—নাটক কি হে, পালা বলো। —গোকুলবাবু বললেন—গান আর কথা মিশিয়ে কথা বললে পালা, আর শুধু কথা দিয়ে কথা বললে নাটক। কি বলেন গো সরকারমশাই? বলে আমার দিকে তাকিয়ে সম্মতির আশা করতে লাগলেন উনি। আমি হ্যাঁ ও না-র মাঝামাঝি একটা মুখভঙ্গী করে নিরুত্তর হয়ে রইলাম। সোজা হয়ে উঠে বসেছেন গোকুলবাবু, বললেন—কথাটা শিখে রেখেছিলুম হে। নট্ট কোম্পানীর বজ্রেশ্বরবাবু বলতেন কথাটা। তিনি আর ইহলোকে নেই, বড় জবর ব্যক্তি ছিলেন, দলের একজন 'নম্বরী অ্যাক্টর, কিন্তু জীবনে কখনো 'ফাউল করেছেন বলে শুনি নি। 'ফাউল' মানে বুঝলেন তো ছোটবাবু? কারুর নম্বরের উপর নম্বর বলাটাকে 'ফাউল' বলে। আমার কথাটা শেস হলো না, অমনি তুমি তোমারটা ধরে দিলে—তা চলবে না তার কাছে। অনেক নম্বরী অ্যাক্টরদের আবার এ রকম আছে কি না! তা বলছিলুম কি ছোটবাবু, ধরো এমন গাঁয়ে গিয়ে পড়লে যেখানে তোমার বিজলী বাতি নেই, সেখানে তুমি কী করবে? তোমার ঐ উর্বশী পালার কী হবে?

ছোটবাবু বললেন—সেখানে এ পালা করব না, মামুলী পালা ধরব। এটা রইল আমাদের 'প্রেস্টিজ প্রোডাকসন' হিসেবে।

চোখ বড় বড় করে এ ইংরেজী শব্দটাও শুনলেন গোকুলবাবু, ধুরন্ধর লোক, হয়ত আন্দাজে আন্দাজে মানেটাও ধরলেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে আর বললেন না কিছু। শুধু বললেন—যাক্ বাঁচা গেল, পুরানো পালাও তাহলে রাখছ কিছু।

—হ্যাঁ, তা রাখতে হবে বই কী।

—পুরানো লোকদের নিচ্ছ তো দলে?

—নিশ্চয়ই। যাকে যাকে পাওয়া যায়। তবে শুনলুম আমাদের তিনজন ভড় কোম্পানীতে গিয়ে ঢুকেছে। তাদের মধ্যে, যেমন ধরুন আপনার নম্বরী অ্যাক্টর—সুশীলবাবু, সুশীলরাণী—

—বাজে কথা! প্রায় গর্জন করেই উঠলেন এবার গোকুলবাবু।

আমরা একটু চম্‌কেও গেলাম। কারণ, এমনিতে বেশ শান্ত স্বভাবের লোক, ঠাণ্ডা মাথা। কিন্তু চটে গেলে সাংঘাতিক।

বললেন—সুশীল আজ সকালেও আমার সঙ্গে এসে দেখা করে গেছে। সে আমার অনেক দিনের পুরানো লোক, আজ ত্রিশ বছর সে যাত্রা করছে, সেই সখী সাজার বয়স থেকে। সে আমাকে কখনো ছাড়বে না। তাকে আসতে বলেছি, হয়ত একটু পরেই সে এসে পড়বে। বুঝেছ হে, তার সম্বন্ধে কাঁচা কথা ক'য়ো না। এমন একটা পাকা মেয়েছেলে খুঁজে বার করো দেখি এ তল্লাটে? এ বয়সেও অমন রূপ! প্রায় চল্লিশ বছর বয়স হলো তার। কিন্তু সেজে-গুজে বেরুলে যেন এখনও বিশ বছরেরটি। আসরে বেরুলে কে বলবে যে, ও মেয়েমানুষ নয়! ভড়েরা ওকে টানা-টানি করেছেল, ও যায় নি। ভড়েরা ট্যারা মধুকে দলে নিয়েছে, ওকে নিতে পারে নি। যাত্রাওয়ালাদের খবর আমার কাছ থেকে নাও। যাত্রার পোকা রয়েছেন যে আমার ভিতরে।

ছোটবাবু বললেন—তা হবে, আমিই ভুল খবর পেয়েছি। কিন্তু তুমি বাকীটা শোন।

—বেশ। শোনাও।

বলে কাত হয়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে গড়গড়ার নলটি আবার মুখের কাছে ধরলেন গোকুলবাবু।

ছোটবাবু আবার শুরু করলেন।

'কেশী দৈত্য'র সভায় নৃত্য গীত করতে এলো সভা নর্তকীর দল। লাল-নীল নানারকম আলো এসে পড়তে লাগল তাদের ওপর। তোমাকে

বলতে ভুলে গেছি, আসরেও বসে থাকবে দ্বিতীয় ইলেকট্রিসিয়ানটি, সে গ্রাউণ্ড স্পট নিয়ে কাজ করবে।

আবার বাধা দিয়ে বলে উঠলেন গোকুলবাবু—সে তুমি যা খুসী করো, সখীর দল যে রেখেছ এই আমার ভাগ্যি! যে হাব্‌ভাব যে নৈবিদ্য—যাত্রার আসর, সখী নইলে চলে! বুঝলেন গো সরকারমশাই, 'তখন আমি ছোট, সাহাদের কোম্পানীতে সখী সাজি। গজাসুর সাজত তখন বাগচী মশাই—দলের সেরা নম্বরী অ্যাক্টর। ছোটবেলায় মতি রায়ের দলে থেকে তামিল নেওয়া। 'আমি ছিলাম মওড়াব সখী। আসব ছাড়বার সময়ে তাল ফেরতায় দুই নম্বরের নিতাই-এর সঙ্গে পিছনে চলে আসতুম। গানেব শেষে এসে পিছন থেকে আমাব হাতটা চেপে ধবতেন বাগচীমশাই। বলতেন, অন্তর মাঝাবে জ্বালি দাবানল কোথা যাও হে সুন্দরী! আমি হাতটা আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে একটু হাসতাম, তাবপব গান ধরতাম একেবাবে চড়া সুরে। 'ভবে ভোলা, সব ভুলে তুই দেখলি কি হায় আমাব চোখে'। সবটা মনে নেই। মানেটা ছিল, কামানলে প্রেম চেওনা, মববে পুড়ে। ওঃ! কালি মাষ্টাব যা একখানা ছায়ানট বসিয়েছিল গানখানায়! ও রকম ছায়ানটেব লাগসই গান আমি খুব কম দেখেছি।

বোধ হয় একটু লজ্জা অনুভব করেই মাথা নীচু করে বসেছিলেন ছোটবাবু। উনি থেমে যেতে এবারে বললেন—পবেরটুকু শুনবে তো?

—নিশ্চয়ই! বলো।

ছোটবাবু পুনর্বার শুরু করলেন—সখীদের সঙ্গে এসেছিলেন কেশী দৈত্য।

গোকুলবাবু চোখ বুজেছিলেন। চোখ চেয়ে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—সঙ্গে আর কেউ নেই।

—না।

সোজা হয়ে বসলেন বড়বাবু, তাহলে একটা কাজ করো না। গজাসুরের ঐ গানটা ঢুকিয়ে দাও না নাচেব পর; ঐ, "সব ভুলে তুই দেখলি কী হায়!" —আমি ঠিক খুঁজে বার কবব। হরিপদবাবুবই লেখা বোধহয়। ঐ রকম কেশী এসে মওড়া সখীটার হাত ধরে বলবে, অন্তর মাঝারে জ্বালি দাবানল, কোথা যাও হে সুন্দরি!

বিরক্ত হয়ে এবার বলে উঠলেন ছোটবাবু—তাহলে চলবে না। সে বলবে, বন্ধ করো নৃত্যগীত। সংবাদ দাও প্রধানমন্ত্রীকে, আমি আত্মজিজ্ঞাসায় অস্থির।

ভেবেছিলাম, বড়বাবু বুঝি ব্যাপারটা পছন্দ করবেন না, কিন্তু ছোটবাবুর মুখে

এইখানে একটু অ্যাক্‌টিং-এর আমেজ পেয়ে উৎসাহিত বোধ করলেন,—মন্দ শোনচ্ছে না। একটু মতি রায় ধরণ মনে হচ্ছে। জানেন তো সরকার মশাই, মতি রায় ছিলেন ডাকসাইটে যাত্রাওয়ালা। আমি চোখে দেখিনি। ছোট বেলায় গল্প শুনেছি। নবদ্বীপের পোড়া-মা-তলায় প্রথম যাত্রা করেন মতি রায় সেই ১৮৭৩ সালে। সালটা মনে আছে, কারণ ঐ সালে আমার বাবা জন্মেছিলেন। মায়ের বাক্সে পুরানো ঠিকুজী ছিল বাবার। দেশ থেকে যে তোরঙ্গ এনেছিলুম মায়ের তাতে ছিল, খুঁজে পেয়েছিলুম। তা মতি রায় এসে তখন যাত্রার ধরণ পালটে দিয়ে ছিলেন। তাঁর আগে নীলকান্ত মুখুজ্যে আর নারাণ দাসের খুব নামডাক ছিল যাত্রায়। গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর, যা আমি সখ করে আমার বাবার কাছে গাইতুম, তা ছিল আরও আগের কথা। কিন্তু কী বলছিলুম যেন। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, মতি রায়। মতি রায়, ঐ সব সখীর হাত-টাত ধরা নাকি পছন্দ করতেন না। কম গুণী লোক ছিলেন? ওঁর পোড়া-মা-তলায় যাত্রা শুনে নবদ্বীপের পণ্ডিতরা ওঁকে সোনার ম্যাডেল আর কবিরত্ন উপাধি দিয়েছিলেন। পরে কেশব সেনের বাড়ীতে যখন উনি নিমাই সন্নেস পালা করেন, ঠাকুর পরমহংসদেব তা দেখে ভাবে বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন। মতি রায় সাজতেন শ্রীধর। ওঁর পালা শুনে ওঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন দুহাত দিয়ে। যাত্রা কি আর ফ্যালনার দব্য, এঁ্যা? নাও হে ছোটবাবু, যা বলছিলে, বলো।

ছোটবাবু আরেকবার নম্বরবাবুর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে বলে উঠলেন—কেশী দৈত্যের আদেশে সখীরা চলে গেল। এলেন প্রধানমন্ত্রী মশায়। দিলেন রাজ্যের সব খবর। কিন্তু তবু অস্থিরতা কমল না দৈত্যের। বললে, রাজকোষে আরও অর্থ চাই। মন্ত্রী বললেন, রাজ-কোষ থেকে অর্থ নিয়ে মহারাজ যে নিজের বিলাসব্যসন চরিতার্থ করে চলেছেন, প্রজারা টের পেলে তাতে আপত্তি তুলতে পারে।

বড়বাবু এখানে আবার বাধা দিলেন, বললেন,—ভালো কথা, দৈত্য সাজবে কে হে? আমাদের দলে সেরকম লোক আছে কী?

কোন উত্তর না দিয়ে ছোটবাবু নম্বরবাবুর সঙ্গে একবার দৃষ্টি বিনিময় করলেন। বড়বাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—আমি বলি কী সরকার মশাই, রয়েল অপেরা থেকে বল্লভকে ভাঙিয়ে আনুন বেশী টাকা কবলে। দৈত্যের নম্বর বলতে এখনো সে ওস্তাদ। বয়েস একটু হয়েছে, কিন্তু তবু মরা হাতি লাখ টাকা!

ছোটবাবু বলে উঠলেন—সেসব পরে ঠিক করা যাবে, আগে নাটক, মানে, পালাটা শুনে নিন।

—আচ্ছা তাই হোক, বলে যাও।

আবার তাকিয়া হেলান দিয়ে উনি দুচোখ বুজলেন। ছোটবাবু শুরু করলেন—দৈত্য বললে, প্রজাদের আপত্তি! এত বড়ো সাহস! কোটালকে ডেকে পাঠাও, সে তার অনুচরবর্গ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুক নিরস্ত্র প্রজাদের লগুড় প্রহার করতে।

—কী বললে, লগুড়-প্রহার?—গোকুলবাবু আবার উঠে বসলেন,—ঠিক ঐ কথাটিই আছে নম্বরে?

আবার নম্বরবাবুর সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় করে নিলেন ছোটবাবু, তারপর বললেন—হ্যাঁ।

—তা কেন? ওটাকে তরবারি করে দাওনা? শানিত তরবারি।

নম্বরবাবু কী যেন বলতে যাচ্ছিল, তার হাতটা ধরে থামিয়ে দিয়ে ছোটবাবু বলে উঠলেন, আজ্ঞে না, 'লগুড়-প্রহার' কথাটিই সঙ্গত হবে। আপনি আগে শুনুন সবটা?

—বেশ, বলো।

ছোটবাবু আবার আরম্ভ করলেন—মন্ত্রী বললেন, আপনি ভুল বুঝবেন না মহারাজ, প্রজারা এখনো আপত্তি করেনি, কিন্তু আপত্তি করতে কতক্ষণ?

—করে দেখুক না! রোষ কষায়িত দৃষ্টিতে কেশী বললে—আমি স্বর্গ থেকে উর্বশীকে ধরে আনব, দেখি, কে কী করতে পারে।

মন্ত্রী সবিস্ময়ে বলে উঠলেন—উর্বশী!

—হ্যাঁ, স্বয়ং উর্বশী!

মন্ত্রী বললেন—কিন্তু, তাতে যে আপনার ক্ষতি হতে পারে মহারাজ।

—আমার ক্ষতি!—অট্টহাস্যে দিক-বিদিক প্রকম্পিত করে কেশী দৈত্য বললেন,—আমার ক্ষতি করে কার সাধ্য?

—বাঃ!—ব্যাঘাত সৃষ্টি করে হঠাৎই বলে বসলেন গোকুলবাবু—এ জায়গাটা বেশ। বল্লভকে যদি ভাঙিয়ে আনা যায়, ও একেবারে জ্বালিয়ে দেবে। অমন অট্টহাস্য বল্লভ ছাড়া আর এখন কার আছে, এঁ্যা?

ছোটবাবু এবার একটু উষ্মা প্রকাশ করেই বলে উঠলেন—বাবা, তুমি শুনবে কি না?

—ও, হ্যাঁ, শুনছি। বলো, বলে যাও।

ছোটবাবু পুনর্বার শুরু করলেন।

কেশী দৈত্য বললে, দুর্বার আমার শক্তি। নিজের শক্তির তেজে খধূপের মত উঠে আবার তথ্‌খুনি জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যেতে চাই। তুমি বাধা দিও না প্রধান মন্ত্রী, আমি যে রকম করে পারি রাজকোষ বৃদ্ধি করব। কারণ, দৈত্যশক্তির উৎসই হচ্ছে অর্থ।

—কিন্তু, কেমন করে তা সম্ভব, মহারাজ ?

—সেখানেই তো তোমার মন্ত্রণার প্রয়োজন। না দিতে পারলে মন্ত্রী হিসেবে তুমি ব্যর্থ।

—হঠাৎই রাজকোষে অর্থবৃদ্ধি কেমন করে সম্ভব, আমার মাথায় তা আসছে না মহারাজ।

—তা হলে গণ সংঘের সভা ডেকে তোমার বিরুদ্ধে প্রস্তাব আনব মন্ত্রী।

—সর্বনাশ! তাদের আস্থা হারালে আমার আর কী রইল মহারাজ!

—কিছুই রইল না। অতএব, এবারকার মতো আমার মন্ত্রণাই তুমি নাও। বণিক শ্রেষ্ঠকে ডেকে পাঠাও।

—বণিক শ্রেষ্ঠ! কেন ?

—সে এলেই বুঝতে পারবে।

অতএব, আসে বণিক শ্রেষ্ঠ। পরামর্শ সভা বসে। সেনাপতি আর বিশ্বস্ত সভাসদ্‌বৃন্দেরও কেউ কেউ আহূত হন সে সভায়।

এইভাবে দৃশ্যের পর দৃশ্য, অঙ্কের পর অঙ্ক। বণিক শ্রেষ্ঠের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করেন কেশী। নিজের ভোগবিলাস আর অর্থস্ফীতির লালসায় শুরু হয় প্রজা পীড়ন। দেশের খাদ্য পর্যন্ত চলে যায় বণিকদের হাতে। উচ্চ মুনাফার লোভে তারা খাদ্য দ্রব্য লুকিয়ে রেখে সৃষ্টি করে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ।

দুর্ভিক্ষ কথাটা উচ্চারণ করে ছোটবাবু একটুক্ষণ বুঝি থেমে ছিলেন দম নেবার জন্য। দরজার কাছ থেকে হঠাৎ ভেসে এল একটি কণ্ঠস্বর—তারপর ?

আমরা সবাই চমকে তাকালাম দরজার দিকে। দেখি, দরজার কাছে মেঝের ওপর বসে আছে সুশীলরাণী। গোলগাল নাতিদীর্ঘ ফরসা চেহারা, গায়ে সবুজ ডোরা-কাটা একটা ছিটের হাফসার্ট। মুখে পান, চিবিয়ে চিবিয়ে ডান আর বাঁ গালে জমা করে রাখা।

গোকুলবাবু সোৎসাহে বলে উঠলেন—তুমি কখন এলে হে সুশীল ?

—আজ্ঞে, এই খানিকক্ষণ—বিনীত ভঙ্গীতে বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল

সুশীলবাবু।—পালাটা শুনছিলুম আর ভাবলুম বিঘ্ন করি কেন, তাই পা টিপে টিপে ভিতরে ঢুকে পড়েছিলুম।

গোকুলবাবু বললেন—তা বেশ করেছ। উঠে এসে বসো তক্তপোষে।

জড়সড়ো হয়ে নম্বরবাবুর পাশটিতে গিয়ে পা গুটিয়ে বসল সুশীলবাবু, ছোটবাবু আর আমাকে মাথা নীচু করে সম্ভাষণ জানিয়ে।'

ছোটবাবু আবার শুরু করলেন তাঁর কথা, কিন্তু গোকুলবাবু আবারও বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—কিন্তু, দুর্ভিক্ষের কথা-টথা কেন? উর্বশীর গল্পে ওসব আছে নাকি? কার বলছিলে যেন লেখাটা?

ছোটবাবু উত্তর করলেন—অনিরুদ্ধ রায়। নতুন লেখক। আপনাকে তো বলেছি?

—হুঁ, তা বলেছ। কিন্তু নতুনে ফতুনে ভয় করে। লোক চট্ করে নেবে কী? হ্যাঁ দাও, তোমার আ'-কালকার পালা লিখিয়েদের পালাই দাও। ব্রজেনবাবু কি ভোলাবাবু কি বিনয়বাবু—লোকে লুফে নেবে।

—কিন্তু লুফে তো নেয় নি বাবা।—ছোটবাবু বললেন—দু'বছর তো চেষ্টা করে দেখলেন, হল কিছু? দল পোষাই সার হলো, টাকার হলো শ্রাদ্ধ।

চুপ করে রইলেন গোকুলবাবু, এ তার সত্যিই পরাজয়ের কাহিনী। ভাল পালা পাওয়া সত্ত্বেও দল কেন যেন আর কিছুতেই জমল না।

ছোটবাবু বললেন—এবার তোমার দল না জমলে আমায় বলো। আর দুর্ভিক্ষের কথা-টথা হলো লোকের আজকাল প্রাণের কথা। তাদের কথা কিছু অন্ততঃ না বলতে পারলে তাদের প্রাণে গিয়ে তা লাগবে কেন?

গোকুলবাবু বললেন—আবার বণিক-ফণিকও ঢুকিয়েছে যে! চালের আড়ৎ যারা করে রেখেছে, তাদের গায়ে ফুটবে না গিয়ে কথাটা?

—তা ফোটাই তো দরকার।

গোকুলবাবু একটু ভেবে বললেন—হুঁ। মুকুন্দ দাসের ধরণ ধরেছ দেখছি তোমরা। দেখ, হালে যদি পানি পাও, আমার তাতে আপত্তি কী? আর হ্যাঁ, কী যেন বললে, অনিরুদ্ধ রায়? অনিরুদ্ধ যেন কার ছেলে হে,—উষা আর অনিরুদ্ধ—নাঃ, সব ভুলে গেছি। মাথায় আর কিছু থাকে না। তা অনিরুদ্ধ নামটি ভাল। টাকাকড়ি দিয়ে দিয়েছে?

ছোটবাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—না। তোমায় না শুনিয়ে—

বাধা দিয়ে বললেন গোকুলবাবু—ঐ তো তোমাদের দোষ। ভড় কোম্পানী,

ঝি দাস কোম্পানী, ওরা শুনতে পেলে এক্ষুণি ভাড়িয়ে নেবে। কিছু দাদন দিয়ে বেঁধে ফেলতে হয় বাঁধনদারকে, এও জানো না?

সে আপনি ভাববেন না,—ছোটবাবু উত্তর দিলেন—সে আমার হাতের লোক। কখনো বাইরে যাবে না।

—তাই নাকি?—গোকুলবাবু চোখ বড় বড় করে শুনলেন কথাটা, তারপরে বললেন—ছোকরা বুঝি? বেশ, বেশ। একবার এনো, বদনখানা একবারটি দেখে নেবে।

—নিশ্চয়ই। কিন্তু, সে'তো পরের কথা। আগে বাকীটা শুনে নাও।

—বেশ। বলে যাও।

ছোটবাবু আবার আরম্ভ করলেন—এইরকম অবস্থা। প্রজারা দুর্ভিক্ষে কাতর, চারিদিকে অন্নচাই-অন্নচাই রব, এমন সময় কেশী দৈত্য হঠাৎ আকাশ-পথে একদিন উর্বশীকে দেখতে পেয়ে তাকে অপহরণ করার উদ্যোগ করল।

উর্বশীর আর্তচীৎকারে দিগ্বিদিক আচ্ছন্ন হল। তার অতুলনীয় কেশরাশি মুঠি করে ধরেছে কেশী দৈত্য, আর উর্বশী কেঁদে কেঁদে বলছে—ওগো কে আছ গন্ধর্ব-কিন্নর, নর কি দেবতা, আমায় বাঁচাও, রক্ষা কর।

গোকুলবাবু এখানে আবার কথা বলে উঠলেন। তবে এবার অবশ্য ছোটবাবু কিংবা আমাকে নয়, সুশীলারাণীকে। বললেন—কী সুশীল, শুনছ তো?

সুশীলরাণী সাগ্রহে উত্তর দিল—শুনছি বড়বাবু।

বড়বাবু ছোটবাবুর দিকে ফিরে বললেন—নাও বলো। তারপর?

ছোটবাবু বললেন—উর্বশীর কাতর ক্রন্দন শুনতে পেলেন মহারাজ পুরূরবা। তিনি ত্বরিত গতিতে রথচালনা করে গেলেন ওঁদের সন্নিকটে। দৈত্যকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তার হাত থেকে উদ্ধার করলেন উর্বশীকে। এবং সেই মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁকে হৃদয় দান করলেন উর্বশী। আবারও দেখা হয়েছিল পুরূরবার সঙ্গে। তিনিও তাঁর বিরহে কাতর। তার মন জেনে তাঁকে আত্মদান করার পূর্বেই উদ্যানের মধ্যে দেবদূতের প্রবেশ ঘটল অকস্মাৎ। সে জানালো, আজই ইন্দ্রসভায় অভিনীত হবে 'লক্ষ্মী-স্বয়ংবর' নাটক। সুতরাং তৎক্ষণাৎ চলে আসতে হল উর্বশীকে মর্তলোক থেকে।

রঙ্গমঞ্চে আবার দেখা গেল উর্বশী ও মহেন্দ্রকে। ওর সব কাহিনী শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। আচার্যের অভিশাপ মিথ্যে হবার নয়।

যাও তুমি মর্তে। পুরূরবার কাছেই যাও। তবে, একটা কথা। তিনি

যখন তোমার গর্ভজাত সন্তানের মুখ দেখবেন, তখনই তোমার শাপমোচন, তোমাকে ফিরে আসতে হবে এই স্বর্গে।

ছোটবাবু একটু থামলেন। বড়বাবু বলে উঠলেন—তারপর?

ছোটবাবু বললেন—তারপরে মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত শুরু হলো। উর্বশী অপ্সরী, তাই তার মানবীর মত গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পেলো না, গোপনে উর্বশী একদিন প্রসব করলেন পুত্র আয়ুকে। কিন্তু শিশুকে আর কতদিন রাখা যায় লুকিয়ে? তাই চ্যবনমুনির আশ্রমে তাপসী সত্যবতীর হাতে তাকে একদিন সঁপে দিলেন উর্বশী। কিন্তু মায়ের মন তো মাঝে মাঝে কাঁদে। আবার পুত্রকে আনতেও ভয় হয়, মহারাজ যদি তার মুখ দেখে ফেলেন? তাহলে তৎক্ষণাৎ মহারাজকে ত্যাগ করে স্বর্গে ফিরে যেতে হবে উর্বশীকে। একদিকে উর্বশী মাতা অন্যদিকে প্রিয়া। এই দুই টানে মনের দিক দিয়ে বিপর্যস্ত হতে লাগলেন উর্বশী। এমনি ভাবে দিন যায়। ক্রমে বড়ো হলো কুমার। একদিন আশ্চর্য ভাবে ঘটনাচক্রে পিতার সামনে এসে পড়লেন কুমার আয়ু। উর্বশীর সামনে সমস্ত পরিচয়ই তার উদ্ঘাটিত হয়ে গেল। কিন্তু অবসান হল প্রিয়া ও মাতার দ্বন্দ্ব, উর্বশী শাপমুক্ত হয়ে চলে গেলেন স্বর্গে। সে তার আরেক জীবন। সেখানে সে মাতাও নয়, কারুর একান্ত প্রেয়সীও নয়। সেখানে সে নৃত্য-গীত অভিনয় পারদর্শিনী নটী।

—শেষ হল?

—হ্যাঁ।

গোকুলবাবু বললেন—বেড়ে বেঁধেছে তো! তা পালাটা কোথায়?

ছোটবাবু বললেন নম্বরবাবুকে দেখিয়ে—একে দিয়েছি। সাট লিখেছে, তুমি সবটা পড়বে?

—না হে বাপু, একেবারে মহলায় বসিয়ে দাও, সেখানেই শুনব। কিসে লেখা? গদ্য না পদ্য?

গদ্য-পদ্য মেশানো।

গোকুলবাবু বললেন—মন্দ হবে না। বাঁধনদার ছোকরা গপ্প ফেঁদেছে ভাল। জমাট আছে।

মনে মনে একটু হাসলাম। গল্প অনিরুদ্ধ রায়ের নয়,—মহাকবি কালিদাসের। আমি কমার্সের ছাত্র হলেও একটু-আধটু কাব্য পড়ার সখ ছিল আমার। বিক্রোমোর্বশী পড়া ছিল। তবে, অ-মিলও আছে। কেশী দৈত্যের প্রজাপীড়ন কালিদাসে নেই, উর্বশীর প্রিয়াভাব ও মাতৃভাবের

দ্বন্দ্বও বিশ্লেষণ করেন নি কালিদাস। সেদিক থেকে অনিরুদ্ধ রায়ের অভিনবত্ব আছে; তাছাড়া, ভাষাটা এবং দৃশ্য সংস্থাপন নিশ্চয়ই হবে তার নিজের। অবশ্য, উর্বশীর মূল গল্পও কালিদাসের নিজের নয়। ঋক্ বেদের দশম মণ্ডলের একস্থানে পুরূরবার বিবাহের কথা আছে। আর আছে উর্বশীর কাহিনী, যতদূর মনে পড়ে, বিষ্ণু পুরাণে, কথাসরিৎসাগরে এবং আরও কিসে কিসে যেন। কিন্তু, এসব কথা এখানে বলবই বা কাকে?

কিন্তু থাক আমার কথা। বড়বাবুও কিছুক্ষণ সটকার নল মুখে দিয়ে কি যেন ভাবছিলেন। বললেন—হ্যাঁ হে বিপুলবাবু, কমিক আছে হে?

—নিশ্চয়ই। বিদূষক রয়েছে, তার স্ত্রী রয়েছে।

—আচ্ছা?—বড়বাবু বললেন—তাহলে কাকে নেবে?

তারপরে, সুশীলের দিকে ফিরে বললেন—হাঁ হে সুশীল, ধেনো কার্তিক আজকাল কোন্ দলে আছে জানো? লোকটা কমিকে ওস্তাদ একেবারে।

সুশীল উত্তর দিলে—কোনো দলে নেই। ছুট্‌কো রয়েছে।

—সে কী হে! পড়্‌তা কি তবে ওর গেছে নাকি?

সুশীল বললে—আজ্ঞে, ঠিক তা নয়। শুনেছি, কোন্ থিয়েটারে যেন চান্স পাচ্ছে।

—বলো কী হে?—গোকুলবাবু উঠে বসলেন—হলো কী কালে কালে, এ্যাঁ? থিয়েটারের লোক আসছে যাত্রায়, যাত্রার লোক থিয়েটারে!

সুশীল তার ছোট্ট ডিবেটা থেকে পান বের করে চিবুতে চিবুতে বললে—গুরুদেব লোক হ'য়ে এ' আর এমন কি বললেন আপনি! কেন ননীবাবু কিছুদিন থিয়েটারে গিয়ে নামেন নি?

—কোন ননী? বড়ো, না ছোট?

—বড়ো ননী।

ছোটবাবু প্রসঙ্গে বাধা দিলেন এবারে। বললেন—আমি পনেরো দিনের মধ্যে এ বই তৈরী করে ফেলতে চাই, চট্‌পট কাজ আরম্ভ করতে হবে। কাকে-কাকে রাখবেন, আর কাকে-কাকে রাখবেন না, সেটা ঠিক করুন।

গোকুলবাবু প্রশ্ন করলেন—সেটা আমিই করব?

ছোটবাবু বললেন—হ্যাঁ? মানে সবাই মিলে পরামর্শ করা যাক আর কী। ম্যানেজারবাবুও রয়েছেন।

—বেশ।—বড়বাবু গড়গড়ার নলটা রেখে সোজা হয়ে বসলেন। তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললেন—প্রথমেই ধরো গিয়ে উর্বশী। ক' নম্বরের?

ছোটবাবুর হ'য়ে উত্তর দিলে ফ্যালারামের নম্বরবাবু, অর্থাৎ অজিত দাস,—৭৬ নম্বরের পার্ট।

অর্থাৎ, ছোট-বড়ো সব মিলিয়ে ৭৬টি সংলাপ আছে।

ঠোঁট ওল্টালেন গোকুলবাবু, বললেন—এ' আর এমন কি! পালা ক' অঙ্কের ?

—তিন অঙ্ক।

—ওই হয়েছে এক ফ্যাসান। পাঁচ অঙ্ক আজকাল আর কেউ লিখতে চায় না। আমি নট্ট কোম্পানীতে একবার একটি নম্বর পেয়েছিলুম, গান ধ'রে ১০৬ নম্বর ছিল, জানো ?

বলে মুখ ফেরালেন সুশীলের দিকে, বললেন—কী হে সুশীলবাবু, পারবে তো ?

ঠোঁট টিপে একটু হাসল সুশীল, বললে—কিছু ভাববেন না বড়বাবু, যা শুনলুম, আপনার আশীর্বাদে ও আমি একেবারে জ্বালিয়ে দেবো।

হাসলেন গোকুলবাবু। কথাটায় খুবই খুশী হয়েছেন মনে হলো। বললেন তা আমি জানি।

তার পর, আমার দিকে আবার মুখ ফেরালেন, বললেন, —সরকার মশাই, ওকে তাহলে একটা বিল লিখে দিন।

—বিল ?

—হ্যাঁ। যা ওকে দেবো বলেছিলাম, তার ওপরে তিরিশ টাকা আরও ধরে লিখুন। কী হে সুশীল, খুশী তো ?

'বিল' মানে কনট্রাক্টের এগ্রিমেণ্ট, বাঙলায় ছাপানো। বিল বইয়ের মতো দুটি অংশ থাকে তার, একটি অংশ ছিঁড়ে ওকে দেবো অন্যটি থাকবে এ বইয়ের মধ্যে, আমাদের কাছে।

সুশীল উঠে বড়বাবুকে প্রণাম করল। তারপর ছোটবাবু আর আমাকে হাত জোড় করে নমস্কার জানাতে জানাতে আমার টেবিলের কাছে সরে আসছিল, এমন সময় ছোটবাবুর একটি কথায় শুধু ও-ই নয়, স্বয়ং বড়বাবু পর্যন্ত চমকে উঠলেন।

গম্ভীর অথচ দৃঢ় কণ্ঠে ছোটবাবু বললেন—ওকে দলে রাখতে চাও, রাখ বাবা। তবে উর্বশী ও পাবে না। ওকে দেবো না আমি।

বিস্ফারিত নেত্রে ছেলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর গোকুলবাবু বললেন—তার মানে ? ওর থেকে পাকা মেয়েছেলে কোথায় পাচ্ছ শুনি ?

ছোটবাবু সোজা হয়ে বসলেন, বললেন—মেয়ে অ্যাক্ট্রেস্ আনব। আমি কথাবার্তা সব শেষ করে এসেছি। উর্বশীর ভূমিকায় নামবে থিয়েটার জগতের এক অভিনেত্রী—শীলা রায়।

নামটা শুনে এতদূর চমকে উঠলাম যে হাতের কলমটা একেবারে সাংঘাতিক রকমে কেঁপে গেল।

পঙ্কির ওখানে আর যাওয়া হয়নি, অববশ্য সেও আর খোঁজ নেয় নি। নেবার আবশ্যকতাই বা কী? কিন্তু তার অ্যামেচার থিয়েটার আর টুকরো-টাকরা সিনেমার কাজ ছেড়ে সে যাত্রায় আসতে চাইল কেন অবশেষে? ওর ওদিককার কাজ কর্ম কি কমে গেছে? হতে পারে। হয়তো আর থিয়েটারে প্লে-করার কাজ তেমন পায় না, তাই বাধ্য হয়ে যাত্রায় আসতে হচ্ছে। বড়বাবু কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলেন না।

এদিকে কিন্তু আর্তনাদ করে উঠল সুশীলরাণী। আর্তকণ্ঠে সে বলে উঠল—এ দলে মেয়ে আসবে 'ইম্পেরিয়াল' কোম্পানীর মতো! তাহলে আমরা কোথায় যাবো!

গোকুলবাবু সবিস্ময়ে বললেন—কী বললে বটে, ইম্পেরিয়াল মানে, সতীশের দল? সে মেয়ে নিয়ে দল গড়েছে? এটা তো আমাকে তুমি সকালবেলা বলো নি হে সুশীল।

সুশীল কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললে—একী বলবার মতো কথা, যে ঢাক পিটিয়ে বেড়াবো। কিন্তু এ কী শুনলুম বড়বাবু! আমরা তাহলে যাব কোন চুলোয়?

—দাঁড়াও, দাঁড়াও, ব্যাপারটা তাহলে বুঝতে দাও। সতীশ মেয়ে নিয়েছে তুমি জানতে বিপুল?

ছোটবাবু বললেন—হ্যাঁ।

—ওটা জেনেই কি এখানে মেয়ে নেবাব ব্যবস্থা করলে?

—হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।

—মেয়ে নিয়ে বাইরে ঘোরার ঝক্কি সামলাতে পারবে?

—কেন পারব না!—ছোটবাবু আমার দিকে মুখ ঘোরালেন—তাছাড়া, ম্যানেজারবাবু রয়েছেন।

—হুঁ, ব্যবসা হিসেবে মন্দ ফন্দী কর নি।—গোকুলবাবু বললেন—ঠিক মত চালালে দু'পয়সা আসতে পারে। ভালো কথা, ভুবন নেই তো এ-সবের মধ্যে?

—কে, মেজদা! মেজদা এর মধ্যে আসবে কেন? 'নিউ সরস্বতী' তোমার আমার ব্যবসা বাবা, এর মধ্যে বড়দা মেজদার কিছু করবার নেই।

ওদিকে নাকি-স্বরে প্রায় কেঁদে উঠেছে সুশীলরাণী, বললে—আপনিও এতে সায় দিচ্ছেন বড়বাবু, আমার কি গতি হবে?

উত্তর দিলেন ছোটবাবু—আপনি ব্যাটাছেলের পার্ট করবেন।

এবার সত্যি বুঝি কেঁদে উঠল সুশীল। বললে—সর্বনাশ করলে! জন্মে যা করি নি! 'রূপবহ্নি' আমাব টাইটেল ছিল জানেন? পয়লা নম্বরী ফিমেল ছাড়া অন্য পার্ট কখনো ছুঁইনি। দস্তুরমতো পোষ্টারে দুই ইঞ্চি অক্ষরে আমার নাম পড়ত—'রূপবহ্নি সুশীলরাণী', বুঝলেন?

গোকুলবাবু বললেন ছোটবাবুকে—শোন হে, আজকেব দিনটা আমাকে ভাবতে দাও। তুমি বরং এক কাজ করো। যারে যাকে নিতে চাও, সকলকে খবব পাঠাও, কাল বিকেলে চারটেয় সব এসে এখানে জড়ো হোক। কথাবার্তা কয়ে কালই সবাব বিল-এব ব্যবস্থাটা করা যাবে।

—ভালো কথা।

—আর শোনো। আরও তো ফিমেল দরকাব। কটি নিচ্ছো?

ছোটবাবু বললেন—চারটি নিচ্ছি। তিনজনেব সঙ্গে কথা পাকাপাকি হয়ে গেছে, একজন শুধু বাকি। আজ হয়ে যাবে। কাল তাদেবও আসতে বলব।

—কিন্তু কোনো বইতে যদি চারটেব বেশী ফিমেল থাকে?

ছোটবাবু বললেন—সে ক্ষেত্রে সুশীলবাবু তো রইলেনই।

সুশীল তেমনি নাকি স্বরে ঘ্যান্‌ঘ্যান করে উঠল—আসল মেয়েদেব পাশাপাশি আমি নকল মেয়ে সাজতে পারব না। বিশ্রী দেখাবে।

সে কথা কানেও না তুলে ছোটবাবু বললেন—তাছাড়া কানাই মাষ্টারের সখীব ব্যাচ তো থাকবেই। তাদেরও আসতে বলব কাল।

—আচ্ছা।

—আজ তাহলে আসি? তুমি বাড়ী যাচ্ছ কখন?

—একটু পরেই। সবকাব মশাইয়েব সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলে নিই।

একটু হাসলেন ছোটবাবু, বললেন—ও আচ্ছা। বেশ। বলে, নম্বর-ছোকবাটিকে সঙ্গে করে বেরিয়ে গেলেন ছোটবাবু।

বড়বাবু বললেন—তুমিও এখন যাও হে সুশীল, সরকার মশাইয়ের সঙ্গে আমার একটু কাজের কথা আছে।

—যাচ্ছি বড়বাবু, কিন্তু দেখবেন, কাজছাড়া কববেন না যেন। ভড কোম্পানী ডাকতে এসেছিল, আমি আপনাকে ছেড়ে এক পাও নড়ি নি।

—ঠিক আছে। এখন যাও। কাল এসো কিন্তু ঠিক সময়ে।

সুশীল যেতে যেতে বললে—না এসে উপায় আছে? ছাপোষা মানুষ। আসব ঠিক। পেন্নাম।

ও চলে যেতেই আমার দিকে সরে এলেন বড়বাবু। কণ্ঠস্বর নামিয়ে প্রশ্ন করলেন—কী বুঝছেন গো সরকার মশাই?

বললাম—খারাপ তো কিছু দেখছি না। ছোটবাবু তো ভালই বুদ্ধি করেছেন।

উৎসাহিত বোধ করে বড়বাবু বলতে লাগলেন—খাসা বুদ্ধি! দেখলাম বাবাজীর আর যাই হোক ব্যবসা-বুদ্ধিটুকু হয়েছে। সেই জন্য আমি আর বাগ্ড়া দিলাম না। এদিকে উৎসাহ যখন হয়েছে, করুক একটা বছর ওর খুসী মতন। লাভ না হলে আবার ছাড়া সুতোর রাশ টানতে কতক্ষণ? কিন্তু হ্যাঁ গো, উর্বশী-পালার বাঁধনদার কে, তা কিছু অনুমান করতে পারলে?

—না, তাকে তো এখনো দেখতেই পাইনি।

—পাবেও না। ছোটবাবুকে আমি বললুম না, আসতে বলো, বদনখানা একটু দেখে রাখব। তা আমি জানি, সে বদন হয় আমি দেখতে পাবো না, আর নয়ত তার বদন এরই মধ্যে আমার চোখে পড়ে গেছে।

—বলেন কী!

বড়বাবু একটু হাসলেন, বললেন—আপনি শিক্ষিত ব্যক্তি, আপনার চোখেও ওরা ধুলো দিয়ে গেল, এটাই আশ্চর্য! আপনি ঐ নম্বর বাবুর ওপর একটু নজর রাখবেন। কী নাম বলে গেল যেন বাঁধন-দারের, অনিরুদ্ধ রায়, না?

—হ্যাঁ।

—আপনার ঐ যে নতুন নম্বর ছোকরাটি, ওর নাম কি?

—অজিত দাস।

বড়বাবু বললেন—ওর কতো মাইনে ঠিক করে দিয়েছে যেন ছোট বাবু? একশো টাকা, না?

—হুঁ।

—সেদিক দিয়ে হুঁশিয়ারীর পরিচয় দিয়েছে বিপুল। বেশী মাইনে নম্বরকে দিলে লোকের চোখ টাটাতে পারে। নাঃ, বুদ্ধি শুদ্ধি হয়েছে দেখছি। বুঝতে পারলেন তো সরকার মশাই?

—না।

বড়বাবু বললেন—অজিত দাসই আসল নাম, অনিরুদ্ধ রায়টা বানানো। আসলে ঐ হচ্ছে বাঁধনদার, নামটা জানাতে চায় না আর কী কোনো

কারণে। দেখলেন না, দুজনে কেমন প্রতিকথায় চোখ চাওয়া চাওয়ি করছিল। দলের কাউকে কথাটা যেন ফাঁস করবেন না, শুধু নিজে একটু নজর রাখবেন।

বললাম—কিন্তু, লেখক নিজের নামটা গোপন করবেন কেন? এতে তো ওঁরই নামটার প্রচার হতো।

—কিছু একটা রহস্য নিশ্চয়ই আছে। সেটাই তো বার করতে হবে। ও ছোকরাকে 'প্রম্পটার' হিসেবে ঢোকালেও ও হচ্ছে বিপুলের বন্ধু, সেই কলেজ আমলের বন্ধু-টন্ধু হবে আর কী। একটু হুঁসিয়ার থাকবেন।

—আচ্ছা।

বড়বাবু বললেন—আর একটা কথা সরকার মশাই। শীলা রায় বললে না নাম, নতুন উর্বশীর?

বললাম—হ্যাঁ।

—কেমন মেয়ে কে জানে! দেখতে শুনতে একটু ভালো হওয়া দরকার। অবশ্যি পৌরাণিক পালা, পাকা রঙ্‌কাম করলে সব দোষ ঢাকা পড়ে যাবে। তবে, গড়ন-পেটনটা ভালো হলে একটু সুবিধে। আমাদের সুশীলের বাপু সে সব আছে। সাজলে বেশ মানায়। কি বলেন?

বললাম—তবে উর্বশীকে নিয়ে আপনার ভাবনা নেই। গড়ন পেটনও ভালো, গায়ের রঙ্‌ও ফরসা।

চোখ বড়ো-বড়ো করে বললেন—সে কী গো! আপনিও চেনেন নাকি মেয়েটাকে?

বললাম—আপনিও চেনেন।

মানে?

বললাম—শীলা রায় ওর পোশাকী নাম। আপনাকে যে চিঠিটা দিয়েছিল আমার হাত দিয়ে, তাতে পোষাকী নামটা দেয়নি, ডাক নামটাই সই করেছিল।

—তার মানে, তুমি বলতে চাও—

বললাম—হ্যাঁ। শীলা রায় হচ্ছে পক্ষি।

ছোটবাবুর কর্মক্ষমতার বাস্তবিকই প্রশংসা করতে হয়। পরদিন বিকেল চারটের সময় ঘরখানা একেবারে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। ভিতরে মেঝেতে একটা সতরঞ্চ পেতে দেওয়া হয়েছে, তাতে আর তক্তাপোষে

ছড়িয়ে এসে বসেছে দলের প্রধানরা, মেয়েরা আর মওড়ার সখী। বাকী সব জটলা করে ঘরের বাইরে, বারান্দায় আর সিঁড়ির ধাপে।

আমি মাথা নীচু করে লিখে চলেছি। একটা করে রসিদের মতো বিলএ সই করতে হবে সবাইকে। আমার হাতবাক্সে কিছু দশ-পাঁচ আর দু'টাকা একটাকার নোট রাখা হয়েছে, খানকয়েক বড়নোট অর্থাৎ একশো টাকার নোটও আনা হয়েছে। সবাইকে কিছু কিছু আগাম দিয়ে কনট্রাক্ট সই করানোর কথা। বড়বাবু একপাশে আজ আসনপিঁড়ি হয়ে বসে। তাঁর ডানপাশে আমার চেয়ারে আমি, বাঁপাশে ছোটবাবু আর নম্বরবাবু অজিত দাস। আর অন্য দিকে চারটি মেয়ে ও মওড়ার সখী।

কিন্তু যিনি তাকিয়া আশ্রয় করে হেলান দিয়ে সগৌরবে বসে রয়েছেন, তিনি আমাদের বয়সীই হবেন, হয়ত কিছু বড়োও হতে পারেন। মাথায় প্রকাণ্ড টাক। দীর্ঘ, দোহারা চেহারা। শুনলাম, থিয়েটার জগতের ইনি বিখ্যাত নট—সুধীর ব্যানার্জী। থিয়েটার ছেড়ে এই প্রথম যাত্রায় এলেন। ঘরবার সময় খাওয়া-থাকা বাদে মাসিক ন'শো টাকা মাইনে। এক বছরেব কনট্রাক্ট। যাত্রার এক বছর মানে আসলে আট মাস। এটাকেই এক বছর ধরা হয়। কোনো কোনো কোম্পানী তিন বছরের কনট্রাক্ট করছে, তবে তার মানে প্রতি বছরে আট মাস ধরতে হবে, বাকী চার মাস বিনে মাইনেয় বসে থাকা, তবে ও চার মাস ইচ্ছে করলে সবাই ঘরে বসে কিছু কিছু কবে দাদন নিতে পারে। আমাদের কোম্পানী এক বছরের বেশী করতে চায় না। ছোট বাবু সে নিয়ম বহাল করলেন।

সুধীর ব্যানার্জি তাঁর নিকেলের সিগারেট কেস থেকে সিগারেট বার করে ধুমোদ্গীরণ করতে করতে বললেন—কিন্তু, আমার সেই আসল কথাটা মনে আছে তো?

আমি আর বড়বাবু দৃষ্টি বিনিময় করলাম। ছোটবাবু বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ তা আছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন জানাজানি হবে না।

ব্যাপারটা হলো, উনি যে নশ' টাকা নিচ্ছেন, সে কথাটা কারুর কাছে ব্যক্ত করা হবে না। সবাইকে বলা হবে, চৌদ্দশ টাকা। তা না হলে বাজার দরটা ওঁর খারাপ হয়ে যেতে পারে। এবং এই কথাটা বলার জন্যই উনি বেশ কিছুক্ষণ আগে এসেছিলেন, যখন ভীড় তেমন জমে নি। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে, একথা চাপা থাকল না। যাত্রার দলের নিয়মই হচ্ছে, প্রথমে সব কথা গোপন রাখার একটা প্রাণপণ চেষ্টা করা হয়, কিন্তু দিনকতক পরে দেখা যায় কথাটা

আর গোপন নেই, একে একে সবাই জেনে গেছে। এক্ষেত্রেও তাই হলো। একের পর এক প্রায় সবাই দেখা করলেন, বিশেষ করে মাথা কয়জন। বললেন—একটা গোপন কথা ছিল।

—বলুন।

—একটু যদি বাইরে আসেন।

আমাকে আর ছোটবাবুকে একসঙ্গে বাইরে নিয়ে গিয়ে বললেন—ওঁর চৌদ্দশ' দিচ্ছেন, আর আমরা যাত্রাওয়ালা বলে হটাও হয়ে যাবো?

—ম্যানেজারবাবুর কাছ থেকে কন্ট্রাক্টা গোপনে দেখে যান। মান রাখবার জন্য চৌদ্দশ' বলা হচ্ছে, আসলে দেওয়া হচ্ছে নশ'।

নটতিলক অজনাথ বোস বললেন—তাহলে আমারও তাই করুন। আমার পাঁচশ' আর কাউকে বলবেন না, বলবেন—আটশ' টাকা।

—বেশ তাই হবে।

এরপর এলেন অন্য অভিনেতারা। পালান মাইতি, সর্বশেষ ঘডুই। আর নাচের মাষ্টার কানাই ধর। সবারই ঐ এক ব্যাপার। মাইনেটা একটু বাড়িয়ে বলতে হবে সার। নইলে মান থাকে না।

যাই হোক সবাইকে এভাবে সামলে নিয়েছিলেন ছোটবাবু। বড়বাবু বসে। বসে সবই লক্ষ্য করেছিলেন, তবে মুখফুটে বলেননি কিছুই। বোধহয়, এসব ব্যাপার তার পক্ষে অনুমান করা অসহজ হয়নি।

কিন্তু যা বলছিলাম। ছোটবাবু বললেন—আপনিই তা হলে আগে সই করুন সুধীরবাবু।

সুধীরবাবু তাকিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। নীচের সবাই একটু একটু সরে বসে ওঁর যাবার যায়গা করে দিচ্ছেন। ছোটবাবু বলে উঠলেন—থাক থাক, আপনি বসুন না। খাতাটিই বরং আপনার দিকে এগিয়ে দিচ্ছি।

—না, ও কেন? সুধীরবাবু বললেন—আমরা থিয়েটারের লোক, আমাদের একটা ট্রেনিং আছে। আমিই উঠে খাতার কাছে যাবো, খাতা আসবে কেন? তা ছাড়া

বলে, আমার দিকে ইঙ্গিত করে বলে উঠলেন—উনি যখন ম্যানেজার, উনি আমার 'বস্', আমার নমস্য। না—না, ডিসিপ্লিন মানতে হবে বই কী।

সত্যি কথা বলতে কী, মনে মনে আমিও বিস্ময়াপ্লুত না হয়ে পারিনি। উনি আমার কাছে এসে যেখানে যা সই করবার করলেন। এড্‌ভান্স পাঁচশ

টাকার দরুণ রেভেনিউষ্ট্যাম্প মারা ভাউচারে সই করে পাঁচখানা বড়োনোট আমার হাত থেকে নিয়ে ব্যাগে পুরলেন।

বললাম—আপনার বিল নিন।

—বিল ?

—কনট্রাক্টের যে অংশটা ছিঁড়ে আপনাকে দিচ্ছি, ওটাকে সবাই বলে বিল।

উনি হেসে বললেন—ও, আচ্ছা। বেশ, দিন।

তারপরে নিজের আসনে গিয়ে বললেন,—আজ তা হলে উঠব এবার। কবে থেকে রিহার্সাল ?

ছোটবাবু বললেন—বেস্পতিবার।

—বেশ। বিষ্যুবস্তু গুরুবার, ভাল কথা। যে বাড়িটা আসবার সময় দেখালেন, ঐ বাড়ির দোতালার কোণের ঘরখানা, কেমন ? ওখানেই মহড়া বসবে তো ?

—হ্যাঁ।

—আমি কী করব, কেশী দৈত্য ?

—হ্যাঁ

—তা কী রকম পার্ট ?

কে যেন বলেন, তা প্রায় ষাট নম্বর হবে।

একটু হাসলেন সুধীরবাবু—ও, সংলাপের পরিমাণ ধরে নম্বর বলা হয় বুঝি ? সংলাপ নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। দিন না কতো দেবেন। মুখস্থ বিদ্যেটা আছে। তা নয়, আমি বলছি, কী ধরণের পার্ট কেশী দৈত্য ? অর্থাৎ নাট্যকার কী দৃষ্টিতে দেখেছেন দৈত্যকে ? Tyrant ? Tyrant হলে আমি সহজেই জ্বালিয়ে দেবো।

ভাল। যা বলছিলেন সুধীরবাবু, ওঁর পক্ষে অত্যন্ত সঙ্গত কথা। তবু ওঁর কথার ধরণ দেখে আমার মিড সামার নাইটস ড্রিম-এর সেই বটম তাঁতীর কথা মনে পড়ে গেল। পিটার কুইন্সকে সে ঠিক এমনি ধরণের কথাই জিজ্ঞাসা করেছিল, yet, my chief humour is for a tyrant!—বলেছিল, I could play a part to tear a cat in to make all split

কিন্তু, ওঁর প্রশ্নের উত্তরে সবাইকে নীরব ও বিস্ময়াপন্ন লক্ষ্য করে সুধীর ব্যানার্জী আবার বলে উঠলেন,—না—না, ব্যাপারটা আমায় জানতে হবে। কেশী-দৈত্যের একটা conception নিতে হবে তো ? নাট্যকার কোথায় ? তাকে পেলে ভাল হতো।

ছোটবাবু বললেন—নাট্যকারকে পাওয়া যাবে না। আপনি পার্টটা পড়ে নেবেন সমস্ত।

—না—না, তার দরকার নেই।—সুধীর ব্যানার্জী বললেন—আচ্ছা ঠিক আছে। পার্টটা তো হাতে আসুক, আপনারা রয়েছেন, পরামর্শ করে ঠিক করে নেওয়া যাবে। আচ্ছা, আজ চলি।

ছোটবাবুও ওঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়াচ্ছেন দেখে উনি বলে উঠলেন—না—না, আপনাকে আসতে হবে না। আপনারা কাজ করুন। চলি, নমস্কার।

যেতে গিয়েও ফিরে বলেন—হ্যাঁ, একটা কথা। মালিকরা রয়েছেন, আপনাদের সামনেই কথাটা এই বেলা পরিষ্কার করে নিতে চাই। দেখুন, থিয়েটার যাত্রার লাইন, অনেকের আবার পানদোষ থাকতে পারে, কিন্তু আসরে কিম্বা সাজঘরে ওসব চলবে না। কিছুতেই না। থিয়েটার থেকে বহুদিন আমরা ওসব তাড়িয়ে দিয়েছি।

আশ্চর্য, এত বড়ো কথাটাতেও কেউ উচ্চবাচ্য করলেন না, নটতিলকেরা পর্যন্ত না। সবাই বিস্ফারিত নেত্রে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। উনি ততক্ষণে দু'হাত জোড় করে মাথার ওপরে তুলে বললেন,—আচ্ছা, চলি এবার। সবাইকে নমস্কার।

চলে গেলেন। মনে হলো, সবাইকে যেন অভিভূত করে গেলেন। শুধু মেয়েদের মধ্যে শীলাই একমাত্র মুখ নীচু করে বসে আছে। মনো হলো, ওঁর ঠোঁটের কোণে যেন মৃদু একটু হাসি লক্ষ্য করলাম। অবশ্য, এটা আমার ভুলও হতে পারে।

কিছুক্ষণ পরে নীরবতা ভঙ্গ করলেন ছোটবাবুই প্রথম। বললেন—এবার মেয়েদের ব্যাপারটা শেষ করে নেওয়া যাক। ওদের প্রত্যেকেরই কাজ আছে। বেশীক্ষণ অনর্থক আটকে রেখে লাভ নেই।

নটতিলক অম্বুজনাথ প্রবীণ ব্যাক্তি। একটা পান মুখে পুরে মাথা নেড়ে বলে উঠলেন—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

ছোটবাবু বাবু ডাকলেন—শীলা দেবী!

শীলা মুখ তুলল, গম্ভীর, চশমা-পরা মুখখানা।

শুনলেন তো সব?

শীলা উত্তর দিলো—হ্যাঁ। কিন্তু, আমার কথাটা আমি সবার শেষে বলতে চাই। কারণ, আমি একটু বসব। কনট্রাক্ট ফর্ম অবশ্য লিখে দিতে পারেন, আমি সই করে দিচ্ছি। যে-টাকা বলেছেন, তাতেই আমি রাজী

তবে, বাইরেও ঐ পাঁচশোই বলবেন, কারুর কাছে বাড়িয়ে বলার দরকার নেই।

এ'কথায় একটু অবাক হয়েই ওর মুখের দিকে তাকালাম আমি।

ছোটবাবু বললেন—বেশ। তাহলে অন্যদের সঙ্গে কাজগুলো সেরে নিই একে একে।

—নিশ্চয়ই।

—মালতী দেবীরটা আগে লিখুন ম্যানেজারবাবু। শীলা দেবীরটা না হয় একটু পরেই হচ্ছে। মালতী দেবী, শুনলেন তো সব?

মালতী শীলার থেকে একটু বড়ো হবে, ঈষৎ স্থূলাঙ্গিনী। মুখাখানি হাসি হাসি। সাদা ধব ধবে একটা থান পরে এসেছিল। হাতে এক-গাছা করে সোনার চুড়ি, গলায় সরু হার। ওর দিকে খাতাটা এগিয়ে দিলাম। ছোটবাবুর হাত দিয়ে টিপসই করে দাদনের একশো টাকা নিয়ে চলে গেল।

পরবর্তী মেয়েটির নাম বীণা। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়স হবে—ছিপ্‌ছিপে গড়নের। তারপরের মেয়েটিও ওর বয়সী, তবে দোহারা গড়নের, রঙও ফর্সা, মুখশ্রী অনেকটা শান্তধরণের। নাম বললে--চোরী, অর্থাৎ চারুবালা।

একে একে তিনটি মেয়েই চলে গেল। নটতিলক অম্বুজবাবু, পালানবাবু, আর সবাই চলে গেলেন, ঘর প্রায় শূন্য, আমরা শীলা আর মওড়া-সখী ছাড়া। ওর নাম কান্ত। বয়স তেরো-চৌদ্দ। একটা লাল ফিতেপাড়ের ধুতি আর নীলরঙের হাফশার্ট পরে এসেছিল। বড়বাবু আবার তাকিয়া আশ্রয় করে অর্ধ-শয়ানে অবস্থান করছিলেন ততক্ষণে। ডেকে বললেন—কী হে কান্তরাণী, তুই গেলি না যে বড়?

কান্ত একটু সলজ্জ ভাব ধারণ করে বলে উঠল—বড়বাবু, একটা কথা ছিল।

—কী কথা? তোদের তো বিল পাওয়া হয়ে গেছে। কানাইমাষ্টার আগাম টাকা তো নিয়ে গেল তোদের জন্য। তবে?

—তা নয়,—ইতস্ততঃ করে কান্ত বললে—আমাকে এবার অন্তত খান দুই একানে গান দিতে হবে।

বুঝলাম ওর কথাটা। পালার কোন কোন অংশে ও যাতে একা গান গাইতে পারে, তার আবেদন করছে। জনান্তিকে বলে রাখি, বড়বাবু নিজে ছোটবেলায় 'সখী' ছিলেন বলে ওঁর এই সখীদলের ওপর একটু পক্ষপাতিত্ব আছে। বিশেষ করে মওড়া-সখী কান্ত ওঁর বিশেষ স্নেহভাজন।

—বেশ, বেশ !—বলে, ছোটবাবুর দিকে ফিরে বড়বাবু বললেন—কী হে, পারো না কি ঢোকাতে কোথাও ?

ছোটবাবু ছিলেন সখীদের ব্যাপারে বাপের বিপরীত। নেহাৎ বড়বাবুর দুর্বলতার কথাটা জানা আছে তাই, নইলে সখীর দল উনি উঠিয়েই দিতেন। পরে আমাকে বহুবার বলেছেন—জানেন ম্যানেজারবাবু, এই সখীদের নাচ-গান আমার একেবারে চোখের বিষ।

—সে পরে দেখা যাবে'খন।—বলে উঠে দাঁড়ালেন ছোটবাবু। বললেন—আমি চলি। হাতে অনেক কাজ। বেস্পতিবার থেকে মহড়া শুরু করতেই হবে। শীলা দেবী, আপনি ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে আপনার কাজটা সেরে নেবেন। নমস্কার।

নম্বরবাবু অর্থাৎ অজিত দাসকে সঙ্গে করে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ছোটবাবু।

বড়বাবু বললেন—তুই এক কাজ কর দেখি কান্তু, দৌড়ে একবার ভড় কোম্পানীতে উঁকি মেরে দেখে আয় তো, সুশীল ওখানে বসে আছে কি না।

কান্তু ছুটে বেরিয়ে গেল।

আমি মাথা নীচু করে ততক্ষণে পঙ্কির তথাকথিত 'বিল' লেখাটা শেষ করে ফেলছিলাম।

বড়বাবুই প্রশ্ন করলেন—কী বলে ডাকব তোমাকে, শীলা না পঙ্কি ?

একটু হেসে পঙ্কি বললে—আপনাদের দুজনের কাছে আমি পঙ্কিই, শীলা হবো কেন ?

বড়বাবু বললেন—অনেকদিন পরে তোমাকে দেখলাম, একটু রোগা হয়েছ বলে মনে হচ্ছে।

—তাই নাকি ! তাহলে তো ভালই।—বলেই একটু হেসে উঠল, তারপরে আবার বললে—উর্বশী মানাবে।

—তোমার মা কেমন আছে ?

—ভালোই।

বড়বাবু পুনর্বার প্রশ্ন করলেন—তা, এখানে এলে কী করে ? চাকরী করবার ইচ্ছাই যদি ছিল তো সরাসরি আমার সঙ্গে এসে দেখা করলেই পারতে। তোমাদের আমি ভুলব কেন ? এই দেখ না তোমার কত্তাকে চিঠি দিয়ে পাঠালে, সঙ্গে সঙ্গে আমি কাজে বসিয়ে দিলাম। হুঁ হুঁ চালাকী নয়, একেবারে সরকার মশাই। ছেলে বলে, ম্যানেজারবাবু।

কিন্তু ওঁর অসতর্ক উক্তিতে আমি যতটা না বিস্মিত হয়েছিলাম, তার থেকেও বিস্মিত হলো পঙ্কি, বললো—কত্তা! কত্তা কে আমার!

বৃদ্ধ মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসতে লাগলেন, বললেন—বুঝেছি গো, চুল পাকালাম এ লাইনে, আর ওটুকু বুঝব না! একেবারে চাকরীর জন্য চিঠি দিয়ে পাঠায় লোকে কাকে, তার আপনজনকে ছাড়া?

পঙ্কি তাড়াতাড়ি বললে—উনি আমার দাদার মতো। ছোটবেলায়—

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন বড়বাবু—পাতানো দাদা তো? ও আমার জানা আছে। আরে, আমাকে অত লজ্জা করবার দরকার নেই, আমিও তো যাত্রাওয়ালা!

পঙ্কির ফরসা মুখখানা এবার যেন একটু লাল হয়ে উঠল। সে একটু হেসে বললে—অথচ, বিশ্বাস করুন, সেই যে চিঠি নিয়ে এসেছে, তারপর থেকে ওর সঙ্গে আমার একটিবারের জন্যও দেখা হয়নি।

—সে কী! বড়বাবু বললেন—তাহলে এখানকার কাজের খবর তুমি পেলে কি করে?

পঙ্কি আবার হেসে বললে—আপনি কি মনে করেছেন উনি আমাকে ভিতরে ভিতরে খবর দিয়ে নিজের দলে আনিয়েছেন? সেই বান্দাই নন! দেখুন না এত যে কথা হচ্ছে, একটুও সাড়া পাচ্ছেন ওর কাছ থেকে? চিরকালটা একভাবে গেল। সারাটা জীবন জ্বালিয়ে খেলে।

বলে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে রীতিমতো হাসতে লাগল পঙ্কি আমার দিকে চোখ রেখে।

আমি যে তখন কী নিদারুণ অস্বস্তি অনুভব করছিলাম শচীনবাবু, তার আর কি বলব আপনাকে। ও এমন ভাবে কথাগুলি বলছিল, যাতে ক'রে গোকুলবাবুর আন্দাজটা আরও দৃঢ় হয়ে গেল। অথচ মুখ ফুটে যে প্রতিবাদ করে উঠব এমন অবস্থাও নয়, দু'হাত দিয়ে আমার কণ্ঠনালী যেন চেপে ধরে রেখেছে কেউ। এমনিতে আমার স্বভাবই হয়ে গিয়েছিল কম কথা বলা, বিশেষ করে এদের এখানে এসে যাত্রাদলের এই বিচিত্র পরিবেশে।

আমি দুহাতে মাথাটা চেপে ধরে বসে আছি। পঙ্কি হাসি থামিয়ে বললে—আসলে ব্যাপার কী হয়েছে জানেন বড়বাবু? সেই যে চাকরী হবার খবরটা একদিন গিয়ে জানিয়ে দিয়ে এলো, তারপরে আর ও রাস্তায় হাঁটেই নি। বুঝতেই পারছেন, ঝগড়া করে এসেছে আর কী।

মাথা থেকে দুটি হাত নামিয়ে কণ্ঠে জোর এনে বলে উঠলাম—এসব কী যা তা বলছ তুমি!

আমার ওপরে গলা চড়িয়ে প্রায় ধমকই দিয়ে উঠল পঙ্কি—তুমি চুপ কর তো! ধাড়া মশাই-এর কাছে কিছু ঢাকাঢাকি করতে যেও না, উনি আমাদের প্রকৃত বন্ধু।

হা-হা করে হেসে উঠলেন গোকুলবাবু, বললেন—দেখলেন তো সরকার মশাই, বুড়ো হয়েছি, চোখ আমার ভুল দেখে না। আরে, এসব দেখে দেখেই চুল পাকালাম যে!

আমি কী যেন আবারও বলতে গিয়েছিলাম, কিন্তু কী মনে করে আর সূত্রপাত করলাম না। মনে হলো, হয়ত কোন ফলই হবে না। আর অভিনেত্রী শীলা রায় আবার কী নতুন মিথ্যার জাল রচনা করে বসবেন কে জানে, তাতে আরো বেশী লজ্জায় পড়ে যাবো।

ততক্ষণে গোকুলবাবু অবতারণা করে বসেছেন সম্পূর্ণ এক নতুন প্রসঙ্গের। শুনতে পেলাম তিনি বলছেন—যাত্রাওয়ালা আমি, আমার কাছে সবই খোলাখুলি কারবার। তুমি কিছু মনে করো না মালক্ষ্মী, প্রাণের দায়ে জিজ্ঞেস করছি। ঘরপোড়া গরু কি না? ভুবন তোমাকে সত্যি-সত্যি ছেড়েছে?

মুখখানা একটু নামিয়ে সলজ্জ ভঙ্গিতে উত্তর দিলো পঙ্কি—হ্যাঁ, অনেকদিন।

—ও এখন কী করে, কোথায় যায় জানো?

—শুনেছি। তবে অপনাকে বলাটা কী ঠিক হবে?

গোকুলবাবু বললেন—কাকে বলছ? আমার কথা কিছু কিছু আর কি তোমার মায়ের কাছ থেকে শোননি? নিশ্চয়ই শুনেছ। নইলে এই সরকার মশাইয়ের চাকরীর জন্য মায়ের লেখা চিঠির পৃষ্ঠায় মেয়ে চিঠি লিখে দেয়?

মুহূর্তের জন্য পঙ্কি আমার চোখের দিকে একবার তাকালো। আমি নীরব থাকা শ্রেয় মনে করে তখনো চুপচাপ আছি। কিন্তু ভিতরটা যেন বিতৃষ্ণায় ভরে যাচ্ছিল। আমার শিক্ষা-দীক্ষা রুচি নিয়ে এদের সঙ্গে মানিয়ে চলা যে কতো কঠিন তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না শচীনবাবু। তবে, আজ অন্য কথা মনে হয়। আজ মনে হয়, এরা রুচিহীন বলে এরা কথা বলে খোলাখুলি ভাবে বটে, কিন্তু এদের বাইরে এই যে নাগরিক সভ্যতার তথাকথিত স্রোতধারা বিরাজমান, সেখানেও উচ্চাঙ্গের কোনো রুচির পরিচয় পাওয়া যায় কী? হয়ত তাদের ভাষাটা অনেক মার্জিত, এই যা।

পঙ্কি বললে—নাকী বীণা বলে যে একজন আছে মসজিদ বাড়ী স্ট্রীটে, মেজবাবু নাকি—

—বুঝিছি। গোকুলবাবু বললেন—দোষ দিই না। সবই আমার কৃতকর্মের ফল। ঢিল মেরেছি, আজ আমাকে পাটকেলটা খেতে হবে বই কী! তা' মালক্ষ্মী, ছোটবাবুই তোমাকে এনেছে?

—হ্যাঁ।

—তাকে চিনলে কী করে?

পঙ্কি বললে—কখনো চিনতুম না। আমি একটা ক্লাবের হয়ে ষ্টারে প্লে করছি, সেদিন বুঝি ছোটবাবুও নেমন্তন্ন পেয়ে দেখতে গিয়েছিলেন। আমার প্লে দেখে একেবারে সাজঘরে এসে কথাবার্তা কয়ে চলে যান।

—তোমার বাড়ী যায় নি?

—না। উনি যাননি, তবে আজ যে আসতে হবে, সে খবরটা একজনকে দিয়ে উনি পাঠিয়েছিলেন।

—সেই একজন কে বলো তো? এখানে দেখলে তাকে?

—কই, না তো?

আমার দিকে ফিরলেন বড়বাবু, বললেন—তাহলে ঐ ছোকরাকে পাঠায় নি, মানে আমি প্রম্প্‌টার অজিতের কথা বলছি।

বললাম—অনন্ত-টনন্ত কাউকে পাঠিয়ে থাকবেন।

অনন্ত হচ্ছে আমার সহকারী। পরবর্তীকালে দেখেছি অদ্ভুত করিৎকর্মা লোক সে। দল বাইরে যাবার সময় রেলে মাল বুক করা, টিকিট কাটা, কিম্বা আসরে গিয়ে সাজঘর ঠিক করে রাখা—অনন্ত থাকতে আমার ভাবনার আর কিছু থাকে না। অনন্তকে আজ অবশ্য আসতে বলা হয়নি। সে হচ্ছে আবার আমার মত বারো মাসের মাইনের চাকর। ঐ সব —কনট্রাক্ট আমার মতো তাকেও সই করতে হয় না। অনন্তর উপাধিটিও ভাল—দলপতি। অনন্ত দলপতি। বছর তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছর বয়স হবে, লম্বা রোগা মতন কিন্তু পাকাপোক্ত চেহারা। দরকার হলে মুখে রঙ্‌-মেখে ছোট খাট পার্টও চালিয়ে দেয়।

গোকুলবাবু হঠাৎ অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন পঙ্কির দিকে। ঈষৎ নিম্ন কণ্ঠে বললেন—কী বুঝছ মালক্ষ্মী, শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ লাগবে না তো?

চট্‌ করে আমার চোখের দিকে তাকালো পঙ্কি, পরক্ষণেই চোখ তুলল

মাথার ওপরে কড়ি কাঠের দিকে। অতি কষ্টে যেন সে হাসি গোপন করে নিলো মনে হলো। তারপরে বললে—না।

এ ধরণের ইঙ্গিতপূর্ণ কথা যাত্রা-থিয়েটারের জগতে ভয়ানক চলতি আছে, নতুন লোকের পক্ষে অভ্যস্ত না হলে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ওঠা কঠিন।

বড়বাবু ততক্ষণে তাঁর পরবর্তী প্রশ্নটি উত্থাপিত করেছেন,—হ্যাঁ, মালক্ষ্মী, তুমি তো থিয়েটার করতে, শেষ কালে যাত্রায় এলে ওদের কথায়?

বোধহয় কোন সঙ্গত উত্তর দিতে গিয়েছিল শীলা। কিন্তু বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে কী বুঝল কে জানে, একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ হেসে উঠল আপন মনে। তারপর আমাকে চোখের ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলে উঠল—এই ওঁর জন্য। বেটাছেলে ঝগ্‌ড়া করে দূরে থাকতে পারে, মেয়েলোক হয়ে আমি তা পারব কতক্ষণ? আপনাকে সত্যি কথা বলব? কিছু মনে করবেন না?

—না মালক্ষ্মী, তুমি বলো। আর আমার কাছে কিছু লুকিয়ো না, আমি তোমার কত্তাকে তোমার চেয়ে কিছু কম ভালবাসি না; অবশ্যি ওঁরই গুণে।

তেমনি করে সমানে হাসছে পক্ষি, বললে—তাহলে গুণবান লোককেই পাঠিয়েছিলুম, বলুন?

—নিশ্চয়ই! সে কথা একশোবার। গোকুলবাবু সোজা হয়ে বললেন—ওঁর সামনেই বলছি, খুব বিশ্বাসী, আর খুবই রাশভারী ব্যক্তি, দলের লোকেরা বেশ ভয় করে। হবেই বা না কেন, বিদ্যে রয়েছে তার ওপরে ব্রাহ্মণ। তা কী বলেছিলে যেন, মা লক্ষ্মী?

শীলা উত্তর করল—যখন ওঁরা সেদিন ষ্টারে সাজঘরে গিয়ে প্রস্তাব করলেন, আমি তো যাত্রার নাম শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিলাম। পরে যেই শুনলাম—আপনার নাম, আপনার কোম্পানী, তক্ষুণি রাজী হয়ে গেলাম। ভাবলাম, বিধাতা যদি গুণনিধিকে ফিরিয়ে দেবার বন্দোবস্তই করেন, আমি কেন হন্তারক হয়ে দাঁড়াই নিজের পথে নিজে।

আর থাকতে না পেরে এবার বলে উঠলাম—মাপ করবেন বড়বাবু, এসব বাজে কথা এখানেই বন্ধ করলে হয় না?

আমার কণ্ঠস্বরে উষ্মার উত্তাপ লক্ষ্য করে আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে হেসে উঠলেন বড়বাবু। তারপর পক্ষির দিকে ফিরে বললেন—রাগ কিন্তু এখনো পড়েনি মালক্ষ্মী, অনেক সাধতে হবে।

মুখ টিপে টিপে নীরবে হাসতে লাগল পঙ্কি।

বড়বাবু আবার বললেন—তোমার পাঁচশো আর ওঁর আড়াইশো, সংসার ভাল ভাবেই চলে যাবে, কী বলো? অবশ্য সাধাসাধি করে যদি ওঁকে এবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারো। তা এবার উনি যাবেন।

পঙ্কি হেসে বললে—কী যে বলেন! ওর নিজের সংসার নেই? কিছুই বলে নি বুঝি আপনাকে।

—না।

পঙ্কি বললে—ঐ এক ধরণ। মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলবে না।

বড়বাবু বললেন—ভাল। আমাদের মত খল্‌বলে নয়, যা মুখে আসে তাই বলে গেলাম। হাজার হলেও পেটে বিদ্যে আছে, আমাদের মত গো-মুখ্‌খ্যু তো নয়।

আমি অতি কষ্টে নিজেকে সামলে চুপ করে রইলাম। হঠাৎ মনে হলো, এ আচরণের পিছনে পঙ্কির কোন উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। দেখাই যাক না, কথাবার্তার স্রোত শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকে।

পঙ্কি বললে—হাড় জিরজিরে বউ আর পাঁচটি ছেলেমেয়ে। তিনটি মেয়ে, দুটি ছেলে।

মনে মনে হাসিও পেল। আমার স্ত্রীকে কোনদিন দেখে নি পঙ্কি, দেখবার কথাও নয়। হাড় জির জিরে সে নয়, অবশ্য পঙ্কির মতো ফরসা বা স্বাস্থ্য-বতীও নয়। তবে, ছেলেমেয়েদের কথা ঠিকই বলেছে পঙ্কি, কথায় কথায় ওকে হয়ত বলেছিলাম।

গোকুলবাবু বললেন—সংসারও আছে, আবার ভাবের মানুষও আছে! সরকার মশাই তো আমাদের মতোই খলিফা ব্যক্তি-দেখছি বটে হে!

ব'লে হো হো করে হেসে উঠলেন। আমি কণ্ঠে জোর এনে বললাম—বিশ্বাস করুন, মিথ্যে কথা।

বড়বাবু বললেন—মিথ্যেই তো, এক সঙ্গে তো থাকা হয় না! খলিফা-গিরির কথাটা তো মিথ্যেই। তবে, মনের রঙ্ বলে কথা গো সরকারমশাই ও না দেখা হলেও টিকে থাকে।

পঙ্কি বলে উঠল—পুরুষমানুষ তো আর সেকথা বোঝে না। বাইরে থেকেই সবটা বিচার করে। আমরা যা-ই হই, মন বলে একটা পদার্থ আছে তো, না কী?

এমন গম্ভীর স্বরে কথাগুলি বলে গেল যে, শুনে মনে হচ্ছিল, কথাগুলি বোধহয় সত্যই।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। ঘরটা অন্ধকার মনে হচ্ছিল। সুইচ টিপে আলোটা জেলে দিলাম। বড়বাবু আলোর বাল্বের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে বললেন—এবার উঠতে হয়। কিন্তু, সুশীলের কী হলো? কান্তকে পাঠালাম যে খোঁজ করতে!

দরজার বাইরে থেকে একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—আজ্ঞে, আমি এসেছি বড়বাবু।

—কোথায় গেছলে? তখন আসনি কেন? কান্তকে পাঠিয়েছি তোমায় খুঁজতে। কোথায় সে? কোথায় তোমাকে খুঁজে পেল?

বড়বাবুর এতগুলির প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যেন থতমত খেয়ে গেল সুশীলরাণী। তারপর একটু থেমে থেকে বললে—কান্তকে পাঠিয়েছেন বুঝি? সে আমাকে খুঁজে পাবে কোথায়? আমি ছাতে উঠে বসেছিলুম।

—ছাতে! কেন?

—কেন নয়,—সুশীলরাণী বললে, দিদিরা এসেছেন, ওনাদের সামনে আমাকে মেয়ে সাজবার হুকুম দেবেন তো?

পক্ষির ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল, সে একবার সুশীলের দিকে তাকিয়ে চোখ নামাল। সুশীল অবশেষে তাকেই উদ্দেশ্য করে বলে উঠল—দেখুন তো দিদি, কোথায় আপনারা আর কোথায় আমরা! আপনাদের পাশাপাশি আসরে দাঁড়ালে আমাদের মানাবে? কথায় বলে—'মানুষ যখন চিনবে আসল, নকল নকল অনেক ধকল!'

পক্ষি একটু দ্বিধার পর বললে—কথাটা হয়ত ঠিক, কিন্তু আসল চেনাও সোজা নয়। লোকে সাধারণতঃ নকলকেই আসল বলে ভুল করে। হয়ত দেখবেন, আসরে আপনি নকল হয়েও আসলকে ছাড়িয়ে যাবেন অনেক বেশী।

—এটা মন্দ বলনি মা!—তারপর এই সময় কান্তকে প্রবেশ করতে দেখে বড়বাবু বলে উঠলেন —কাঁরে, ভড় কোম্পানী কী বললে?

—বলল, তোদের মতো আমরা মেয়ে নেবনি। আমাদের ট্যারা মধু আছে, গোরা-মাণিক আছে, তাদের কাছে দাঁড়াবে কোন্ মেয়ে, এ্যাঁ?

সুশীল বাধা দিয়ে বলে উঠল—কেন বললিনি? একা সুশীলরাণী ওদের সবার মণ্ডা নিতে পারে।

কান্ত বললে—তাহলে সত্যি কথাটা বলব?

—বল না।

কান্ত বললে—ওদের গানের মাষ্টার পাচুদা আমাকে বললে—সুশীলকে হারাতে হবে।

সুশীল বললে—বড়বাবু, আমার কী করলেন? দেখলেন তো, ভড় কোম্পানী আমাকে চায়?

বড়বাবু বললেন—তোমার সঙ্গে তো কথা আমার ঠিক হয়ে আছে। সেদিন তো আর নেওয়া হলো না। আজ সই করে তোমার বিল নিয়ে নাও সরকার মশাইয়ের কাছ থেকে। তবে, আজ সন্ধ্যে হয়ে গেছে আজ নয়, কাল নিও। দিনক্ষণ মেনে চলাটা ভালো।

—আহা, আমি তা বলছি না।—সুশীল বললে—চরণ যখন আশ্রয় করেছি, আশ্রয় করেই থাকব। কিন্তু নম্বর বলব কী? শুনলুম পাঁচটি ফিমেল রয়েছে এ পালায়, তার চারটী মেয়েই তো নিলেন, ও আর একটির জন্য আবার আমাকে কেন, ফিমেলই আর একটী নিয়ে নিন না।

বড়বাবু এবার একটু বিরক্ত হয়েই বলে উঠলেন—দেখ সুশীল, ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করো না। যা তোমাকে দেয়, তাই তুমি করবে। তোমাকে রাখবার জন্যই হয়ত ছোটবাবু আর কোন ফিমেল নেয়নি। খারাপ নম্বর তুমি পাবে বলে তো আমার মনে হয় না। তাছাড়া আমাদের পুরানো বইগুলো রয়েছে না? অন্ততঃ কাব্যশাস্ত্রী মশায়ের 'দধীচির আত্মত্যাগ' খানা আমরা ছাড়ব না। ওটা হিট্।

যাই হোক্, কথাবার্তার মাঝখানে এক সময় পঙ্কি দুহাত জোড় করে ওঁকে নমস্কার জানিয়ে বললে—উঠি।

—এসো মালক্ষ্মী।

তারপরেই বড়বাবু আমার দিকে ফিরে ইঙ্গিত করে বললেন—সঙ্গে যান।

আমি বলে উঠলাম—না-না আমায় যেতে হবে না। উনি একাই—

পঙ্কি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে—তাই কি হয় নাকি! আর লোক হাসাতে হবে না। এসো।

ওর কথা শুনে সুশীল আর কান্ত হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল।

বড়বাবু বললেন—যান। আমি সুশীল আর কান্তর সঙ্গে বসে একটু গল্প করি, বুঝলেন গো সরকারমশাই?

আমি মাথা নীচু করে বেরিয়ে এলাম ওর পিছনে। পথে ও কোনো কথা বলছে না, আমিও না। চীৎপুরের পথ ছাড়িয়ে সামনের মোড়ে এসে বিডন ষ্ট্রীটে ঢুকে পড়ল, আমিও চলেছি পিছনে পিছনে। হাঁটতে হাঁটতে যখন আমরা

মিনার্ভা থিয়েটারের কাছাকাছি হয়েছি, তখন আমি আর থাকতে না পেরে বলেই ফেললাম কথাটা—সুশীল আর কান্তর সামনে বোধহয় অভিনয়টা না করলেই হতো। ওরা কী মনে করল ?

ও দাঁড়িয়ে পড়েছিল রাস্তার একপাশে ফুটপাতে। লোকজন কম। একটু হেসে বলল—সত্যি বলব ? ইচ্ছা করেই করেছি।

—কিন্তু চারদিকে যে রটিয়ে বেড়াবে ওরা।

ফিক্ করে হেসে পঙ্কি বললে—ভয় হচ্ছে নাকি তোমার ?

—না, তা ঠিক নয়, বললাম—তবে একটা অস্বস্তির কারণ হবে তো সেটাই ভাবছি।

পঙ্কি বললে—আত্মরক্ষা করলাম। কী জানো, কিছুদিন ধরে আমি এমন একজন লোক মনে মনে খুঁজছিলাম যাকে আমার মনের কথা—মনের সব চিন্তা খোলাখুলি বলতে পারব। তার সঙ্গে প্রেম করব না, কিন্তু কাছে ব্রুটালি ফ্রাঙ্ক হতে পারব।

একটু হেসে বললাম—ইংরেজী কথাগুলি মন্দ শেখো নি কিন্তু।

বলল—সর্বনাশ করলে! তুমিও আমার প্রেমিকদের মতো এসব ধারণা করতে শিখলে ? এসব সংলাপ গো সংলাপ, নানান নাটকের নানান সংলাপ থেকে সংগ্রহ করা।

বলেই একটু হেসে উঠে—মন্দ নয়, আগে-আগে শুনতুম 'ডায়ালগ', এখানকার রেওয়াজ হয়েছে—সংলাপ, কতো আর দেখব !

তারপরে একটুক্ষণ থেমে থেকে আবার বললে—এই তো নতুন রাস্তা আর বিডন ষ্ট্রীটের মোড়। চৌদ্দ নম্বর ধরতে গেলে ওপারে যেতে হবে, তাই না ? একটু সরে এসো, কথাটা শেষ করে নি। যদুদা, আত্মরক্ষা করার ব্যাপারটা কী জানো ? ওরা যখন জানতে পারবে, আমি ওদের ম্যানেজারের মেয়ে মানুষ, তখন আমার কাছ ঘেঁষাঘেঁষি করে আমাকে আর বিরক্ত করবে না !

বললাম—তুমি কি সুশীল কান্তদের কথা বলছ ?

—তা সুশীলরাই বা কম কী ? তাহলে শোন, বছর খানেক আগে একবার এক যাত্রাদলে ঢুকে একটামাত্র টুর করতে গিয়েছিলুম আসামে। গোটা ষোল শো করার পর অসুখের ছুতো করে পালিয়ে এসেছিলুম। টিকতে পারি নি।

—কেন ?

একটু হেসে বললে—সে অনেক কথা। টাকার টানাটানি। অ্যামেচারে আজকাল আমার তেমন টান নেই, তাই দেখলুম, ছোটবাবু যখন ভালো

মাইনেতেই ডাকলেন এবং বিশেষ করে ধাড়া মশাইয়ের কোম্পানী, যেখানে তুমি আছো—তাই মনে-মনে এ ধরণের কিছু প্ল্যান করেই এবারে যাত্রায় এলুম। কী করব? পেটে খেতে হয় তো? মা তো এখন মঠ আর জপতপ নিয়েই পড়েছে।

তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী একটু ভেবে নিয়ে বললে—আমার সঙ্গে আলাপ হলো, আমরা যথেষ্ট খাতিরও করলুম তোমাকে, চাকরীটাও পেলে অথচ বলতে গেলে—দেখাই করলে না আমার সঙ্গে, মানে ভাব জমাবার একটু চেষ্টা করলে না। তখনই বুঝলুম লোক সোজা নও, পোড় খেয়ে খেয়ে রীতিমত পোক্ত হয়েছ। মনের আগল যদি কারো কাছে খুলতেই হয়, তো সে এই লোক।

বললাম—সেই মনে করেই দলে এলে নাকি?

—না। হঠাৎ যোগাযোগের পরই এসব চিন্তা এলো মনে। নইলে কিছু বসে বসে যে ভাবব, সে সময় কোথায় আমাদের? অভিনেত্রীদের তো এ যাবত দেখনি, এবার তোমার অভিজ্ঞতা হবে। কিন্তু কথায় কথায় কী থেকে কীসে চলে এসেছি দেখ। আমি তোমাকে বলতে গিয়েছিলাম আমার আত্মরক্ষার কথাটা। সকলকে আমার অঙ্ক পুরুষদের মতো ভয় করবার কিছু নেই, সেদিক দিয়ে একঘরে থাকলেও বোরকার আমরা সেফ্। কিন্তু ওসব লোকদের আবার অন্য ধরণের দোষ থাকে। সময়ে-অসময়ে গা ঘেষাঘেষি করে দাঁড়ানো এই সব আর কী। অন্য কিছু নয়।

বললাম—কিন্তু, বাপি তো ছেলেমানুষ, বারোবছর বয়স। ওর সম্বন্ধে আশা করি বলার কিছু নেই।

—নিশ্চয়ই আছে।—পক্ষি বললে, দল বাইরে গেলেই বুঝতে পারবে। কোনো কোনো মেয়েকে দেখেছি ঐ সব ছেলেদের ছাড়তে চায় না। আমার চোখে কিন্তু ওরা বিষ। বড্ড দিদি-দিদি করে এসে খবরদারি করবে, পা টিপে দিতে চাইবে, হেন-তেন কত কী। ছোট ছেলে যেমন মায়ের সঙ্গে ব্যবহার করে ব্যাপারটা ঠিক তাই। কিন্তু দশ বারো বছরের বুড়ো ছেলেকে ছোট ছেলে বলে আদর করা অনেকের সইলেও আমার সয় না। তাই তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে এটা যখন ভাববে, তখন আর সহজে ঘেষতে সাহস করবে না।

—মন্দ বলো নি, জানা রইল। এ-সব ব্যাপারে নজর দিতে পারব।

—কতটুকু আর নজর দেবে?—পক্ষি বললে, কিন্তু আমাদের দেখে এদিকে

ভীড় জমেছে যে! আমি ওফুটে যাই, বাসটা ধরি গিয়ে। তোমার সঙ্গে আজ থেকে আমার শুধু কথা বলার কনট্রাক্ট হলো।

খানিকটা এগিয়েও আবার ফিরে এলো, বললে—চলো তো খানিকটা এগিয়ে যাই। রাস্তার লোকগুলো চেয়ে চেয়ে দেখছে দেখ না! যেন তামাশা পেয়েছে!

নীরবে কিছুটা দূর পর্যন্ত আমরা হাটতে লাগলাম চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ ধরে। শীলা এক সময় নিজের মনে একটু হেসে বললে—এই যে আমার সঙ্গে হাঁটছ না যদুদা? যদি তোমার দলের কারুর চোখে পড়ে থাকে তো, এতক্ষণে ঢিঢিক্কার পড়ে গেছে, দেখগে যাও।

—কেন?

—আমি চারদিকে প্লে করে বেড়াতাম অনেকেই দেখেছে, সুতরাং আমাকে চেনে অনেকেই। আমার সঙ্গে তোমাকে দেখলে কী আর রক্ষে আছে! যা খুশী কল্পনা করে নেবে।

বললাম—সে তো সুশীল আর কান্তই আছে। রটনা করবার জন্য ও দুজনই যথেষ্ট।

উত্তর দিলো—ওরা তোমার বড়বাবুর চর কিন্তু, মনে রেখো। তবে তোমার আমার কলঙ্ক দেখিয়ে চাকরী যাবার ভয় নেই, স্বয়ং বড়বাবুর অ্যাপ্রুভাল আছে।

—তবে আর কী! ভাবছ কেন?

ততক্ষণে পরবর্ত্তী বাস-ষ্টপের উলটো দিকে আমরা এসে পড়েছি। ও থেমে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল,—খুব মজা পেয়ে গেছ, না?

—কীসের?

এই যে আমাদের দুজনকে জড়িয়ে যা' কিছু এযাবৎ—

এবার হাসলাম আমি। বললাম, সত্যিকথা বলাই ভালো। এ দেখছি নিদারুণ স্পোর্ট; যথেষ্ট আমোদ পাচ্ছি।

—এর আমোদটা আমিও পেতে চাই। কারণ কখনো পাইনি। সত্য কলঙ্ক মাথায় করে নিয়েছি এতদিন, এবার মিথ্যে কলঙ্ক কেমন লাগে একটু বুঝে নিতে চাই।

বলে হঠাৎ-ই সরে গিয়ে দ্রুতপদে গাড়ী বাঁচিয়ে ওপারে যেতে লাগল পক্ষি। পরক্ষণেই বুঝলাম ওর ত্বরিৎ গতির কারণটা কী। চৌদ্দ নম্বরের একটা বাস ছেড়েছে বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ের ষ্টপেজটা থেকে।

ওকে তুলে নিয়ে বাসটা চলে গেল। আর আমার তখন মনে হলো, কী আশ্চর্য, আমিও তো চৌদ্দ নম্বরে যেতে পারতাম। আমিও তো বাড়ীই যাব! পকেটে কয়েকটা টাকা আছে। কী কী যেন কিনতে হবে। 'রুব্রাটিন এলিক্সির' আর কী কী ওষুধ যেন। আমার স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য। কিন্তু, সে যাই হোক, পঙ্কি তো ওর বাড়ীতে একবারও যেতে বলল না। সেই প্রথমবার দেখা হওয়ার পর যে আগ্রহ লক্ষ্য করেছিলাম, এবার তো ঠিক তেমনটি নয়। পরক্ষণেই মনে হলো,—ও-ই বলেছে, আমার পক্ষ থেকে ঘনঘন যাওয়া ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ করবে না।

আমি অন্য একটা বাস ধ'রে চৌরঙ্গীতে নামলাম। মাঝে মাঝে এসথও আমার হ'তো, হঠাৎ কোথাও যেতে যেতে চৌরঙ্গীতে নেমে পড়তাম, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছি তো আছি, কত লোক, কত গাড়ি! মনে হতো, ভিন্ন কোনো এক দেশে বুঝি হঠাৎ এসে পড়েছি, যার সাথে আমাদের জীবনধারা আর পরিবেশের কোনো মিল নেই। চৌরঙ্গীতে বেড়িয়ে বাস্তবিকই বিদেশ-ভ্রমণের আস্বাদ পাওয়া যেতো। রবীন্দ্রনাথের একটি নাটিকায় একটি সংলাপ পড়েছিলাম,—'যেন চাৎপুর থেকে চৌরঙ্গী!' আজ চৌরঙ্গীতে নেমে হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল। আজ আমি চাৎপুরেই চাকরী করি, এমন কি সন্ধ্যার চীৎপুর বলা যেতে পারে। সেখান থেকে চৌরঙ্গীতে এসে মনে পড়ল, উভয় অঞ্চলের যোগ কি মাত্র 'চ'-এর শব্দতরঙ্গে? আর কিছু নয়?

মাঝে মাঝে এইরকম উদ্ভট চিন্তা আমাকে পেয়ে বসে। এ আমার বহু-দিনের স্বভাব। কিছুক্ষণ আগে শীলাকে গোকুলবাবু ইঙ্গিত করলেন,—"শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ বাধবে না তো তোমাকে নিয়ে?" সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো, বড়বাবু আমাকে আর ছোটবাবুকে শীলার দুপাশে দাঁড় করিয়ে কল্পিত এক বিভীষিকার চিত্রই বুঝি দেখতে শুরু করেছেন। প্রথমে লজ্জা অনুভব করলেও, পরে ভয়ানক হাসি পাচ্ছিল আমার সমস্ত ব্যাপারটাকে নিয়ে। শীলার কাছ থেকে নেতিবাচক উত্তর পেয়ে বড়বাবু আশ্বস্ত হয়েছিলেন তার ছোট ছেলের সম্বন্ধে। কিন্তু, ছোটবাবুর চোখ যে সত্যিই শীলার ওপরে পড়েনি, শীলা এটা চট্ করে বুঝতে পেরেছিল কেমন ক'রে? বোধহয় অভিজ্ঞ মেয়েরা এটা পারে। এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল, এক বাউলের গান শুনেছিলাম, "ভালো ক'রে পড় গা ইস্কুলে নইলে কষ্ট পাবে শেষকালে!"

জীবন-রূপ যে প্রকাণ্ড ইস্কুলটি রয়েছে, তাতে কি সত্যিই শীলা পাঠ নিয়েছে? ভাবতে ভাবতে মনে হলো, আচ্ছা, প্রত্যেক মানুষেরই সমাপ্তি কি এক নয়?

ধনী, কী নির্ধন? চোখ বুঝবার আগে মনে কি হয় না, যা ফেলে যাচ্ছি, সম্পদই হোক আর কীর্তিই হোক, তার কিছুই আমার নয়? কে এক অদৃশ্য মহাজন আমাকে দিয়ে সব কিছু করিয়ে নিয়ে শেষ পযন্ত আমারই সব গ্রাস ক'রে নিল নাকি আমাকে দূরে ফেলে দিয়ে? "ঠাঁই নাই—ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী, আমারই সোনার ধানে গিয়েছে ভরি!"

উদ্ভট এক চিন্তা হঠাৎ-ই মনে এলো, আচ্ছা, শীলা কি অনুভব করতে পেরেছে এই সব?

এই সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে মেট্রো ছাড়িয়ে রাস্তা পার হয়ে বাসষ্ট্যাণ্ডগুলি ছাড়িয়ে বড়ো ওষুধের দোকানটার দিকে চলেছি, মাঝে মাঝে চোখ গিয়ে পড়ছে ফুটপাথ অথবা দেয়ালে সাজানো বইগুলির ওপরে। আগে যখন লটারীর টিকিট কেনা অভ্যাস ছিল, তখন ভাবতাম, যদি কোনো প্রাইজ পাই, তো ঐ টাকার অন্ততঃ বেশ কিছু অংশ দিয়ে বই কিনব—অজস্র বই—রাশি রাশি বই। পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পযন্ত কে কী চিন্তা করছে, সব জানব। কিন্তু প্রাইজও পাওয়া হয়নি, বই-ও কেনা হয় নি। পাবার আশাও নেই, কেনার কামনাও আর নেই। তবু এক অদ্ভুত তৃষ্ণা র'য়ে গেছে। নতুন-নতুন বইয়ের চেহারা দেখলেও আনন্দ পাই।

এইভাবেই চলেছি ধীর মন্থর গতিতে, কাব্য ক'রে বলা যায়, অলস দৃষ্টি মেলে। যেতে যেতে হঠাৎ চোখে পড়ল, একটা ষ্টলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে অজিত দাস। কী একটা বই হাতে তুলে নিয়ে নিবিষ্ট মনে দেখছে আমাদের সেই নম্বরবাবু!

অবাক হয়ে গেলাম ওকে ওখানে দেখে। পর মুহূর্তে মনে পড়ে গেল গোকুল বাবুর সন্দেহের বিষয়টা। একটু আলাপ ক'রে দেখব ওর সঙ্গে? না কি পাশ কাটিয়ে চলে যাব অপরিচিতের মতো। মনে হলো, দেখাই যাক না, আমি ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিজে কিছু বার করতে পারি কি না।

এই ভেবে আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে চুপি চুপি দাঁড়ালাম ওর ঠিক পিছনে। বইয়ের মধ্যে ও তখন এতো নিবিষ্ট হয়ে গেছে যে, একটুও টের পেলো না পাশ থেকে কে এলো আর কে গেল। একটুক্ষণ থেমে থেকে আমি মুখটা একটু বাড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম, কী এমন বই ওটা, যাতে ও মুহূর্তে এমন ক'রে ডুবে যেতে পেরেছে।

দেখি, বইটা বাঙ্‌লা নয়, ইংরাজী। ইংরাজী তাহলে জানে অজিত দাস? বইয়ের পাতার ওপরে—অন্ততঃ বাঁদিকের পৃষ্ঠাগুলিতে, অনেকসময় বইয়ের

নাম ছাপানো থাকে। সৌভাগ্যবশতঃ এটিরও ছিল। লক্ষ্য করে দেখলাম, বইখানা ডষ্টয়েভ্স্কীর "দি পুত্তর ফোক।"

বিষয়টা একবার ভেবে দেখুন শচীনবাবু, যে লোক চীৎপুরের রীতিমত প্রফেশন্যাল যাত্রাদলে ঢুকেছে এক'শোটাকা মাইনের প্রম্পটার হয়ে,—সে কি না ইংরাজী পড়ছে, এবং তা-ও পড়ছে কী, কোনো খুন-খারাপীর গোয়েন্দা-কাহিনী নয়, রীতিমত ক্লাসিক লেখকের ক্লাসিক বই, 'পুত্তর ফোক্।'

ধীরে ধীরে ওর পিঠের ওপর একখানা হাত রাখলাম। আধময়লা একটা ছিটের সার্ট—বয়স বেশী নয়, ছোটবাবুব বয়সীই হবে, রোগা-রোগা চেহারা, গায়ের রঙ্টা ফরসার দিকেই, কিন্তু বড্ড ফ্যাকাশে। মনে হয়, একে কয়েক শিশি 'রুব্রাটন এলিক্‌সির খাওয়ালে ওর দেহে কিছুটা রক্ত হতে পারে।

মনে মনে একটু হেসে ফেললাম, কে কাকে কী বলছে! এক খেতে না পাওয়া লোক বলছে আর এক খেতে না পাওয়া লোকের কথা! দু'শোটাকা মাইনে পাই বটে, আজ না হয় আড়াইশোই হলো,—কিন্তু চালের মণ যেখানে উনত্রিশ-ত্রিশ সেখানে ছেলে মেয়েদের মুখে কিছু কিছু দিয়ে আমাদের মুখে দেবার মতো উদ্বৃত্ত আর থাকে কতটুকু?

যাইহোক, অজিত দাস যেন ভূত দেখে চমকে উঠেছিল। হাত থেকে বইখানা ওর পড়েই গেল। কিছুক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারল না।

আমি ওকে টেনে নিয়ে এলাম অন্যদিকে। বললাম, 'পুত্তর ফোক্' যে পড়ে, সে যাত্রায় প্রম্পট্ করতে ঢোকে কেন?

অজিত একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে উত্তর দিল—অভাবে।

—সে তো বুঝিই। কিন্তু, ভালো কথা, ছোটবাবু গেলেন কোথায়?

—আমাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে গেছেন।

—এখানে তুমি নামলে যে? বাড়ি কি দক্ষিণে?

বললে—না। বাড়ি তালতলার দিকে। এখানেই নেমে পড়লাম আমি। বইয়ের দোকানদারটি আমাদের পাড়ারই লোক, আমার চেনা। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু বইয়ের পাতা ওল্টাই।

চুপ করে রইলাম কয়েকমুহূর্ত। তারপর একটু অন্তরঙ্গ হতে স্নেহের সুরে বললাম—তাড়া নেইত? এসো না কার্জন পার্কে গিয়ে একটু বসি। নিরিবিলি দুটো কথা বলা যাবে।

একটু ইতস্ততঃ করে অজিত বললে—চলুন।

কার্জন পার্কের একটা খালি বেঞ্চে বসে, কথায়-কথায় ওর বাড়ির কথা

জানবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু সে কি কিছুতে ও বলতে চায়? এটা-ওটা-সেটা, কতো কী-ইনা বলাবলি হলো! রাত বাড়তে লাগল, কার্জন পার্ক নির্জন হয়ে আসতে লাগল, ডষ্টয়েভস্কীর 'পুওর ফোক্' আর "ইডিয়ট্"-এর আলোচনাও সমাপ্ত হলো, শেষ পর্যন্ত অজিত সাড়া দিলো আমার অন্তরঙ্গতায়। বললে, বিশেষত্ব কিছুই নেই, আমার বয়সী ছেলেদের সবারই যা অবস্থা, আমারও তাই। রকে বসে আড্ডা দিতাম বটে, কিন্তু আত্মগ্লানিতে ভরে উঠতাম। উঠতে-বসতে বাড়ির সবার কাছ থেকে ক্রমাগত শুনে চলেছি, তুমি বেকার—তুমি বেকার। বাড়ির দুবেলা দুমুঠো ভাত যেন গলা দিয়ে আর নামতে চায় না!

ওদেরও দোষ নেই, অর্থনৈতিক অবস্থা আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে অর্থনৈতিক সম্বন্ধ যার সঙ্গে যার আছে, সেখান থেকে স্নেহ-প্রীতি-মায়া এসব মুছে যেতে বাধ্য। তা তারা পরস্পরের মতো আপনার লোকই হোক না কেন! আমি বাড়িতে ভাত খেতাম এবং যেহেতু সে ভাতের দরুণ চাল কিনতে হয় ত্রিশটাকা মণ দরে, সেই হেতু বাড়ির সঙ্গে আমার অর্থনৈতিক সম্বন্ধ ছিল বই কী! আর ছিল বলেই, আমার মা-বাবা-ভাই-বোন সব থাকা সত্ত্বেও স্নেহ-প্রীতি-মায়া এসব একদিন মিথ্যার বস্তু হয়ে দাঁড়ালো আমার জীবনে। অথচ, মানুষেরই মন তো! স্নেহ-প্রীতির কাঙাল কোন্ জীব নয় এ জগতে? তাই, পাড়ার অন্য বাড়ির মেয়েটা যখন অজিতদা বলে ডেকে সস্নেহে এক কাপ চা খেতে দিলো, তখন মনে হলো, মেয়েটার জন্য আমি বুঝি এবার প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি। কিন্তু মজা দেখুন, সেই মেয়েটিকেই বিয়ে করে যদি ঘর বাঁধতে যাই, অর্থাৎ তার সঙ্গে যদি অর্থনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করি, তাহলে ঐ স্নেহ-প্রীতি-মায়া সব মিলিয়ে যাবে কর্পূরের মতো! তাই, মেয়েদের সঙ্গে ঐ চা-খাবার সম্পর্কটুকু বজায় রেখে শ্রদ্ধেয় অজিতদা হয়ে বসে আছি, কাউকে নিয়ে যে ঘর বাঁধব, এ আকাঙ্ক্ষা মনে পোষণ করি না। অধিকাংশ ছেলেদেরই প্রকৃত মনোভাব হচ্ছে এই। মনে করুন, তাদেরই একজন হ'য়ে আমি হঠাৎ এসে ছিট্‌কে পড়েছি আপনাদের গণ্ডীর মধ্যে।

বললাম—আচ্ছা, যারা 'সাফারার' তারা বোধহয় একটু ফ্রাঙ্ক্‌ই হয়, না?

অজিত উত্তর দিল—বোধহয় না। যা তারা সয়, মুখ বুজেই সয়। দুঃখ সইবার এটাই সহজাত নিয়ম। যখন তারা কথা বলতে চায়, তখন বুঝতে হবে তারা সহ্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। কথা কয় কারা?—যারা মরিয়া।

বললাম—অথচ, তুমি তো কথা বলো নি। আমারই মতো চুপচাপ ছিলে। আজ এখন আমি নাড়া দিয়েছি, তাই কিছু কথা বেরুল।

একটু হেসে উঠে বললে—ঠিক বলেছেন!

ওর হাতটা ধরে বলে উঠলাম—আমাকে ভুল বুঝো না ভাই, আমিও তোমার মতো, ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না।

একটু হেসে অজিত বললে—জানি। নইলে কমার্সের গ্রাজুয়েট হ'য়ে যাত্রায় এসে বড়বাবুর 'সরকার মশাই' হতেন না।

হাসলাম আমিও। বললাম—ছোটবাবু কিন্তু আমাকে ম্যানেজারবাবু বলেন।

—ওর কথা রেখে দিন। ও হচ্ছে দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ। খুব প্রগ্রেসিভ ছেলে। আপনার প্রতি ওর ভিতরে ভিতরে অগাধ শ্রদ্ধা। দেখা যাক, কতদূর কী করতে পারে।

বললাম—তোমাকে তো নম্বরবাবু বলে আমরা একপাশে ঠেলে রেখে-ছিলাম। এবং সেই থেকে তুমি বলার অভ্যাসটিও ক'রে ফেলেছি। আজও কথা বলার সময় তুমি না বলে পারলাম না। আপনি বলাটা বোধহয় বাড়াবাড়ি ঠেকবে।

অজিত বললে—ঠিকই বলেছেন। আপনি বয়সে যথেষ্ট বড়ো। তুমি করে না বললে আমাকেও এত সহজ করে পেতেন না। তাছাড়া, বিদ্যে-বুদ্ধিতেও আমি অনেক ছোট।

বাধা দিয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন ক'রে বসলাম—'অনিরুদ্ধ রায়' নামটা নিলে কেন?

এবার কিন্তু সত্যিসত্যিই চমকে উঠে বললে—তার মানে!

—তার মানে আর কিছু নয়, 'অনিরুদ্ধ রায়' যে ছদ্মবেশী অজিত দাস এটা স্বয়ং বড়বাবু পর্যন্ত আন্দাজ করে ফেলেছেন।

—সে কী! এতো বড় অদ্ভুত কথা!

—মোটেই অদ্ভুত নয়।···বললাম, বড়বাবু এমনি যাই হোন, ভীষণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন লোক, ধুরন্ধর ব্যক্তি।

একটু থেমে অজিত বললে—এটা কিন্তু টাকাওয়ালা লোকেদের পক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার। বিদ্যেটিদ্যে না থাকলেও ব্যবহারিক বুদ্ধি অনেক বিদ্বানের থেকেও বেশী করে গড়ে ওঠে। ক্রমাগত টাকা করতে করতেই এটা গড়ে ওঠে আর কী!

—তাই যদি জানো তো নাম বদল করতে গেলে কেন ?

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল অজিত।

নীরবতা ভঙ্গ করলাম আমিই। বললাম,—'প্রম্পটার' রূপে এ আত্মগোপনেরই বা কী দরকার ছিল ?

অজিত বললে—আপনাদের এ অনুমানের হেতুটা আমি ঠিক ধরতে পারছি না।

—হেতুটা ছোটবাবুর বাড়াবাড়ির জন্য। একজন সামান্য প্রম্প্‌টারের সঙ্গে মালিকদের অত হৃদ্যতা সন্দেহেরই যে কারণ ঘটবে এ আর আশ্চর্য কী ?

—ঠিক বলেছেন—অজিত বললে, বিপ্লবকে আমি বারণ করেছিলাম। ও কিছুতেই শুনতে চায় না। কিন্তু একটা যে মুশকিল হলো! দলের সবাই যদি কিছু বুঝে যায় তো আমার কোনো উদ্দেশ্যই সাধিত হবে না।

বললাম—সেই উদ্দেশ্যটা কী, খুলে বলো, আমি বড়বাবুকে বুঝিয়ে বলব, যাতে উনি কাউকে কিছু না বলেন। মনে হয়, সে কথাটা উনি শুনবেন।

অজিত বললে—শুধু তাই নয়, আমার সঙ্গে যেরকম ব্যবহার উনি করে এসেছেন তা-ই যেন করে চলেন।

বললাম—বেশ, সেভাবেই বুঝিয়ে বলব। কিন্তু, উদ্দেশ্যের কথাটা তো শুনলাম না ?

অজিত একটুক্ষণ থেমে থেকে বললে,—দেখুন আমি পাড়ায় থিয়েটার-ফিয়েটার করেছি, প্রম্পট করা আমার অভ্যাস আছে, তাই বিপ্লবকে ধরলুম, ও কলেজে আমার ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল, যাতে করে ও আমাকে প্রম্প্‌টার ক'রে দলে নিয়ে নেয়। ওর মতো আমিও আই-এ পাশ করিনি, ভালো চাকরী পাব এ আশাও নেই। বরং ছোট হয়ে কাজে ঢুকলে জীবনধারাটাকে ভালোভাবে 'স্ট্যাডি' করতে পারব।

বললাম—কথাটা কিন্তু এখনো পরিষ্কার হলো না।

উত্তর এলো—গল্প লেখার কিছু অভ্যেস আছে। তাই, যাত্রাদলের লোকগুলিকে নিয়ে একদিন একটা বই লিখব, এই আকাঙ্ক্ষা।

আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি লক্ষ্য করে অজিত বলে—অবাক হবেন না। ও দেশের বহু লেখকের কাহিনী আমার জানা আছে, যারা জীবনকে জানবার জন্য বস্তীতে গিয়ে ছদ্মবেশে বাস করতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

বললাম—তুমি সিনক্লেয়ার, লুইস্ ক্যারেল, কিম্বা রোমানফ, এদের কথা বলবে তো ?

এবার বোধহয় অবাক হবার পালা ওর। বললে,—কমার্সের ছাত্র আপনি। সাহিত্য পড়েন ?

ঈষৎ লজ্জিত বোধ করে বললাম—সামান্য। কিন্তু উর্বশী পালার বাঁধনদারের নাম অনিরুদ্ধ রায় হলো কেন, সে প্রশ্নের মীমাংসা কিন্তু এখনও হলো না।

অজিত বললে—আপনাকে সরকারমশাই কিম্বা ম্যানেজারবাবু, এর কোনটা দিয়েই আমি ডাকতে পারব না। আমি আপনাকে ডাকব যদুদা বলে, কেমন ?

একটু হেসে বললাম—বেশ।

অজিত বললে—যদুদা। লেখক হবার প্রচণ্ড ইচ্ছে। গল্প-টল্প ছাপাও হয় নানান পত্রিকায়। শেষ পর্যন্ত আমাকে পেটের জন্য যাত্রার নাটকও লিখতে হল। বিশ্বাস করুন, আমার মার চোখে ছানি পড়েছে, অপারেশন হবে, ছোটবোনটির বিয়ে দিতে হবে। টাকার দরকার। দাদারা ছাপোষা মানুষ, যোগাড় করে উঠতে পারছে না, বাবা বাতে পঙ্গু বলা যেতে পারে, তাই বাপমায়ের 'হাড়হাবাতে হতচ্ছাড়া' ছোটছেলেটাই কিছু টাকার যোগাড়ে আছে। যাত্রার পালা লেখার টেকনিক অবশ্য আমার জানা ছিল না, সে বিষয়ে বিপ্লব আমাকে সাহায্য করেছে।

শুনলাম, সবশুদ্ধ শ' দুই, পাবো। সেটাও যদি মার হাতে গিয়ে পড়ে, তাহলে অন্ততঃ একটি প্রাণী গঞ্জনা থেকে কিছুটা রেহাই পায়।

—কী রকম ? বলতে আপত্তি নেই তো ?

—না, আপত্তি কী।—অজিত বললে—তবে ভাবছি, জীবন দেখতে এসে নিজেই না সবার কাছে দ্রষ্টব্য বস্তু হয়ে দাঁড়াই।

হেসে বললাম—ভয় নেই, আমি লেখক নই। আমি পাঠক বা শ্রোতা বলতে পারো।

অজিত একটু দম নিয়ে বললে আমাদের বাড়ীটা একান্নবর্তী পরিবার তো, তেতলায় চারতলায় আমরা যে-যার খোপে বাস করি, নীচের দু'তলা ভাড়াটেতে ভর্তি। এই সব ভাড়াটেদেরই এক ঘরের একটা মেয়ে আমাকে লুকিয়ে একটু-আধটু চা-টা খাওয়াতো। সেটা জানাজানি হতে হতে রঙ চড়ে গিয়ে মার কানে এমন ভাবে গিয়ে পৌঁছল যে, মার ধারণা হল, আমি গোল্লায়

গেছি। তবে, আমার সঙ্গে পারবে কে? আমি তো গায়ে গণ্ডারের চামড়া লাগিয়ে বসে আছি। কিন্তু মেয়েটাকে সেই থেকে আমার বাড়ীর লোকেরা উঠতে বসতে গঞ্জনা দিতে শুরু করল। গরীব ইস্কুল-মাষ্টারের মা-মরা মেয়ে, মুখ বুজে সব সহ্য করে। শেষ পর্যন্ত ওদের বাড়ী থেকে উঠিয়েই দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু ভাড়াটে ওঠানো আজকার দিনে কী অতই সহজ!

বললাম—এই মেয়েটিকে তো তোমার বিয়ে করা উচিত।

একটু হেসে বললে—আগেই তো বলেছি, বিয়ে মানে অর্থনৈতিক বাঁধনে জড়ালে যেটুকু স্নেহ আর মায়া আছে, সব মিলিয়ে যাবে কর্পূরের মতো!

বললাম—প্রেমের ক্ষেত্রে কথাটা আলাদা কিন্তু।

অজিত বললে—প্রেমেব গল্প খুব লিখি। যা মানুষ পায় না, তাই তো বই পড়ার মধ্যে দিয়ে পেতে চায়। তবে প্রেমের কথা খুব ফলাও করে বলতে হয়। শুধু জীবনের গল্প বললে লোকে শুনবে কেন? তবে এটাও ঠিক কথা, প্রেমবিহীন জীবন হয় না। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে আপনি বোধহয় ব্যাপারটাকে ঠিক বুঝতে পাবেন নি। কী জানেন? মেয়েটির টি-বি। ঠিকসময় ধরা পড়েছিল বলে বেঁচে যাবে। হাসপাতালে ঠাঁই নেই, বাড়ীতেই যা চিকিৎসা হবার হচ্ছে। ষ্ট্রেপ্টোমাইসিনেব খরচ-টবচ আমিই দেই। উঠে-হেঁটে বেড়ায়। এ নিয়েও হৈ চৈ হতো, আমি কাউকে জানতে দিই নি। ডাক্তার আমার চেনা, তাঁকে টিপে দিয়েছি, কাউকে বলেন না। ভদ্রলোকেব ছেলেদুটি একেবারে শিশু। মেয়েদুটিই বড়ো। আমি যাব কথা বলছি, সেই বড়ো মেয়ে।

ওর মা বুঝি সখ কবে ওর নাম রেখে গিয়েছিল শেফালী। তাই তো ও বলে —বৃথা চেষ্টা। শরতের শেফালী হয়ে ফুটেছি, শরতেই ঝরে যাবো। বাঁচব না।

আমি সাহস দেই, বলি—টি-বি তো এখন সহজ রোগ।

ঘরের সবাই মিলে ওকে আগলে বেড়ায়। অবশ্য রোগের কথা প্রচার হলে আমিও রুখে দাঁড়াতে জানি। ইট-বার-করা মান্ধাতার আমলের বাড়ি আমাদের, চারদিকে সব নতুন বাড়ি হয়ে গিয়ে অন্ধকার হ'য়ে গেছে, আলো-বাতাস মিলবে কোথা থেকে? খুপরী খুপরী ঘর। প্রায় ঘরেই দিনের বেলা আলো জ্বালতে হয়। এবাড়িতে কার টি-বি নেই? বুকের এক্স্-রে করলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। খেতে পায় নিম্ন-মধ্যবিত্তের দল?

ওর কথা শুনতে শুনতে, কী আশ্চর্য, আমার চোখের পাতাদুটি ভিজে

উঠেছিল। সেটা টের পেতে মনে হলো, আরে, আমি এত সহজে emotional হতে পারলাম কবে থেকে? যাত্রাদলের সঙ্গে থাকার ফল নয় তো?

অজিত বললে—এ আমারই নয়, আমার বয়সী কলকাতার সব নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেদের ইতিহাসই আজ এই। আমি তবু বিপ্লবের মতো বন্ধু পেয়েছি। চাকরী দিয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করছে সে। কিন্তু যাই বলুন, যাত্রার নাটক লিখছি, তা-ও ফরমাইসী নাটক—নিজের নামটা সত্যি-সত্যিই আর ব্যবহার করতে পারলুম না।

বললাম—যতটুকু শুনলাম, নাটকে কেশীদৈত্যের অত্যাচারের বিবরণটা বেশ বিশেষত্বপূর্ণ হয়েছে।

অজিত বললে—ওটুকুই নিজস্ব চিন্তা। বিপ্লব বললে, পৌরাণিক কাহিনীর আড়াল দিয়ে আগেকার নাট্যকাররা মানুষের বন্ধন-মুক্তির তীব্র আকাঙ্খাকে প্রকাশ করে গেছেন আর তুমি আজকের মানুষের প্রাণের কথাটাতে রূপ দিতে পারবে না? শুনে উৎসাহিত হই। ও বললে, যাত্রা-যাত্রা বলে অতো ঘৃণা প্রকাশ করো না। যাত্রার ঢঙটাই আমাদের নিজস্ব ঢং। শিক্ষিত মানুষ অর্থাৎ আজকের একটিমাত্র গ্রুপ্ দেখুক থিয়েটার, কিন্তু দেশের অগনিত মানুষ যাত্রার দর্পনে দেখুক নিজেদের চেহারা, নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা আর আশা-আকাঙ্খার ছবি যাত্রার মাধ্যমে mass-contact করা যায় ঢের বেশী। থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি করব। অর্থাৎ থিয়েটারের সব থাকবে, শুধু থাকবে না তিনদিক-ঘেরা সেট্-সিনের ফাঁকি। ম্যাজিক দেখাবো না, দেখাবো জীবন। মানুষের মন আর কল্পনাই হবে আমাদের অভিনীত নাটকের সেট্‌সিন্—এককথায় পটভূমি।

বিপ্লব বলেছিল, রবীন্দ্রনাথ এই সত্যটা কতো গভীরভাবে বুঝেছিলেন ভেবে দেখ্। বিশেষ করে, ওঁর "ফাল্গুনী" নাটকের প্রস্তাবনা-দৃশ্য যথেষ্ট চিন্তার খোরাক দিতে পারবে ও বিষয়ে। কবি বলেছিলেন না, আমি চাই—চিত্তপট—চিত্রপট নয়।

যাই হোক, বিপ্লবের এইসব কথায় প্রেরণা পেয়েই 'উর্বশী' লিখলাম কিন্তু, তবু কেন যেন নিজের নামটা দিতে রুচিতে বাঁধল। শেষ পর্যন্ত হলাম কি, না যাত্রাদলে পালার বাঁধনদার! অবশ্য, এ-ও এস্‌কেপিষ্টের মতো উক্তি!

চুপ করল অজিত। বললাম—রাত বেশ হয়েছে। লাষ্ট্ ট্রাম চলে গেল এবার ওঠো। ওপারের ফুটপাথে গিয়ে বাস ধরব।

—চলুন।

যেতে যেতে বললাম—তুমি-আমি দুজনেই যাকে বলে 'বর্ণচোরা আম' হয়ে ওদের দলে তো মিশে থাকি, দেখা যাক, কে কোথায় কী ভাবে গিয়ে দাঁড়াই শেষ পর্যন্ত। অন্ততঃ একটা চিন্তায় গিয়ে আমাদের দুজনেরই বিবেক সায় দিয়েছে, সেটা হচ্ছে—জীবনকে প্রত্যক্ষ করা। আজ থেকে আমরা দুজনে ছদ্মবেশী 'জীবন-দর্শক'। জীবনের অভিনয় দুজনকেই করতে হবে রঙ্ না মেখে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে, দর্শকের ভূমিকা থেকে তৃণমাত্র সরে গেলে চলবে না আমাদের।

দুটি উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি আমার চোখের ওপর স্থাপিত করে অজিত বললে —তাই হবে যদুদা। কিন্তু, আমার অভিলাষ ওদের নিয়ে বই লেখা। আপনার অভিলাষ কী ?

—অভিলাষ ?—আমি বললাম—আমার অভিলাষ কিছু নেই। কিন্তু, আজ থেকে তোমার অভিলাষের স্রোতধারায় আমার অভিলাষকে দিলাম মিলিয়ে। তোমার রচনাই আমার সার্থকতা।

আজ ভাবি, এ'কথাটা ওকে সেদিন না বললেই পারতাম। অনভিজ্ঞ এক তরুণ এসেছিল তার দুটি চোখে দুরন্ত সম্ভাবনার আলো নিয়ে আমাদের মধ্যে, কিন্তু, শেষপযন্ত ওকে আমরা কী দিয়েছিলাম ? সেই বিচিত্র কাহিনী আপনাকে না শোনানো পযন্ত আমার যে স্বস্তি নেই শচীনবাবু! যতো রাতই হোক, আমার ভাঙাঘরে যদি-ই বা বন্ধুত্বের খাতিরে আজ এসেছেন, কাহিনী শেষ না হওয়া পযন্ত আপনাকে যে আমি কিছুতেই ছাড়তে পারছি না।

উর্বশী' পালার মহলা চলল কদিন ধরে প্রবলভাবে। ইতিমধ্যে ছোটবাবুর নির্দেশে আমাদের 'নায়েক' বা বায়নাদারদের আমরা চিঠি দিতে লাগলাম, বই আর ভূমিকালিপি জানিয়ে। এমন কি বড়বাবুর সঙ্গে কিছুটা মতান্তর ঘটিয়ে ছোটবাবু খবরের কাগজগুলিতে পযন্ত বিজ্ঞাপন দিতে লাগলেন। এবং সে বিজ্ঞাপন আপনার চোখে পড়েছিল বলেই আমার ঠিকানা আপনার পক্ষে জানা সম্ভব হয়েছিল শচীনবাবু, তাই আপনি খোঁজ করে করে আসতে পারলেন আমার বাড়ীতে। এবং পরম বন্ধু ও আত্মীয় জ্ঞান করে আমিও খুলে বলতে পাবলাম আপনাকে আমার সব কথা।

মহলায় বসতে হয়েছিল সবার সঙ্গে। দু'খানি ঘর ওপর তলায়। মোটামুটি বড়ো ঘরই। দেয়ালগুলি ঘেঁষে আলমারী আর বড়ো বড়ো সব টিনের বাক্স। তার মধ্যে ধাড়া-মশাইয়ের কেনা পোষাক-আষাকও রয়েছে। দেয়ালগুলির

যেখানটায় ফাঁকা, সেখানে পেরেকে সংলগ্ন যাত্রার তীর ধনুক, আর ঘরের একটা কোণে বর্শা। মেঝেতে বিস্তৃত সতরঞ্চি পাতা। এধারে ওধারে সব ছড়িয়ে বসেছে। ফ্যালারাম এনে দিচ্ছে চা, পান, বিড়ি-সিগারেট,—যার যেমন দরকার হচ্ছে। প্রথম দফা চা আর সিঙাড়া অবশ্য কোম্পানীর। পাশের ঘরের দরজা বন্ধ করে কানাই মাষ্টার নাচের মহড়া বসালো সখীদের নিয়ে। সঙ্গে হারমোনিয়াম, তবলা-পাখোয়াজ, ক্লারিওনেট, বেহালা, বাঁশী এই সব নিয়ে গানের মাষ্টার গিয়ে বসেছে। আর সখীদের সবাই খালি গায়ে, কারুর পরণে হাফ প্যাণ্ট আর কারুর পরণে ধুতি হাঁটুর ওপর তুলে আঁট-সাঁট করে পরা। বারান্দা থেকে নাচতে নাচতে ঘরে ঢুকছে। বাজনা বাজছে, মাঝে মাঝে তাল ফেরতা হচ্ছে। কানাই মাষ্টার কখনো মুখে তুলছে তবলার বোল, কখনো গুনছে তালের মাত্রা,—এক-দুই-তিন-চার! আর মাঝে মাঝে হেঁকে উঠছে—এই পচা কোমর তুলছে না কেন তোর?

পচা খোনা স্বরে উত্তর দিলে—তুলবে কি করে? কোমরে আর কিছু আছে? সেদিন নীচে জল খেতে গিয়ে কলতলায় পিছলে পড়ে একেবারে আলুর দম!

'উর্বশী' পালার মহলায় সুশীল-রাণীকে বসে থাকতে দেখা যেতো মুখ ভারী করে দেয়াল ঘেঁষে এক কোণে। 'উর্বশী'তে যেখানে তার উর্বশী করার কথা, সেখানে সে ছোট পার্ট করছে, তাও কমিক পার্ট—বিদূষকের স্ত্রী।

আরও তিনখানা বই ঠিক করা হলো। পুরানো বই, সবারই জানা, শুধু মেয়েগুলির জানা নেই। তাই ওদের খাটুনীও পড়ল বেশী। তাতে সুশীলের মোটামুটি ভালো পার্ট ছিল, যদিও কোনটাতেই সে নায়িকা নয়, অর্থাৎ যে পার্ট সে করতো, সেই পার্টগুলি আর সে পেলো না। সব নায়িকার পার্টগুলিই পেলো শীলা।

সুতরাং, দিন কয়েকের মধ্যেই দেখা গেল, মুখে নয়, ভিতরে ভিতরে শীলাকে সে অদ্ভুত ভাবে ঈর্ষা করতে শুরু করেছে। ফিমেল-পার্ট করার জন্য দলে আরও ছোকরা ছিল, তাদের মধ্যে ঠিক এমনটি দেখা যেত না, সম্ভবতঃ তাদের বয়স অল্প বলেই। কত আর সব মাইনে পায়! পঁচাত্তর টাকা, আশীটাকা, একশো টাকা, একশো বিশ টাকা, একশো পঁচিশ, বড়জোর দেড়শো। এই ধরণেরই দলের সবার মাইনে, নাচের আর গানের মাষ্টার ছাড়া, ওরা দুজন পেতো আড়াইশো করে। আরও দুজন পেতো আড়াইশো করে, তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে দলের কমিক অভিনেতা—সতীশ দেবনাথ। বয়স প্রায় ষাট হয়েছে, ঈষৎ স্থূল হয়েছে চেহারা, দাঁত সবগুলিই বাঁধান, তবে

এখনো চশমা নিতে হয় নি। যাত্রার অভিনয়ের দিক দিয়েও একটু প্রাচীন পন্থী। হাসির গান গাইতে পারেন। ফরমাস মত অঙ্কের বিরতির মাঝখানে হিন্দী হাসিব গান গেয়েও আসর মাত্ করতে পারেন। দ্বিতীয় লোকটি হচ্ছে দলের গাইয়ে,—বিবেক বা বৈরাগী সাজে। লম্বা, রোগা চেহারা, বয়স চল্লিশ ছাড়িয়েছে—নাম, পঞ্চানন ধাড়া, বডবাবুর নাকি কোন দূর সম্পর্কের ভাইপো। এছাড়া নম্বরী অভিনেতা আছেন তিনজন, পালান মাইতি আর সর্বশেষ ঘড়ই, দুজনেরই মাইনে আড়াইশো করে। নটতিলক অম্বুজনাথের মাইনের কথাটা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। মেয়েদের মধ্যে শীলা ছাড়া আর কারুর মাইনেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

এরপর, কয়েকটা দিন ধরে যে সবাই কী অদ্ভুত পরিশ্রম ক'রে চলল, তা ঠিক চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। বড়োজোর মাসখানেক, কি তার একটু বেশী হবে, এরই মধ্যে নতুন পুরানো সব পালাই তৈরী হয়ে গেল। অতিরিক্ত পরিশ্রম আর ক্রমাগত রাত্রি-জাগরণের ফলে পঞ্চানন ধাড়ার চোখ দুটো দেখাচ্ছে লাল, তাব ওপব ঢুলে-ঢুলে আসছে। আমায় একসময় কাছে পেয়ে বলল—দেখুন দাদা অবস্থা, এক-একটা পালায় সতেরো-আঠারো খানা ক'রে গান, অবশ্যি ঐ 'উর্বশী' পালাটা ছাড়া। ওর পাঁচখানা গান মাত্র আমার, ওতো আমার কাছে নস্যি।

রাত একটা-দুটো পর্যন্ত ব'সে সমানে গান তুলেছে বা রেওয়াজ করেছে, কিন্তু, একটা জিনিষে আশ্চর্য লাগত, গলা একটুও খারাপ হতো না। একদিন প্রশ্নও করে ফেললাম ওকে। তাড়াতাড়ি মাথা নুইয়ে জবাব দিলে,—ম্যানেজারবাবু, জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন? আমার দ্বিতীয়ে মঙ্গল। গলা কখনোই খারাপ হবে না, আমি বানীসিদ্ধ।

এ-কথাটা শুধু আমাকে না, প্রায় সবাইকে ও বলে বেড়াতো। তাই ওর আড়ালে সর্বশেষ, সতীশ, ওরা সবাই মিলে ওর নতুন নামকরণ করেছে। আড়ালে ওকে ওরা বলে, বাণীসেদ্ধ। বাণীকে সেদ্ধ ক'রে ছাড়লে হে!

সতীশের কথাবার্তায় যশোর-খুলনার টান, অথচ, যখন সে অভিনয় করতো তখন তা বোঝা যেতো না। বললে—গানের জাঁক করে বেড়াচ্ছে! ধ্রুপদ গাইতে পারিস, ধ্রুপদ? গাইয়ে দানীর নাম শুনেছিস? মাঝারি চেহারা, গায়ে সাদা একটা জামা, কোনদিকে খেয়াল নেই, যেন সর্বক্ষণ সুরে ডুবে আছেন। পাখোয়াজ বাজাতেন কী চৎকার! যেমন বাজাতেন, তেমনি তেমনি আবার গানও গাইতেন। জুরির গানে তাল-বাটের কাজ কী সুন্দর!

খেয়ালী লোক, পাগলের মতো থাকতেন। রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন, তখনো যেন সুরে ডুবে আছেন! খেয়ালমতো আসরে এসে বসতেন। বলতেন, এতো শীগ্‌গির শীগ্‌গির যাত্রা শেষ হয়ে গেল? গান জমতে না জমতেই সব থেমে গেল যে!

মহলার সময় সুধীর ব্যানার্জী নিজেও যে-ভাবে খেটেছেন, তাতে চমৎকৃত না হ'য়ে পারা যায় না। আমাকে ডেকে বলতেন, দেখুন, ঠিক হচ্ছে তো? ট্রেনিং থিয়েটারের, বাড়তি কী করা দরকার, ব'লে-টলে দেবেন।

বলা-টলার ব্যাপার অবশ্য এসব ক্ষেত্রে বিশেষ নেই। পার্ট টুকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আগাগোড়া মুখস্থ ক'রে ফেলো, আর প্রবেশ-প্রস্থান, দাঁড়ানো, ঘুরে যাওয়া,—এসব পরস্পরের সুবিধা অনুযায়ী পরস্পর বলা-কওয়া ক'রে ঠিক ক'রে নাও।

মেয়েদের মধ্যে দেখা গেল বীণা। মেয়েটির গলার স্বর একটু নীচুতে। 'অ্যাক্ট' করবার সময় আসরের সবাই শুনতে পাবে কিনা সন্দেহ। তাকে নিয়ে নটতিলক এবং সময় সময় সুধীর ব্যানার্জী নিজে আলাদা ক'রে বলাতে লাগলেন, কিন্তু সুফল পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। মালতী আর চোরী আগেই কোন্ দলে বুঝি ঢুকেছিল, যাত্রা ওদের অভ্যেস হয়ে গেছে। শীলাও তৈরী। কিন্তু বীণা হয়ে দাঁড়ালো সমস্যা।

ছোটবাবু চুপচাপ একদিকে বসে সব দেখতেন, বলতেন না কিছুই।

নটতিলক সেদিন বীণাকে নিয়ে পড়েছিলেন। বললেন—বলো, ওগো!

—ওগো!

—আমি বড়ো একা।

বীণা বললে, কিন্তু ঠিক তেমনটি হলো না। গলা ভারী ক'রে বলানোর চেষ্টা, চাপা গলায় কথা বলে পরে সেই কণ্ঠস্বরকেই বড়ো করে বলা,—ঘন ঘন দম বন্ধ করে মাবার ছেড়ে কথা বলার অভ্যাস করানো—সবই করালেন নটতিলক, বলতে গেলে গলদঘর্ম হ'য়ে গেলেন। মাঝে একবার রেগেও গেলেন সাংঘাতিক, মনে হলো, বীণার গালে বুঝি চড়ই বসিয়ে ছাড়বেন! কিন্তু না, শান্ত হয়ে গেলেন পরক্ষণেই। বীণার কাঁধে হাত রেখে, অপর হাতে চিবুক ধরে মুখখানা তুলে সস্নেহে কোমল কণ্ঠে বলে উঠলেন—লক্ষ্মী মেয়ে, নিশ্চয়ই পারবে। আরেকবার চেষ্টা করতো? বলো, আমি বড় একা।

বীণা বলতে গিয়ে এবার হেসে ফেললে।

নটতিলক হতাশ হ'য়ে এবার সরে এসে বসে পড়লেন। উঠলেন স্বয়ং

সুধীর ব্যানার্জী। বললেন—আচ্ছা, চীৎকার ক'রে বলো তো কথাটা এবার।

—চীৎকার করে?

—হ্যাঁ। যতোটা পারো।

বীণা বললে—রাস্তায় লোক জড়ো হয়ে যাবে না?

—তা হোক।

বীণা একটু থেমে তারপরে সত্যিই চীৎকার ক'রে বলতে গেল—ওগো—

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুধীরবাবু চেপে ধ'রেছেন ওব মুখখানা সজোরে। বললেন—বলো? বলে যাও তুমি।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! একহাতে ওর মাথার পিছন দিকটা, অন্যহাত ওর মুখে, মেয়েটি কথা বলার চেষ্টা করছে, মুখচোখ লাল হয়ে উঠছে, আর কেমন যেন গোঁ-গোঁ শব্দ উঠছে।

এক সময় ওকে হঠাৎ-ই ছেড়ে দিলেন সুধীরবাবু, বললেন—এবার বলতো কথাটা, একটু জোরে। মেয়েটি হাঁপাচ্ছে তখনো, হাঁপাতে হাঁপাতে কথাটা বললে কোনক্রমে। একটু যেন ভালোও শোনালো। সুধীরবাবু বললেন—না, এখনো তৈরী হয় নি।

মেয়েটা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুপিয়ে উঠল, বসে পড়ল তার যায়গায়। মালতী তাকে ধ'রে জিজ্ঞাসা কবলে—কীরে, কী হলো? কাঁদছিস কেন?

কিছু বলেনা মেয়েটা, ফুলে ফুলে কাঁদে শুধু। কিছুক্ষণ ধ'রে এই চলল। তার কান্না থামায় কার সাধ্য।

শীলা বসে ছিল ওব কাছেই নির্বিকার চিত্তে। সে ওর দিকে সরেও যায়নি, কোনো কথাও জিজ্ঞাসা করেনি। শুধু একবার আমার দিকে তাকিয়ে সবার অলক্ষে ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টেনে আনল। যেন আমাকে বলতে চায়, বুঝলে কিছু, ওহে নতুন লোক? এ তুমি বুঝবেও না।

অনেক পীড়াপীড়ি, অনেক সান্ত্বনায় বীণা একটু শান্ত হলো, বললে—কাল থেকে আমি আসব না।

—কেন?

টেনে টেনে কান্নাভরা কণ্ঠে বীণা বলতে লাগল—যাত্রা আমি পারব না।

নটতিলক আর সুধীর ব্যানার্জী একসঙ্গে বলে উঠলেন—খুব পারবে। কেন পারবে না?

সুধীরবাবু বললেন—এসো, আবার চেষ্টা করা থাক। এবার তুমি নিশ্চয়ই পারবে।

সমস্ত কান্না মুহূর্তে থেমে গেছে। আঁচলে চোখ মুছে সত্যিই উঠে দাঁড়ালে বীণা। সুধীরবাবু বললেন এবার জোর দিয়ে বল তো,—ওগো, আমি বড়ো—

বাধা দিয়ে হঠাৎ-ই এই সময় বলে উঠছেন বিপ্লববাবু,—ভাববেন না, আমি মাইক আর মাইকের লোক ভাড়া ক'রে নিয়ে যাবো। সুতরাং, কারুরই চীৎকার করা দরকার হবে না। আপনারা 'ফিলিংস্' এর কথা ভাবুন।

নটতিলক বলে উঠলেন—ছোটবাবু, তুমি 'আর্ট' চাইছ তো? বেশ, দেবো। 'পশ্চার' দিয়ে অ্যাক্টো না করলে আজকে কেউ পৌছে না। তার ওপরে, 'ফোকাস' যখন দিলে 'এক্‌স্‌প্রেশন'ও পাবে। কিন্তু 'মাইক' দিও না। ওতে প্লে করে দেখো, কথা শোনা যায় বটে, গলার স্বর ঠিকমতো মানুষের প্রাণে গিয়ে লাগে না।

সুধীরবাবু বললেন—অম্বুজবাবুর সঙ্গে আমিও একমত। মাইক দেবেন না, ওতে ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় না। আমার গলার সাতটি স্বর ওর মধ্য দিয়ে দুটি-কি-তিনটি স্বরে পরিণত হয়। দ্বিতীয়তঃ আমাদের গলায় যার যা প্যাশন আছে, সেটা মাইকে পেতে গেলে যে ধরণের 'সেন্‌সিটিভ্‌' মাইক দরকার, সে আপনি ভাড়াতে পাবেন কোথায়? ওসব বেশীর ভাগই বক্তৃতার মাইক। বীণাকে নিয়ে আপনি ভাববেন না, আমাতে আর অম্বুজবাবুতে মিলে ওকে ঠিকঠাক ক'রে নেবো।

ছোটবাবু সংক্ষেপে বললেন—বেশ, আমার আর আপত্তি কী!

এদিকে এত যে কাণ্ড, বড়বাবু কিন্তু কথাটি বলতেন না। তাঁর গড়গড়ার নলে তিনি মুখ রেখে থাকতেন। অবশ্য সবদিন আমাদের মতো অত রাত পর্যন্ত থাকতে পাবতেন না। কখনো কখনো দেখেছি, ঘুমে চোখদুটো ঢুলে আসছে। বলতেন—এই বয়সের মারটা আর ঠেকাতে পারছিনা হে সরকার মশাই! চলো।

ফ্যালারাম ওঁকে নিয়ে যেতো।

কাজ যথারীতি আবার চলতে লাগল বটে, কিন্তু ছোটবাবুকে নিয়ে একটা চাপা উত্তেজনা যেন সবার চোখে-মুখে প্রকট হয়ে উঠল। কথাটা চোরী যেন কাকে একদিন বলেই ফেললে—বীণার ওপর ছোটবাবুর এত দরদ কেন বলতো?

নটতিলক আর সুধীরবাবু যেন চোখে-চোখে কথা বলে নীরবে পরামর্শ করে ফেলেছেন।

বীণা মহলায় উঠতে এঁরা আর তেমন ক'রে ওকে নিয়ে পড়েন না, বলার ঢংটা একটু ঠিক করে দিয়েই বসে পড়েন। বলেন—ঠিক হচ্ছে।

সতীশ দেবনাথ চাপা গলায় বলে ওঠে—হাওয়া ঘুরতেছে। নদীতেও বর্ষা লাগিছে। কেমন কূলে ছাপায়ে উঠতিছে, ছাখচ না?

এটা ওর কথা বলার ধরণ। পরেও দেখেছি কোনো সরস ঘটনার আভাষ পেলেই হাস্যরসিক সতীশ এই ধরণের কথা বলে ফেলবে।

কিন্তু, চারিদিকে এত যে কাণ্ড, আমাদের 'প্রম্প্‌টার' কিন্তু সেই নির্বিকার 'প্রম্প্‌টার'ই আছে। কথাটা এমনভাবে কানাকানি হতে লাগল যে, শেষ পযন্ত, আমি গোকুলবাবুকেও কথাটা বলতে গিয়েছিলাম। উনি মধ্যপথে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—জানি।

মুখখানা গম্ভীর থমথম করছে, বললেন—এই ভয়টা আমি গোড়া থেকেই ক'রে আসছি।

—এখন কী কর' যায়?

গোকুলবাবু্‌ বললেন—আপাততঃ কিছুই করব না। তবে তুমি লক্ষ্য রাখবে, আমি যে ব্যাপারটা জানতে পেরেছি, একথাটা যেন কেউ টের না পায়।

গোকুলবাবুর উপদেশ আমি মেনেই চলছিলাম। কাউকে বলিনি। শীলাকেও না, অজিতকেও না। ফ্যালারাম যথারীতি অজিতকে চা দিয়ে যায় আর বলে,—আমাদের দিকেও একটু আধটু নজর দিও গো নম্বরবাবু্‌।

'নজর' অর্থে—বিড়ি। অজিত নিজে বিড়ি খায় না এটা আমি জেনেছিলাম। কিন্তু, তবু কিছু বিড়ি কিনে পকেটে রাখে, একে-ওকে-তাকে দেবার জন্য। বলে—এর ফলটা ভালোই হয়, সদ্ভাব বজায় থাকে। আর অনেকের অনেক দুঃখের কথাও জানতে পারি।

এসব দিনগুলোতে আমারও পরিশ্রমের অন্ত ছিল না; শীলার সঙ্গে কথা বলার অবকাশও পেতাম না, অজিতের সঙ্গেও না। যেন বেশ কয়েকটা দিন আমাদের কেটে গেল তীব্র কোনো নেশার মধ্য দিয়ে। আসানসোলের নায়েক নিজে কলকাতায় এসে একদিন দেখে গেল উর্বশীর মহলা। আসামের নায়েক আসেনি, জলপাইগুড়িরও না। কিন্তু সব জায়গা থেকে এবার পূজোয় আমাদের যে ডাক এলো, তা আশাতীত। মেয়েরা দলে রয়েছে, এ একটা বিরাট আকর্ষণ হয়েছে বোঝা গেলও। তার ওপরে, থিয়েটার-জগতের নাম-করা নট সুবীর ব্যানার্জী রয়েছেন। তাছাড়া, নটতিলক পঞ্চানন ধাড়া, পালান মাইতি, এরা দলে আছে কি না তাও জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠিয়েছিলো অনেকে।

প্রস্তুতি দ্রুত এগিয়ে চলছে, সবাই কাজে ব্যস্ত। এরই মধ্যে আবার চুটকী গল্পেরও বিবাম নেই, পরস্পরের মধ্যে কানাকানিরও বিবাম নেই। আমাকে আব শীলাকে নিয়ে যে বেশ কিছু মুখরোচক কাহিনীব স্বচনা হয়েছে, এটা বোঝা আমার পক্ষে আদৌ কঠিন হলো না। আমাকে একদিন পরিশ্রান্ত লক্ষ্য ক'বে সতীশ দেবনাথ আমাকে আর শীলাকে নিয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত কবতেও ছাড়ে নি শুনলাম। সর্বশেষেব পাশে বসে সতীশ নিম্নকণ্ঠে ব'লে উঠল—ম্যানেজাববাবুবই লক্ষ্য কবছি॥

—কী?

—দেখচ না শবীব যেন আব বচচে না। চোখ ঢুলি ঢুলি পড়ছে।

—তা খাটনী কেমন পড়েছে দেখছ না? এখানে যাও, সেখানে যাও। মহলায় ব'সে একে এটা বুঝিয়ে দাও—ওকে ওটা বুঝিয়ে দাও, বাত জেগে চিঠি লেখ, হেন-তেন কর্তাদেব কি আব ফবমাশেব অন্ত আছে?

চোখ মটকে সতীশ দেবনাথ বললে আবে দূব! খুব বুঝিছ তুমি মজাটা। আসল বথ, পক্ষিবে সামলানো কি আব ওব কম্ম? ঐ কাঠামোয়! হ্যাঁ, পাতাম আমবা, দেখিয়ে দিতুম।

সর্বশেষ বললে—এই বয়সেও এই পেতে ইচ্ছা কবে নাকি?

সতীশ একটু হেসে বললে—মবা হাতি এখনো লাখ টাকা। মোহনবাগান পুষবাব হিম্মত এখনো এ শম্মাব আচে, বুঝলে হে? তবে হ্যাঁ, পাতাম পক্ষিব, ইংরিজি পেঁজিব দল হটিয়ে দিতাম। ক্যামনে পাওয়া যায় কও দেখি? এর উ-আনটু বাজাবে দেখলাম, তা পাখী বড় সায়না, বা বাড়ে না।

সর্বশেষ নাকি হেসে বলেছিল—ওদিকে নজব দিও না, ম্যানেজাব চাবকাবে।

সতীশ বলেছিল—তবে নজবটা আব দেবো কোন দিকে? বানা মাইনেটাব আল। চতুর একটা ছেলে, তো ও দেখ ফাঁক পেলে ছোটকর্তাব মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'বে চাইয়ে থাকে।

এ সব আলোচনা কেমন ক'বে আবা যেন ঘুবে-ফিবে ঠিক আমাব কানে এসে পৌঁছত। প্রথম-প্রথম ব্যথা পেতাম মনে, অস্বস্তিও বোধ কবতাম। কিন্তু পবে সবই ধীবে ধীবে গা-সওয়া হয়ে এসেছিল।

মহলায় নাটক নিয়েও আলোচনা হতে শুনতাম। সেখানে স্বধাব থেকে পালান মাইতি, সব এক সুবে বাঁধা। তুমুল তর্কও হতো। অমুকেব কলমেব ধাব ভালো, অমুকেব মন্দ, এতো আছেই। আব আছে তাব অভিনব বিশ্লেষণ। একজন বললে—'চরিত্র' পাচ্ছি না মশাই, গোটা একটা চবিত্র, কী

মেজাজ নিয়ে ঢুকব! কেমন যেন চরিত্রটা! যাকে বলে—ধারাবাহিকতা তা নেই।

নিজের মনেই হাসতাম। ভাবতাম জীবনেই বা কোন্ চরিত্রের ধারাবাহিকতা আছে? তুমি—আমি সবাই তো inconsistant কখন যে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটবে আমার মধ্যে তা কি আমিই জানি?

যাই হোক, এদের মহলায় বসে, এদের কাছ থেকে দেখে, এদের আলোচনা শুনে, আমার যা মনে হয়েছে, সে হচ্ছে এই যে, ওরা পালার পর সংলাপ মুখস্থ আর আবৃত্তি ক'রে কথা বলাটা শেখে বটে, কিন্তু যার সঙ্গে এদের একেবারে ভাসুর ভাদ্রবৌ সম্পর্ক—সে হচ্ছে সাধারণ সাহিত্য-বোধ। নাটকের অ্যাকসন, নাটকের ক্লাইম্যাক্স, নাটকের ওঠা-পড়া—এ সব আঙ্গিক নিয়ে খুব তর্কাতর্কি ওরা করে বটে নিজেদের মধ্যে। কিন্তু সাহিত্যবোধ বা কোনো অনুভূতির পরিচয় সচরাচর লক্ষ্য পড়ে না। কিন্তু অতীতে এটা ছিল না বলে মনে হয়। পুরাতন মতি রায় কিম্বা বিগত দিনের মুকুন্দ দাস—এদের সম্বন্ধে যতটকু শোনা যায়, এঁরা ছিলেন প্রচণ্ড বিদ্যোৎসাহী, রীতিমত সৎসঙ্গ এবং সৎ আলোচনায় মগ্ন থাকতেন এবং যা এঁদের প্রকৃত মূলধন ছিল, তা হচ্ছে—সহজাত তীক্ষ্ণ অনুভূতি আর সাহিত্যবোধ। এদের দেখে দেখে মনে পড়ে যেতো, সেক্সপীয়ারের 'মিড্ সামার নাইটস্ ড্রিম'-এর সেই ছুতোর মিস্ত্রি পিটার কুইন্স, তাঁতী বটম্ প্রভৃতিদের কথা। বটম্-এর মতো অভিনেতাদের তিনি প্রকারান্তরে গাধার সঙ্গে তুলনা করে গেছেন। এবং কী দুঃখে যে ক'রে গেছেন, সেটা যেন হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। প্রথম-প্রথম নাট্যরস নিয়ে এঁদের সঙ্গে অবকাশ মতো আলোচনাও করতে গেছি। দলের একজন প্রবীন অভিনেতা জনান্তিকে মন্তব্য করতো—যদুবাবু আজ বই পড়ে এসেছে হে!

কথাটা কানে আসতে চমকে উঠতাম, ব্যথাও পেতাম মনে মনে। বই পড়ে এসেও যদি কেউ থাকে, সেটা কী অপরাধ?

পরক্ষণেই কিন্তু করুণা হতো। ভাবতাম—এ রকম মনোভাব গড়ে উঠল কেমন করে? সারাজীবন গ্লানিময় দিন যাপন করেও সহজাত শুভবুদ্ধি বলে অনেকে তার ঊর্দ্ধে চিত্তকে স্থাপিত করতে পারে—এদের মধ্যে অনেকের অনেক গ্লানির ইতিহাসই আমার জানা, কিন্তু তা ইতিহাস মাত্র, বর্তমান জীবনে তার কালো ছায়া এই সব প্রবীণের ওপরে এসে পড়েছে কী করে? এদের সঙ্গে থেকে থেকে এটকু বুঝতে পেরেছি, যারা যে বিষয়ে যত বেশী অপরাধপ্রবণ,

তারা সেই অপরাধের প্রতিফলন দেখতে পায় সর্বত্র। পায় বলেই কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই, কেউ কারুর শুভানুধ্যায়ী নয়, অথচ মুখে প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেকের একটা মাপা হাসি বিরাজমান রয়েছে। কে এক বিদেশী সমালোচক বলেছিলেন—সাধারণ আর্টিষ্টদের বুদ্ধিও নেই হৃদয়ও নেই। তারা বুদ্ধিহীনও বটে হৃদয়হীনও বটে, যা তাদের আছে তা হচ্ছে 'bundle of emotions'! কথাটা যে কতদূর সত্য তা এবার বেশ বুঝতে পারছি। এরা যেটা প্রকাশ করে, বড়ো বেশী করে তা প্রকাশ করে। রাগ হলে, বড্ড বেশী রাগ করে। কাঁদলে, বড্ড বেশী কেঁদে ফেলে। হিংসা হলে সাংঘাতিকভাবে তা প্রকাশ করে। ঘৃণা হলে মর্মান্তিকভাবে সে ঘৃণাকে প্রকট করে। আর ভালবাসলে, প্রচণ্ডভাবে তা প্রদর্শন করে।

তবে, সাফল্যমণ্ডিত ব্যক্তিদের কথা আলাদা। 'Nothing suceeeds like success!' সাফল্য তাদেব অনেক কিছু অন্ধকারকে জয় করতে সাহায্য করে। কিন্তু কথা হচ্ছে, যথার্থ সাফল্য লাভ ভাগ্যে জোটে কয়জনের? অধিকাংশই তো 'হাল ভাঙা পাল ছেঁড়া' ব্যথা নিয়ে একূলে ওকূলে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মালিকদের মর্জির ওপরে এদের চাকরী বলে মালিকদের ওরা ভয়ানক ভয় করে চলে। যে দোষের জন্য একে অপরেব নিন্দা করে বেড়ায় ক্রমাগত, সে দোষ মালিকদের মধ্যে দেখলে তাদের নিন্দা করা তো দূরের কথা, সেই বিশিষ্ট দোষকে গুণ হিসেবে তারিফ করতেও কাউকে কাউকে শুনেছি। আমাব হাতে ওদেব চাকরী নির্ভর করছে না বলে আমাকে ওদের ভয় করে চলতে হয় না, তবে খোসামোদ করে চলতে হয়, গোপন খবরাখবর নেবার জন্য। ওদের দোষ নেই, মর্মান্তিক অর্থকৃচ্ছ্রতাই এই শোচনীয় মানসিকতার জন্য দায়ী। একজন কেরাণী বা মজুরেব চাকরীর যে স্থিরতা রয়েছে আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে,—এদের মধ্যে তা একেবারেই নেই। কন্ট্রাক্ট-এ এরা কাজ করে, বৎসরান্তে এরা কে কোথায় যাবে তার কোনই স্থিরতা নেই। একদিকে এই অস্থায়ী জীবিকা, অন্যদিকে এই নিছক সংলাপ আবৃত্তি করা নট বৃত্তি,—এই দুই মিলিয়ে যত দিন যায় ততই ওদের চরিত্র হয়ে ওঠে বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর। আমাকে ওরা কেউ পছন্দ করতো, কেউ করতো না, কিন্তু হিংসা করতো অনেকেই। কিন্তু এও জানি, যদি হঠাৎ আমার কোন দুর্ঘটনা ঘটে, যদি প্রাণবিয়োগ হয় আমার, ওরাই ছুটে যায় সবার আগে শ্মশানে, খবর শুনে সুশীলবাবুরা যে কেঁদে ভাসাবে—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ! ঐ

যে বললাম—bundle of emotions! যুগপৎ ঘৃণা আর ভালবাসা—উভয়ই ওদের প্রাপ্য। কিন্তু, এ সবই ছিল আমার মনের চিন্তা। পাশের লোকটি পর্যন্ত কিছুই টের পেতো না এর। মনোভাব প্রকাশ করার উপায়ও আমার ছিল না। কারণ, কে আছে বুঝবে আমার কথা? দ্বিতীয়তঃ, আমার চাকরীর প্রশ্নও যে এর সঙ্গে বিজড়িত। চাকরী মানে,—আমার দু'বেলার আহার, আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের মুখে কিছু কিছু অন্ন যোগানো।

ক্রমে ক্রমে এগিয়ে এলো রওনা হবার দিন। সবাই মিলে পরিশ্রম করছে যথেষ্ট। আমার বা অনন্ত দলপতির কথা থাক, যারা অভিনয় করবে, তারা যে সব ভুলে কী ভাবে তাদের কাজ নিয়ে মত্ত হয়ে রইল কদিন, সেটা দেখবার মতো।

প্রথমেই যাত্রা আমাদের আসামের দিকে। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ফলাকাটা, আলিপুর-দুয়ার, দিনহাটা, কোচবিহার থেকে শুরু করে ধুবড়া, গৌহাটি, নওগাঁ, তেজপুর হ'য়ে ডিব্রুগড় পর্যন্ত। অর্থাৎ, পূজোর সময়টা আমাদের উত্তরবঙ্গ আর আসামেই কাটবে। আসামের যিনি আমাদের নায়েক, অর্থাৎ বায়নাদার, এক হিসাবে প্রতিনিধিও বলা যেতে পারে, লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন, তার সঙ্গে আমি আর অনন্ত রওনা হয়ে যাব আগে। পরে, দল নিয়ে আসবেন ছোটবাবু আর বড়বাবু।

আমার যাত্রা করার ঠিক পূর্বাদনের কথা। মহলার মধ্যে এক সময় হঠাৎ-ই একটুক্ষণের জন্য বারান্দার কোণে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল পক্ষির সঙ্গে। মহলার ঘরে আসি-যাই, কখনো ও চোখ তুলে একটু তাকায়, কখনো তাকায় না, একমনে নিজের পার্ট-লেখা কাগজগুলো পড়তে থাকে।

বারান্দা দিয়ে চলতে চলতে নীরবেই ওর পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলাম কী যেন ভাবতে ভাবতে। ও ডেকে উঠল—যদুদা।

দাঁড়িয়ে পড়লাম। ও কাছে এলো। বললে—আমার সঙ্গে তো কথা বলারও সময় নেই যদুদার!

একটুক্ষণ থেমে থেকে বললাম—যা করেছিলে, এখন তার ফল ফলছে। যা তা বলছে লোকে।

মুখ টিপে হেসে বললে—কী বলছে?

—শোনো নি?

বললে—শুনেছি। শুনে, আমার তো খুব মজা লাগছে! তোমার লাগছে না?

কী উত্তর দেবো। চুপ করে রইলাম। ও এদিক-ওদিক চেয়ে নিয়ে নিম্নকণ্ঠে বললে—আমি কিন্তু একদিক দিয়ে হেরে গেছি।

বিস্মিত হয়েই তাকালাম ওর দিকে। কী বলতে চায় ও?

অনুচ্চকণ্ঠে হঠাৎ-ই সকৌতুকে হেসে উঠল পঞ্চি, বললে—তোমাদের ঐ ছোটবাবু? ওর ওপরে 'চান্স' নেবো না ঠিক করেছিলাম, ভেবেছিলাম মানুষটি তোমার মতো। অর্থাৎ, যাকে বলে, দুর্ভেদ্য। এখন দেখছি, বীণা দিব্যি আমাকে মেরে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

—মানে!

বললে—জানো না?

—কী জানব?

—বীণা আর ছোটবাবুর কথা?

—না তো!

বললে—ছানি পড়েছে নাকি চোখে, এই বয়সে? দেখতে পাও না? দিব্যি ভাব জমিয়েছে দুজনে?

বললাম—যাঃ! ও আমি বিশ্বাস করি না। ছোটবাবু অন্য ধরনের লোক।

—কে বলছে অন্য ধরণের লোক! পঞ্চি চাপা কণ্ঠেই ঈষৎ ঝংকার দিয়ে উঠল, তারপর বললে—কিন্তু মেয়েমানুষের নেশা কি অতো সোজা জিনিষ? সাধ্য কি তোমার ছোটবাবুর মতো বয়সের ছেলের তা এড়াবার? তুমিই কি পারো?

বিস্ময়ের ঘোর আমার কাটেনি। মনে হলো, ভিন্নতর এক জগতের কথা আমি শুনছি, যার সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই আমার, কোনো কল্পনাও নেই।

আমাকে নিরুত্তর লক্ষ্য করে চোখে অদ্ভুত এক কটাক্ষ ফুটিয়ে, সুঠাম দেহছন্দ ঈষৎ হিল্লোলিত করে পঞ্চি বলে উঠল—তোমারও মুণ্ডু কি ঘোরানো যায় না? খুব যায়। পুরুষমানুষ তো তুমিও, তোমাকে কাঁচপোকার মতো টেনে আনব পিছনে-পিছনে, ও আর আশ্চর্যের কথা কী!

গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বললাম—এ-কথাই বলতে চাও নাকি?

মুখ টিপে আবার হাসল পঞ্চি, বললে—বলবার কথা আমার অনেক। কিন্তু সে-সব আপাততঃ মুলতুবী থাক।

—চলি।

পঞ্চি প্রায় আমার হাতটা ধ'রে ফেলে আর কী! বললে—চলি মানে! দাঁড়াও না একটু।

বললাম—সেটা কী ভালো? কে কোথা থেকে দেখবে, আর কী মনে করবে।

সকৌতুকে পক্ষি বললে—কী আর মনে করবে! সবাই জানে, আমি তোমার মেয়েমানুষ। বলেই চটুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল,—হ্যাঁ গো, তাই হয়ে পড়ব নাকি সত্যিসত্যি!

গম্ভীর দৃঢ়কণ্ঠে বললাম—কী হয়েছে আজ তোমার? আজে-বাজে এসব কী বলছ? কী কনট্রাক্ট হয়েছে আমার সঙ্গে তোমার?

—কথা বলার কনট্রাক্ট।—পক্ষি বললে—তাইতো বলছি, আর কিছু তো করি নি! করেছি?

এবার হাসি ফুটল আমার মুখে। বুঝলাম, আগাগোড়া সবটাই ওর কৌতুক। যে কোনো কারণেই হোক, কৌতুকরস ওকে পেয়ে বসেছে, আর সেটা যেভাবেই হোক ব্যক্ত না করে ওর উপায় নেই। আমি তার উপলক্ষ্য মাত্র।

প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য বলে উঠলাম--কিন্তু কী কথা তখন বললে, ···বীণা আর ছোটবাবু—

বাধা দিয়ে ও বললে—যাও না?

—কোথায়!

—মহলার ঘরে।

—কেন?

—দুজনে চোখে-চোখে কতো কী কথা হচ্ছে নিজের চোখে দেখে এসো না গিয়ে

হালকা ভাবে হঠাৎ আমিই বলে ফেললাম—চোখে-চোখে আবার কথা কওয়া যায় বুঝি?

—ওমা! কেমন ছেলে তুমি!—পক্ষি বললে—বাড়িতে কী করো? না কী, বিয়ে-করা বউয়ের সঙ্গে ভাব তোমাদের বেশীদিন থাকে না?

—এ-ও কিন্তু বাজে কথা বলছ।

পক্ষি বললে—বাজে কথা! চোখ তুলে তাকাও কখনো? বলে চোখই নেই! কতো কি ঘটে যাচ্ছে সংসারে।—ঝংকার দিয়ে কথা-বলাটা শেষ করে কেমন যেন সাপিনীর মতো হেলতে-দুলতে চলে গেল পক্ষি।

কিন্তু, এত কৌতূহল সত্ত্বেও আমি মহলা-ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারলাম না তৎক্ষণাৎ। যদি আমারও চোখে পড়ে যায় ওদের যা চোখে পড়েছে কেন যেন মনে হলো, সেটা বুঝি আমারই লজ্জার কারণ হ'য়ে দাঁড়াবে।

রওনা হয়ে যাবার ঠিক আগের দিনই হবে বোধ হয়। অজিতকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা কি জেনে নেবার চেষ্টা করলাম সোজা-সুজি, বললাম—হ্যাঁ হে, একী শুনছি! বীণা আর ছোটবাবু—

আমাকে কথাটা শেষ না করতে দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল অজিত—আমিও লক্ষ্য করেছি, এবং যতো লক্ষ্য করছি, ততই অবাক হচ্ছি। ভাবছি,—এ-ও হয়! কথাটা মনের মধ্যে তোলপাড় করছে দিনরাত!

—কী রকম?

অজিত বললে—বীণা আর ছোটবাবু সব ভুলে গিয়ে দুজনের দিকে দুজনে এমন করে মাঝে মাঝে তাকিয়ে থাকে মহলার ঘরে বসে, যে, সে-ভাষা পড়তে কারুরই ভুল হবার কথা নয়। কিন্তু, আশ্চর্যের ব্যাপার সেটা নয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, আমি তো বাইরে বাইরে বলতে গেলে সব সময়ই ছোটবাবুর সঙ্গে থাকি, কখনো ওসব কথা উঠে না, আর না ওঠাই স্বাভাবিক। বীণা মেয়েটি থাকে কোথায়, আমি জানি। থাকে শোভাবাজারে, বিরাট এক বাড়ীতে একখানা ছোট ঘর নিয়ে। কিন্তু, ছোটবাবু তো কখ্খনো যান না সেখানে! একেবারেই না, এ আমি হলফ করে বলতে পারি। তবে, বলুন তো যদুদা, এ কি ধরণের আকর্ষণ? কেউ তো কারুর সঙ্গে আড়াল খুঁজে নিয়ে কথাও বলে না! চিন্তা করতে করতে মনে হচ্ছে, তবে কী মোহ নয়? আর মোহ যদি না হয়, যা' আমরা কেউ পাইনি, ছোটবাবু কী তাই পেতে চলেছে?

একটু চম্‌কেই বললাম—কী?

অজিত বললে—প্রেম। আবার এ কথাও মনে হচ্ছে, বিপ্লব যতই প্রগ্রেসিভ হোক, যতই দরিদ্র-দরদী হোক, আসলে ও বড়লোকেরই ছেলে। অর্থনৈতিক সিকিওরিটির ওপরে বসে আছে, ওর মধ্যে রোমাণ্টিক চেতনা থাকা স্বাভাবিক বটে। আমরা রূপোপজীবিনীকে রূপোপজীবনী হিসাবেই হয়ত ভালবাসব, কিন্তু, ও তা পারবে না। ও হয়ত মেয়েটিকে মনে মনে ওর কল্পনার রঙ্ দিয়ে সৃষ্টি করবে, এবং যেদিন বুঝতে পারবে, ওর কল্পনার প্রতিমা মাত্র কল্পনারই, মাটি দিয়ে গড়া নয়—সেদিন প্রচণ্ড আঘাত পাবে। সেই আঘাতের কী প্রতিক্রিয়া ঘটবে, জানা নেই। আমরা দুজনে দর্শক হবো, প্রতিজ্ঞা করেছি। আসুন চোখ খোলা রেখে শুধু দেখেই যাই।

কথাটা ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়সের ছেলের মুখে শুনে সেদিন ভয়ানক চমকে উঠেছিলাম। ভেবেছিলাম অদ্ভুৎ বিশ্লেষনী ক্ষমতা তো ওর! কিন্তু পরে দেখেছিলাম এত বিশ্লেষনী মন নিয়েও মানুষ হঠাৎ একদিন আবার ভুল করতে

পারে, ভেসে যেতে পারে, নিছক আবেগের মুখে। কিন্তু, সেই বেদনাদায়ক পরিণতির পূর্বের কথাটা আগে বলে নেওয়া দরকার।

আমি তো চলে গেলাম আসাম অঞ্চলে—অনন্ত দলপতির সঙ্গে। আমাদের প্রথম শো-গুলি ঠিক আগেই আসামে নয়; আগে হবে—রাজা ভাত খাওয়ায়, তারপরে আলিপুর দুয়ার, তারপরে কুচবিহার, সেখান থেকে গিতালদহ, দীনহাটা, তুফানগঞ্জ। তুফানগঞ্জ থেকে শুরু হলো আসামের পর্য্যায়—প্রথমেই ধুবড়ী।

উত্তর-বঙ্গের এই যে কটা শহরে আমাদের অভিনয় হলো, তাতে, এক গিতালদহ ছাড়া, সর্বত্রই "উর্বশী" পালা হয়েছিল। গিতালদহ আর নিউ গিতালদহতে অন্য বই হয়েছিল একরাত্রির করে। এসব জায়গায় ছোটখাট ঘটনা যে কিছু না ঘটেছিল তা নয়, কিন্তু উল্লেখযোগ্য ঘটনা গিয়ে ঘটল—ধুবড়ীতে। এখানে বড়বাবুর সঙ্গে একান্তে কথা বলতে বলতে টের পেলাম, ছোটবাবুর ব্যাপারটা ওঁর কানে গেছে যথারীতি। বললেন—সরকার মশাই, আপনি আমার ডান হাত। আপনি এ'নিয়ে আগেই কথা বলবেন ভেবেছিলাম। যাই হোক, সব আমি জেনেছি, সব শুনেছি। কিন্তু, করারও কিছু নেই। এককালে ঢিল মেরেছিলাম, আজ পাট্‌কেলটি আমায় খেতেই হবে। তবে কী জানেন? এর অন্য দিকটাও আছে। সবসময় সব জিনিষটাই যে খারাপ হয়ে দাঁড়ায় তা নয়। ১৮৩২ সালে যখন নবীন বোস মশাই শ্যামবাজারে বিদ্যা-সুন্দর থিয়েটার করেছিলেন, সেই আমলের কিছু পরের কথা। নবীন বোসকে চিনতে পারলেন তো? বেজায় বড়লোক ছিলেন। আমাদের অম্বুজ নাকি ওরই কোন বংশধর—ডালপালা ধরে। তা, সেই সময় বরানগরের ছিল গানবাজনার জন্য খুব নামডাক। নবীনবাবুর পালায় যে 'সুন্দর' করেছিল, সে ছিল ঐ বরানগরেরই লোক। কী যেন তার নামটা, ভুলে গেছি, তবে ঐ বরানগরেরই আর একজন লোকের কথা বলছি। সে হচ্ছে প্যারীমোহন। চমৎকার ছিল চেহারা। বাড়ী-বাড়ী বেহালা বাজিয়ে ভিক্ষে করত। এইভাবে ভবানীপুরে এক বেশ্যার বাড়ী বেহালা বাজাতে গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ হয়। সেই আলাপ ক্রমেক্রমে দাঁড়ায় গিয়ে রঙ্‌-এ। তারা একসঙ্গেই থাকত এক বাড়ীতে। তারপরে, একটা যাত্রা পার্টি খুলে ফেললে দুজনে। প্যারীমোহনের 'নল দময়ন্তী' পালায় তখন খুব নাকডাক হয়েছিল। এছাড়া শুধু মেয়েদের নিয়েও একটা 'বিদ্যাসুন্দর' পালার দল তৈরী হয়েছিল। তাই বলছিলাম, ছোটবাবুই যে হালে মেয়ে নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করেছেন, সেটা নতুন

কথা কিছু নয়, সেই একশো বছর আগেও মেয়ে নিয়ে যাত্রা হয়েছে। আর ছোটবাবুর কথা যেটা বলছ, বীণা আছে বলে হয়ত আরও মনে মনে সে জোর পাবে কাজ করতে, কে বলতে পারে! তবে হ্যাঁ, বাপ হিসেবে কড়া চোখ আমি তার ওপরে রেখেছি, বাড়াবাড়ি হতে আমি কিছুতেই দেব না।

কলকাতায় যে-যার ক্ষেত্রে থাকে, সম্পূর্ণক্ষণ সবাইকে দেখা যায় না। কিন্তু, দল যখন বাইরে এলো, তখন দলের স্বরূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠল চোখে। বিশেষ করে অজিত যা দেখে, তাতেই নতুন কিছু অনুভব করে। আমিও করি, তবে পোড়-খাওয়া মানুষ আমি, ওর মতো অতোটা চমকে যাই না।

ধুবড়ী থেকে গেলাম আসামের বিভিন্ন জায়গায়। প্রায় একটানা মাস তিনেক ধরে অজস্র শো করে কলকাতায় এসে আবার যখন আমরা গেলাম কোলিয়ারী অঞ্চলে শীতটা কাটাতে, তখন একদিন অজিত বললে—দেখুন যদুদা, মর্যাদা-বোধ এখানে সবারই ভীষণ সাংঘাতিক। ভীষণ সেন্‌সেটিভ্ সবাই। ভাল আসন, খারাপ আসন, ওর দুটো মাছ, আমার একটা। ওর সাজবার পোষাকটা ভাল, আমারটা খারাপ। আমি সেনাপতি করছি বলে কি ফ্যাল্‌না? এই সব শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল।

ট্রেনে যেতে আসতে নানান রকম অভিজ্ঞতাই হলো। ধুবড়ি থেকে রওনা হবার সময় বড়বাবু বললেন—সরকার মশাই সঙ্গে থাক আমাদের। অনন্ত চলে যাক আগে আগে দু'এজনকে নিয়ে।

ছোটবাবু বোধহয় কিছু প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন, বড়বাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—তুমি বোঝ না বিপুল, উনি থাকলে সুবিধাই হবে। বুদ্ধিমান লোক, বেশ তাল দিয়ে চলতে পারবে।

তারপরেই একটু হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—যাত্রাদলের লোকগুলোর সঙ্গে তাল দিয়ে চলতে পারাটাই হচ্ছে আসল। সঙ্গতি রেখে যাও, দেখবে কাজ ঠিক চলে যাচ্ছে।

অতএব, তাই হলো। যাওয়া হতো থার্ডক্লাশে—গাদাগাদি করে। কামরা, রেলেরবাবুদের বলে কয়ে আমরা রিজার্ভের মতোই একটা ব্যবস্থা করে নিতাম। কিন্তু করলে কী হবে, নিজেরাই এমন ভীড় করব, এবং অস্বাভাবিক সুবিধা নিতে চাইব যে, অপরের কী হলো না হলো—দেখবার দরকার নেই। তাই মাঝে মাঝে, আমি আর অজিত 'রিজার্ভ কামরা' ছেড়ে দিয়ে আলাদা গাড়িতে গিয়ে উঠতাম একটু ফাঁকা দেখে। বড়বাবু ও ছোটবাবু নাকি কলকাতা থেকে থার্ডক্লাশেই এসেছিলেন, আমি জোর করে এরপর উঠিয়ে দিতে লাগলাম

সেকেণ্ড ক্লাশে। মেয়েদের তত অসুবিধা হতো না, তারা থাকতো লেডীজ কম্পার্টমেণ্টে।

সুশীল আর কান্ত ঘ্যানঘ্যান করতো, বলতো—সাজবার সময় ফিমেল সাজো, কিন্তু ফিমেল হবার সুবিধাটুকু দেবার নামটি নেই। কেন, মেয়ে সাজিয়ে আমাদেরও বসিয়ে দাও না ফিমেলদের গাড়িতে। একটু চার-পা ছড়িয়ে শুয়ে-বসে যাই। কেন বাবা, সাজঘর কি আলাদা করো নি! সেখানে তো মেয়েদের সঙ্গে একসঙ্গেই সাজতে হয়। শুধু মাঝখানে একটা শাড়ী দেয় টানিয়ে।

ওদের একথাগুলিও কেমন করে যেন কাণে এসে পড়ত। অথচ, ওই ব্যবস্থা করতে হয়েছিল ওদেরই পীড়াপীড়িতে। সখীর ব্যাচ্, আর যে-সব পুরুষ মেয়ে সাজবে, এদেরও দিতে হয়েছে মেয়েদের ঘরে, তবে হ্যাঁ, মাঝখানে ঐ সাড়ীর আড়াল দিয়ে। ফলে, মেয়েদের সাজঘর বড়োই করতে হলো পুরুষদের মতো।

সুশীল বলতো—মেয়ে সেজে সেজে এমন হয়ে গেছি যে, সায়া ব্লাউজ পরার পর কোনো ব্যাটাছেলে ঢুকে পড়লে, বুকে তাড়াতাড়ি আঁচল টেনে দিই। বুঝতেই পারছেন, পুরুষদের সঙ্গে আমাদের সাজা কতো মুসকিল! তখন, আমার সঙ্গে দেখাদেখি সখীরাও এসে জুটেছে। নইলে, ওদের আবার এসব কী? আগে আগে যখন আসল মেয়েরা আসে নি তখন আমাদের জন্য আলাদা সাজঘরই হতো।

সুশীলরাণী কিন্তু বাস্তবিকই একটু অদ্ভুত মানুষ। মেয়েদের পাশাপাশি সেজে বেরোলে, সত্যিই ওকে পুরুষ-বলে চেনা কষ্ট। সব দর্শকই ওকে মেয়ে মনে করে। যারা মেয়েদের ফুল উপহার পাঠায়, তারা পাঁচটি তোড়াই পাঠায়। অন্য দুটি যারা মেয়ে সাজে, তাদের অবশ্য পুরুষ বলে চেনা যায়।

সুশীল মেক্-আপ নিয়ে পোষাক পরার পর বিড়ি খায় না। এক কথায় পোষাক পরার পর ও যেন নিজের সত্তাই ভুলে যায়। এবং এই ভুলে যাওয়ার চমৎকারিত্ব আমাকে আর অজিতকে মুগ্ধ না করে পারে না।

ও সেজে সাজঘরে বসে আছে, কোন পুরুষ ওর কাছ ঘেঁষে বসবার চেষ্টা করলে ও সরে যাবে। আর অভিনয়ের দিক দিয়ে শীলাকে ছাড়িয়ে ওঠবার ওর চেষ্টার অন্ত নেই। বড়বাবু যে বলেন, ওর মত পাকা মেয়েছেলে বার করুন তো দেখি? সে কথা আজ শীলাদের পাশাপাশি আরও সত্যি বলে মনে হচ্ছে। বলতো, একটা রাত্তিরের জন্যও আমাকে উর্বশী করতে দিন, আপনাদের পা ছুঁয়ে বলছি, ফুল ফুটিয়ে ছাড়ব। শীলা-ফীলা সব ফুঁয়ে উড়ে যাবে।

কিন্তু, শীলা যখন আসরে নেমে অভিনয় করছে, তখন এ কথাটা বলতে পারত না সুশীল, অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত। এক-একদিন বলত, দিদির গলার স্বরটা আর চোখ দুটো যদি আমি পেতাম! উর্বশী তো সত্যিই উর্বশী!

এক একদিন শীলাকেই বলে বসত—দাও না দিদি, ধার?

—কী?

—তোমার ঐ ঢলোঢলো দুটি চোখ, পাতলা ঠোঁটের হাসি, আর প্রাণ-মাতানো গলার স্বর।

পঙ্কি দুষ্টুমির হাসি হেসে বলত—ব্যাস্? এ হলেই চলবে? আর কিছু চাই না?

সুশীল লজ্জা পেয়ে কাছ থেকে দূরে সরে আসত।

সুধীরবাবু সাজঘরে কারুর পান-দোষ ক্ষমা করবেন না বলেছিলেন। সম্প্রতি বলতে আরম্ভ করেছেন—ধোঁয়া দোষও চলবে না। চললে আমি এখুনি ট্রেনে চেপে বসব।

রেগে উঠত পঞ্চানন, বলত—কী মুশকিল! আমাদের দুঃখ উনি কি বুঝবেন! এতগুলি গান গাইতে হয় না আমাকে!

অম্বুজনাথ, কিম্বা সর্বশেষ, কিম্বা সতীশ, কিম্বা পালান, পালা শেষ হবার পর অগত্যা কোথায় যেন যেত, তারপরে আস্তানায় ফিরে এসে বেলা দশটা পর্যন্ত পড়ে পড়ে ঘুমোত। প্রশ্ন করলে অম্বুজনাথ বলত, মশায়, গলা ফাটিয়ে শরীরের যা হাল হয়, একটু আধটু সুরা নইলে চলে না। আপনারা আমাদের এ দোষটাই দেখেন, কারণটা খুঁজে দেখেন না, এই যা দুঃখ।

বলতাম, সুধীরবাবু দেখুন না একবার।

সর্বশেষ বললে—তা উনি পারেন। আস্তানা থেকে বেরুবার আগে ওষুধের মত এক ঢোঁক খেলেই ওঁর চলে যায়, কিন্তু আমাদের? দিনের পর দিন রাত্রি জাগরণ। কোন কোন রাত্তিরে ডবল শো। শরীরটা টেঁকবে কি করে বলুন?

অজিতকে ডেকে বললাম কথাটা। ও বললে—জানেন না? বড়বাবুকে বলে পারমিশন নিয়ে নিয়েছেন সুধীর। বড্ড স্ট্রেন হচ্ছে নাকি!

সুধীরবাবু বললেন—আমরা যা-ই যেখানে গিয়ে করি না কেন, যাত্রা-থিয়েটার আর সিনেমা, আসলে আমরা সবাই একজাত। আমার সঙ্গে আপনার সুশীলরাণীর কোনো তফাৎ নেই। আমি বিদ্যার চর্চা কিছু করেছি, ও করে নি। কিন্তু মনের গড়নের দিক থেকে আমরা এক। এক বেদনাই

সবার। কোথায় যেন পড়েছিলাম, ভারতবর্ষের নাম ছিল তখন জম্বুদ্বীপ। খুব জামগাছ হতো আর কী। সেই জম্বুদ্বীপে নহুষ নিয়ে আসেন স্বর্গ থেকে নাটক। ভরত পাঠালেন তাঁর চার শিষ্যকে—কোহালা, শাণ্ডিল্য, ধৃতীত আর বৎসকে নাটক শেখবার জন্য, সঙ্গে আরও বহু স্বর্গের অভিনেতা ও অভিনেত্রী। এরা এসে কালক্রমে মর্তের মানুষের সঙ্গে প্রেমে পড়লেন। তাদেরই সন্তান-সন্ততিরা হয়ে দাঁড়াল—নট। কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রে এদের শূদ্রই আখ্যা দিয়েছেন। আমার মনে হয় গল্পটা রূপক। স্বর্গ থেকে এই instinct নিয়ে এসে আমরা একদিকে আছি, প্রতিযুগে এসে জন্মাই, কেউ নাটক গল্প কবিতা এসব লিখি, কেউ মুখে রঙ মেখে সে-সব রূপায়িত করি। দুঃখ পাই, কষ্ট পাই, মাথায় দুর্নাম নিয়ে ধরা থেকে চলে যাই, আবার আসি। আমাদের আসার আর বিরাম নেই।

অজিত চুপি চুপি আমাকে বলল—'স্বরলোকে নৃত্যের উৎসবে যদি ক্লান্ত উর্বশীর তাল ভঙ্গ হয়, দেবরাজ করে না মার্জনা।' কী মনে হচ্ছে জানেন যদুদা? আমাদের সবারই মধ্যে সেই 'নহ মাতা নহ কন্যা' রহস্যময়ী উর্বশী লুকিয়ে রয়েছে। তারই নির্দেশে আমরা যে-যার কর্ম আর জীবিকা নিয়ে জীবনের ছন্দটা বজায় রাখবার চেষ্টা করছি। কিন্তু যেদিন ঘটবে ছন্দপতন সেদিন হবে তালভঙ্গ। এখানেও জেগে আছে স্বর্গের বিচার, মহাকাল করে না মার্জনা!

যে যাত্রার দলের কথা আমি বলছিলাম শচীনবাবু, আজ তা একটি নিছক দল বলে মনে হচ্ছে না আমার কাছে। মনে হচ্ছে, আমরা যেন বিরাট এক মানব গোষ্ঠীর প্রতিভূস্বরূপ, অবমানিত লাঞ্ছিত কতগুলি মানবাত্মা—সবার কলঙ্ক, সবার ঘৃণা মাথায় নিয়ে সর্বমানবের জয়গান করে যাবার দুর্বহ যজ্ঞে ব্রতী হয়েছি। কলঙ্ক তো আমাদের ছিলই। অপবাদও ছিল। ইতিমধ্যে সুশীল এসে সাজঘরে কেঁদে পড়ল, আমাকে ফাউল করেছে সতীশদা। এর বিচার চাই, নইলে আসরে বেরুবো না।

অর্থাৎ ওর কথা শেষ না হতেই সতীশ দেবনাথ ধরেছেন তার কথা, এই অপরাধ।

এর হাততালি ও চেপে দিলো, এ সব তো ছিলই। আর ছিল ছোটবাবু আর বীণার কথা। তখন আমার নিজেরই মনে হতো, বুঝি ছোটবাবুই আমার এ কাহিনীর নায়ক। পালা চলবার কালেই কোথা থেকে ঘুরে-টুরে ছোটবাবু বসতেন এসে আসরে। কয়েকজন অভিনেতার নাম উল্লেখ করে বলতেন, কী—

হচ্ছে কী আসরে? বাঁদর নাচ?—লোকে খুসী হচ্ছে, হাততালি দিচ্ছে, পয়সাও দিচ্ছে, কিন্তু তবু উনি খুসী নন। অভিনয়ের সামান্য ত্রুটি ঘটেছে কি ঘটেনি সেটা বিচার সাপেক্ষ, উনি প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশ করে চেঁচামেচি শুরু করেন, উনি মনিব, ওর কথায় ওদের চাকরি, তাই ছোট-বড় সবাই থাকত মুখ চুন করে। শুধু অদূরে দাঁড়ান বীণার চোখ দুটি উজ্জ্বল দেখাত। দয়িতের পৌরুষ যেন মেয়েটির সারা দেহমনে ঝংকার তুলে চলেছে। অন্য অনেকের মত আমারও মনে হতো, এতটা বাড়াবাড়ি উনি না করলেও পারতেন। অজিত বলত, এ রকম তো উনি ছিলেন না!—মনে হতো বীনার কাছে নিজের অস্তিত্বটাকে আরও প্রখর, আরও উজ্জ্বল করে তুলবার জন্যই ওঁর এ প্রয়াস। লক্ষ্য করতাম, প্রৌঢ়রাও এটা বুঝতো। এবং আর যিনি চমৎকার বুঝতেন, তিনি বড়বাবু স্বয়ং। কিন্তু কারও কিছু বলবার নেই। এ ওর সঙ্গে কথা বলতে পারছে না, চক্ষুলজ্জায় বাধে, অথচ এ ওর সঙ্গ পেতে চায়। ঠিক কি না বলো? তাই এটা ঘটে। তবে এ-ও বলব, ত্যাঁদোড়ও আছে দু একটা দলে, সব দলেই থাকে, এ-সব রাগরঙ্গ করলে তারা ঠিক থাকে। কিছু মনে করো না গো, সরকার মশাই।

কিন্তু লীলার সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, আমার এ কাহিনীর নায়ক ছোটবাবু সত্যিই নন। এর নায়ক অন্য। অজিতকে চুপি চুপি বলতাম, তোমার 'উর্বশী' পালার তো জয়জয়কার, আর পরিচয় দাও না কেন দলের সবার সামনে?

—না—না, কখখনো না! তাড়াতাড়ি বলে উঠত অজিত।

ওর সঙ্গে ছোটবাবুর সে রকম সংযোগ আর নেই। বরং [illegible] মশায়ের আমার সঙ্গেই মেশে আজকাল। তবে আগের চেয়ে অনেক উদাস, [illegible]নের কম কথা বলে।

দলের সবাই হঠাৎ আমার দিকে কেমন করে তাকাতে আরম্ভ করেছে দেখতে পাচ্ছি, কেমন যেন আবার সেই চাপা হাসি, কেমন যেন হঠাৎ আবার অনুকম্পার দৃষ্টি। ব্যাপার কী? পক্ষির সঙ্গে ইচ্ছা করেই তো আর কথা বলতে চাই না। তবে? একদিন স্বয়ং পক্ষিকেই জিজ্ঞাসা করে বসলাম। ও মুখ টিপে একটু হেসে বললে—নতুন মাছ গেঁথেছি যে উর্বশীতে, জানো না?

—কী রকম?

তেমনি হাসি-হাসি মুখে বললে—সবাই জানত আমি তোমার। হঠাৎ এখন সবাই জানতে আরম্ভ করেছে যে, আমি তোমার আর নই, আমি অজিতের।

ভয়ানক চমকে গেলাম, বললাম—তার মানে!

বললে—'উর্বশী' যে ওর লেখা জানাও নি কেন? ও এদিকে 'নম্বরবাবু' সেজে বসে আছে।

বললাম—এটা কবে জানলে?

বললে—ও-ই বলেছে।

বললাম—বড়বাবু, ছোটবাবু আর আমিই তা শুধু জানতাম। ওরই অনুরোধে আমরা কাউকে তা জানতে দিই নি। কিন্তু, এবার কি ও আত্মপ্রকাশ করতে চায়?

ঠোঁটের কোনে ওর বিচিত্র হাসি।—মোটেই নয়। ওর আত্মপ্রকাশ শুধু আমার কাছে। ও আমার প্রেমে পড়েছে।

বললাম—বলছ কী? আমাকে আর তোমাকে নিয়ে যে একটা রটনা আছে, সেটা জানা সত্বেও?

পঙ্কি বললে—ও তা বিশ্বাস করে না। বলে, দুষ্টু লোকের রটনা। আমিও তাই বললুম। প্রকৃতপক্ষে খুলেই বললাম সব কথা।

বললাম—এ অভিনয়টুকু না করলে সতীশ আর সর্বশেষরা আমার পিছনে ফেউ হয়ে লেগে থাকত না।

বললে—অদ্ভুত তো! এ রকম তো কখনও শুনিনি।

একটু হাসলাম, বললাম—কিন্তু, ওতো তোমার থেকে বয়েসে ছোট, তবে কী করে-

ও বাধা দিয়ে হেসে উঠে বললে—খুব বললে! উর্বশীর আবার বয়েস!

—কিন্তু, এসব মিথ্যে নয় তো? তুমি ওকে সত্যিই ভালবাসতে শুরু করেছ?

পঙ্কি একটু মুচ্‌কি হেসে বললে—মন্দ কী! বেশ উচ্ছ্বাস আছে ওর।

—দেখা কর কোথায় তোমরা দুজনে?

—ঐ একটু বেড়াতে বেড়াতে। আস্তানায় সুযোগ কই? ওখানে তো কড়া শাসন।

বলেই হেসে ফেললে, বললে—হাসি পায়। আমরা কী, তাতো আমরা জানি। আছি সবাই সতী সেজে। তোমার সঙ্গে তো আমার খাঁটি কথা বলার কন্‌ট্রাক্ট যদুদা—তাই বলছি, 'সতী'র ভূমিকা আমরা ভাল ভাবেই করি। চাই-ও তাই। কারণ দলের কাছে নাম না রাখলে চলে না। ওটাই আমাদের আকর্ষণ। যেটুকু ভালবাসাবাসি সে ঐ চোখের ভাষায়, কিম্বা কথা বলাবলির

মধ্যে। বড়জোর সবার আড়ালে কারুর হাত হাতের মধ্যে নিয়ে একটু চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলুম, ব্যাস্! যতুদা, আমরা কি আর এই বয়সে 'নারী' আছি? দেহটাই আছে, মনটা কই? আসলে, সুশীলরাণীর সঙ্গে আমাদের তফাৎটা কোথায়? যখন সেজে বেরোই, মেয়ে বলে যে সব বাইরের লোক ভাব জমাতে আসে, তারা সুশীলরাণীকেও খোঁজে। ও আড়ালে থেকে বলে—জানেন দিদি, মেয়ে সেজেই জীবন কাটল, এর থেকে সত্যিকার মেয়ে হলে ভাল হ'ত। ওকে কিছু বলি না, কিন্তু নিজের মনে মনে বলি, সত্যিকার মেয়ে-মন কি আমাদেরই আছে? তাই অজিত যখন কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে মিষ্টি কথা বলে তখন মন্দ লাগে না। মনে হয় আবার বুঝি আমার আঠার বছর বয়েস ফিরে পেলুম। মনের মধ্যে ধীরে ধীরে মধু জমে, বুঝলে? চাই নাকি সে মধুর একটু ভাগ?

হেসে বললাম—না। অমৃত আমার কাছে বিষ হয়ে উঠতে পারে। অজিত তরুণ, আমার বয়স হয়েছে। ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলার আর্টটাও বোধ হয় ভুলে গেছি।

পঙ্কি বললে—তাই কী? পুরুষ ওটা ভোলে না। তোমরা ইচ্ছে করলে ফুল ফোটাতে পার। অজিতের মনে রঙ্ ধরাতে আমার কি কম ছলা-কলা করতে হয়েছে নাকি?

আমি কোন কথা বললাম না। পঙ্কি নিজের মনেই বলতে লাগল—ও আমায় কী বলে জান? বলে, আমি নাকি সরস্বতী। আমার চলায় নাকি ছন্দ আছে, আমার দুটী হাতে নাকি অদৃশ্য বীণা। তুমি একবার কথাগুলো বলবে যতুদা? কেমন শোনায়, একবার অনুভব করে দেখতাম। ও বড্ড ছেলেমানুষ, কণ্ঠস্বর কেমন যেন কচি কচি। আমার আঠার বছর বয়সে ও যদি আসত, তাহলে ওর জন্যে আমি সব ছেড়ে বিবাগী হয়ে যেতাম।

বললাম—আজও কি পার না?

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে—কে জানে পারি কি না! একবার মনে হচ্ছে পারি, আবার মনে হয় পারি না। বহু পুরুষের সংস্পর্শে এসে এসে কেমন যেন যন্ত্রের মত হয়ে গেছি। কিন্তু মন বলে তবুও একটা কিছু আছে তো? সেই মনটা কেবলই অন্ধকারে মাথা কুটে মরছে।

বললাম—অজিতকে কিছু বলব?

আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালো—কী আবার বলবে?

—সাবধান করে দেবো?

—সর্বনাশ! ও বোধহয় আর্তনাদ করে উঠল—আমার এ-ও একটা খেলা, এটা ভেঙে দেবে? দিও না। বেশ লাগে ওর কবিত্ব শুনতে। আমি নাকি স্বয়ং সরস্বতী! পাগল, আস্ত পাগল একটা!

এই সংবাদটা মনে কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল, তা কিন্তু নয়। কেমন প্রচ্ছন্ন কৌতুক ও কৌতূহল জেগে উঠেছিল আমার মধ্যে। অজিতের সামনে দাঁড়াই, কথা বলি, কিন্তু 'বলি-বলি' করেও কিছু বলা হয় না ওকে। কাজের মধ্য দিয়ে, অক্লান্ত পরিশ্রম আর ছুটোছুটির মধ্যে দিন কেটে যায় আমাদের। এইভাবে, সারা আসাম ঘুরে, পুজোর অনেক পরে যখন আমরা ফিরে এলাম কলকাতায়, তখন যেন একটু বাঁচলাম দু'দিনের জন্য। কিন্তু, ঐ মাত্র দু দিনই। তারপরেই আবার রওনা। এবার খুব দূরে নয়। বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ। তারপরে ভগবানগোলা হ'য়ে—লালগোলা। এর মধ্যে জিয়াগঞ্জে যা হয়েছিল, তা-ও জীবনে আমার চির জাগরুক হয়ে থাকবে। ততদিনে সমগ্র দলটির সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয়ের একটা ঘনিষ্ঠতা জন্মে গেছে। "উর্বশী" পালা সেদিন ছিল না, সেদিন অন্য পুরানো বই। কেমন যেন মনটা হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল বলে সাজঘরের একান্তে বসেছিলাম চুপচাপ। সবাই এসে সাজতে বসল। সবারই জন্য এক একটা ছোট বাক্স, তার থেকে মেক-আপের সরঞ্জাম বার করে যে-যার কাজ শুরু করল। মেয়েদের সাজঘর অন্যদিকে। তার মধ্যে শাড়ীর আড়াল দিয়ে সুশীলদের জন্যও সাজবার ব্যবস্থা করে দিতে হয়েছে। পুরুষদের মধ্যে বসে সে সাজতে পারে না, এ নিয়ে হাসাহাসির অন্ত ছিল না দলের মধ্যে।

দলের হাস্যরসিক সতীশ দেবনাথই কৌতুক রসে মত্ত হয়ে গিয়েছিলেন বেশী। দোহারা শ্যামবর্ণের চেহারা, বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেলেও, মনের তারুণ্য যেন বিদায় নেয়নি তার। সুশীলকে জড়িয়ে নানান্ হাসির কথা বলছে, আর হো-হো করে হাসিতে ফেটে পড়ছে নিজেই। এবং হাসবার সময় তার মুখের যে চেহারা হচ্ছে, সেটা লক্ষ্য করে আবার দ্বিগুণ হাসিতে লুটিয়ে পড়ছে সবাই।

কিন্তু সতীশবাবুর এই হাসি যে অচিরেই কান্নায় রূপান্তরিত হবে, এ-কী জানতাম? সেদিন, পালা চলবার কালে, কোনো এক অঙ্কের বিরতির মুহূর্তে, তা দ্বিতীয় কি তৃতীয় অঙ্ক, আজ তা মনে নেই,—ফরমাস মতো হাসির গান গাইতে গেলো সতীশ দেবনাথ। স্বয়ং বড়বাবু দিলেন তাকে অভয়, বললেন—যাও হে সতীশ, মাতিয়ে দিয়ে এসো।

সতীশ তাড়াতাড়ি তাঁর পায়ের ধুলো নিতে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে "হাঁ-হাঁ" করে উঠলেন তিনি। বললেন—শরীরে কি কম পাপ আছে? পেন্নাম ক'রে আমার পাপটা আর বাড়িয়ে দাও কেন?

ওঁর এই ব্যাপারটা আমি আগেও লক্ষ্য করেছি। অভিনয় শুরু হবার আগে, কী স্ত্রী কী পুরুষ, সবাই চিরাচরিত প্রথা অনুসারে অধিকারীর পায়ের ধুলো নিতে গেলে, উনি কখনই তা' করতে দিতেন না। বলতেন—ঠাকুরের ফটোটাকে পেন্নাম করো। সরকার মশাই ব্রাহ্মণ, ওঁকে পেন্নাম করো। আমাকে না, খবরদার!

রীতিমত চোখ রাঙাতেন। বলতেন—আমার বয়স হয়েছে, আজ [illegible], বুঝলে কি না, পাটবেল খাবার দিন! যে-কদিন টিঁকে আছি, [illegible] খেয়ে যেতে দাও। শরীরটায় পাপ নেই মনে করো? যথেষ্ট আছে। এটা শোধন হলো না. এটাকে ছুঁয়ে কি পাপের ভাগীদার হতে চাও তোমরা?

তবু, ওরা যেত প্রণাম করতে, এবং প্রতিবারেই এভাবে বাধা দিতেন বড়বাবু।

এক-এক সময়, অবসর মতো, একান্তে জিজ্ঞাসা করতাম ওঁকে—আচ্ছা, এই 'শোধন' কথাটা দিয়ে আপনি কী বোঝাতে চান?

মুখ থেকে গড়গড়ার নলটা নামিয়ে, আমার দিকে মুখখানা ফিরিয়ে, তারপরে বলতেন—একবার একখানা 'সাট' পেয়েছিলাম মশাই, বাঁধনদারের নামটা মনে নেই, অনেক দিনের পুরোনো 'সাট', জাবদা খাতায় বড়ো বড়ো করে লেখা, ধারের কাছ বরাবর পোকায় কেটে গেছে। তাকে, এক যায়গায় ছ[illegible] দেহ শোধন হয় কী দিয়ে? একমাত্র মরণ দিয়ে। মরণ ত [illegible] সে জন্যই দরকার। আবার নতুন দেহ নিয়ে নতুন মায়ের কোলে এসে জন্মানো!

বলতে বলতে ওঁর চোখ আসত ছলছল করে, গলা আসত ধ'রে। তারপরে, সেই আবেগটাকে সামলে নিয়ে, ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে এনে বলতেন—তবে এবারেও জন্মে বোধহয় মা-কে কষ্টই দেবো; হবো ছন্নছাড়া ভবঘুরে যাত্রাওয়ালা! সংস্কার যাবে কোথায় সরকার মশাই, সংস্কার? অবাক হয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে থাকতাম ওঁর দিকে, তাকিয়ে থাকত সতীশ দেবনাথও।

বড়বাবু সতীশের দিকে মুখ ফেরাতেন, তারপরে বলতেন—সতীশ পাকা যাত্রাওয়ালা! ও কী আজকের লোক? কতদিন গরুর গাড়ী করে গাঁয়ের

পথে ক্রোশের পর ক্রোশ এগিয়ে গেছি, তখন এতো পথঘাট ছিল না, গরুর গাড়ী হয়ত বা মাঠের মধ্য দিয়েই দৌড় লাগিয়েছে! মনে করো সময়টা বোশেখ-জষ্ঠি মাস, সূর্যদেব মাথার ওপরে অগ্নিবৃষ্টি করে চলেছেন! তার ওপর যাওয়া-আসা তখন বেশীর ভাগ পাড়া-গাঁ অঞ্চলে কীসে হচ্ছে? না, গরুর গাড়ীতে। এব্ড়ো খেব্ড়ো পথের ওপর এমন ঝাঁকানি দিতো, যেন, মনে হতো, শরীরের হাড়গোড় আর কিছু রইল না! এ অবস্থায়, বলো দেখি, সঙ্গে তোমার ঐ মেয়ের দল থাকলে কি আর বাঁচতো? পৌছে গিয়ে অমনি 'রঙ্কাম' করে আসরে নেমে যাওয়া ত দূরের কথা, গা-হাত-পায়ের ব্যথা মরতেই কেটে যেতো—সাতদিন। কিন্তু, সুশীলদের কথা ধরো দেখি-নি! ঐভাবে সারাটা দিন গরুর গাড়ী ঠেঙিয়ে সন্ধ্যাবেলা যায়গামতো পৌছে, ঠিক দেখ রাত নটা নাগাৎ হাতে-পায়ে-মুখে রঙ্ মেখে—গায়ে পোষাক চড়িয়ে-দিব্যি 'পালা' শুরু করে দিলে, ঠোঁটের কোণে হাসি, চোখে বাঁকা চাউনি! আর, তারপরে ছিল এই সতীশ, সারাটা রাস্তা হাসি-ঠাট্টায় সবাইকে একেবারে মাতিয়ে রাখত! ওসব না করলে পথের কষ্ট সহ্য হওয়া কি সোজা কথা?

এটা অবশ্য আমিও লক্ষ্য করেছি। পঞ্চাশোর্দ্ধে বয়স পৌছে গেলেও, সতীশবাবুর অদ্ভুত এক ধরনের প্রাণশক্তি ছিল, যা নাকি সর্বক্ষণ উপ্চে পড়ছে! ওর হাসবার এবং হাসাবার ক্ষমতা সত্যিই ছিল। অথচ, সেদিন যা ঘটেছিল, তা একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল আমাদের কাছে। যে দিনের কথা বলছি, সেদিন বড়বাবুর কথায় আসরে ত গিয়ে নেমে পড়ল সতীশ। পার্ট করতে তখন নয়, পালা চলবার কালে অঙ্কে অঙ্কে যে বিরতি থাকে, তারই এক বিরতির সময়, তার সেই মাত-করে-দেওয়া হাসির গান খানা গাইতে গেল সে। গানের বাণী আজ মনে পড়ছে না, তবে ঘুরে-ফিরে, যে-আখরটা সে বরাবর ব্যবহার করত, সেটার কথা মনে আছে। গানের মধ্যে মধ্যে আখর দিচ্ছিল,—পিছ্লে পড়েই হাসছে বুড়ো-হা-হা—হাঃ হাঃ—হা।

বেশ মনে পড়ে সেদিনের কথাটা! আগে আগে ঐ গানখানিই গেয়ে হাসির কসরৎ দেখিয়ে—নানা রকম মুখভঙ্গী করে—দর্শকদের যে একেবারে মাতিয়ে দিয়েছে, এ-আমি নিজের চোখেই দেখেছি। ওর ঐ গানটা ছিল, যাকে বলে, 'মাষ্টার পিস্',—শ্রেষ্ঠ অবদান! অথচ, সেদিন, কী আশ্চর্য, ঐ গানখানারই ফল হলো অন্য রকম। আসরে গানটা শেষ করেই, প্রায় পাগলের মতো ছুটে এলো সাজ ঘরে। এসে, অঝোর ধারায়—ছেলেমানুষের

মতো—ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল সতীশ। আর্তকণ্ঠে বলে উঠল—এ কী হলো ম্যানেজারবাবু আজ, একটি লোকও হাসল না!

সতীশের কাছে বসে, ওর হাত ধ'রে, অনেক কষ্টে সেদিন শান্ত করেছিলাম ওকে। বারবার ভাঙা গলায় হাহাকার করে বলতে লাগল—ম্যানেজারবাবু, আমি কি ফুরিয়ে গেলাম! আমি কি শেষ হয়ে গেলাম!

বেশ মনে আছে, সে রাত্রে কোথা থেকে মদ্যপান করে এসে আস্তানায় রীতিমত হৈ-হল্লা বাঁধিয়ে দিয়েছিল সতীশ। অত শান্ত লোক হয়েও সেদিন মাথা স্থির রাখতে পারেন নি বিপ্লব বাবু। রাগের মাথায় ওর গালে ঠাস্‌ঠাস্ করে কয়েকটা চড়ই কষিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে সট্‌কার নল নামিয়ে রেখে, উঠে এসেছিলেন বড়বাবু, ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে উঠেছিলেন —এ কী করলে বিপুল! কার গায়ে হাত দিলে?

—মদ খেয়ে আসবে কেন? দলের বদনাম!

আর কিছু বলেন নি বড়বাবু, মুখখানা শুধু তাঁর থমথম করছিল। আমাকে বললেন—এসো সরকার মশাই, ওকে ধরি।

ধরলাম। টাল সামলাতে না পেরে মাটির ওপরে পড়ে গিয়েছিল—সতীশ। আমরা ধরাধরি করে ওদের ঘরে ওর বিছানায় ওকে শুইয়ে দেবার পর, দীর্ণকণ্ঠে বলতে লাগল—ব্যাটারা হাসেনি, ব্যাটাদের এবার আমি কাঁদাবো! আমাকে এবার কান্নার পার্ট দিন আপনারা, কান্নার পার্ট দিন। বলতে-বলতে আবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সতীশ! বলতে লাগল—ছোট্টবেলা থেকে এই অ্যাক্টো করা আর গান গাওয়ার নেশা আমাকে পেয়ে বসেছে! বাপ মা কতো পিটিয়েছে, কতো দূর-ছাই করেছে, বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছে পর্যন্ত,—তবু, এ-নেশা ছাড়ি নি। বড়ো হলাম, বাবা জোর করে বিয়ে দিলো। বলত, বিয়ে দিলে ছেলের মতিগতি ফিরবে! সেই বাবা একদিন চলে গেল, আমার মতি-গতি তবু ফিরল না! বউ-ছেলে কতো সাধাসাধি করে! বলে—ছেড়ে দাও, অন্য কাজকর্ম দেখ! তবু, ছাড়ি নি, ছাড়তে পারি নি! কেন? না, ভেবেছিলাম একদিন-না-একদিন লোকে আমার কদর নিশ্চয়ই বুঝবে! বউ-ছেলেকে সরিয়ে রেখে দেশ-বিদেশ ঘুরে, শরীরকে শরীর বলে গ্রাহ্য না করে, অপমানকে অপমান বলে গায়ে না মেখে, শেষ পর্যন্ত এ-ই হলো! আমার হাসি ওরা একেবারে নিলে না।

অন্ধকারে কাছেই কোথায় বুঝি বসেছিল দলের 'বিবেক'—পঞ্চানন ধাড়া, হঠাৎ-ই এই সময় গেয়ে উঠল একটা গজল—

তনুমনমে নাচি গাহই ফায়দা না মিলয়—
নটী কহে নটুরে পিয়ারে, তালভঙ্গ না হোয়!

অম্বুজনাথ আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন—মানে কী হে?

পঞ্চানন উত্তর দিলে—সারা জীবন নাচ-গান করেই ত কাটালাম, কিন্তু পেলাম কী? কিছুই না। এটা জেনেও নটী নটকে বলছে—তবু গেয়ে যাও নেচে যাও, তালভঙ্গ যেন না হয়!

সতীশের হাহাকার সেদিন আমাকেও স্পর্শ করেছিল! এবং, শুধু আমাকেই বা কেন? সুধীরবাবুর চোখে সেদিন দেখেছিলাম—জল।

ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের ঘরের দিকে যাচ্ছি, দেখি, একটা ঘরের বারান্দায় মাদুর পেতে সুধীরবাবু আছেন বসে। আমাকে কাছে ডাকলেন। বললেন—সব শিল্পীর জীবনের ট্রাজেডীই এই। মানুষ আজ যাকে নিচ্ছে, কাল তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে ছিন্ন বস্ত্রের মতো! উঃ! কী ভয়ঙ্কর অবস্থা একবার ভেবে দেখুন দেখি। আর দেরী নেই, আমি দেখতে পাচ্ছি, আমারও সেদিন এসে পড়ল বলে। খেতে না পেয়ে পথে পথে ঘুরবো, ভিক্ষে করবো, শেষে ভিক্ষেও মিলবে না, পথের ধারে মরে পড়ে থাকবো! বলতে বলতে হাত দুটি চাপা দিলেন চোখের ওপরে। যেন কোনো এক কঠিন নাট্য মুহূর্তকে মূর্ত করে তুলতে চাইছেন সুধীরবাবু! তারপরে চোখ থেকে হাত সরিয়ে বলতে লাগলেন—থিয়েটার করেছি, সিনেমা করেছি, এবার এসেছি যাত্রায়। এখান থেকে যেদিন প্রস্থান করবো, সেদিন? বসে বসেই শুনছিলাম ওঁর কথা। আর কেউ ছিল না সেখানে, শুধু আমি আর সুধীরবাবু। না-না ভুল বললাম। আরও একজন ছিল, একটু আড়াল খুঁজে নিয়ে, দাঁড়িয়ে। যে-ঘরের সামনে বসে আমরা কথা বলছি, তারই কবাটের আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। কতক্ষণ ধ'রে যে ছিল, তা আমরা কেউই লক্ষ্য করি নি। চোখে পড়ল আমারই প্রথম, সুধীরবাবু দেখেন নি। শীলার সমবয়সী হবে তবে ঈষৎ স্থূলাঙ্গিনী, সাধারণভাবে থান পরে থাকে, নাম—মালতী। অন্যমনস্কের মতো একবারের জন্য তাকে দেখেছিলাম মাত্র, কিন্তু সে যে কবাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমাদেরই কথা

শুনছে আগ্রহ ভরে, এ-কথা ঠিক বুঝতে পারি নি, এবং বুঝবার মতো মনের অবস্থাও ছিল না।

যাইহোক, সুধীরবাবুর এসব দিকে লক্ষ্য ছিল না। এক মনে কী যেন ভাবছিলেন তিনি। আমি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে উঠলাম, সত্যিকার শিল্পীদের যা' মৌলিক অবদান, মহাকালের পৃষ্ঠায় কি তার কোনো স্বাক্ষরই থাকবে না, আপনি বলতে চান?

একটু অবাক হয়েই বোধ হয় তাকালেন আমার দিকে। দলের ম্যানেজার, ছুটোছুটি আর হিসাব নিয়েই আমার কারবার, মানুষের জীবন সম্বন্ধে আমারও যে কৌতূহল জাগতে পারে, এটা বোধ হয় তখন তিনি ভাবতেই পারেননি। যে ঘরগুলিতে আমাদের ওখানে থাকতে দিয়েছিল, তার সামনে বারান্দা, তার ওপর মাদুর বিছিয়ে বসে আমরা গল্প করছিলাম। উনি আমার দিকে আরও একটু সরে বসলেন, একটু বিস্মিত ভঙ্গিমাতেই বলে উঠলেন—কী করে থাকবে? 'দেহপট সনে নট সকলি হারায়', এটা কি শোনেন নি?

—শুনেছি—ব'লে, একটু থামলাম। কিছুক্ষণ থেমে থেকে ওঁর জিজ্ঞাসু চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে, তারপরে বললাম,—কিন্তু কিছু থেকে যায় লেখকদের লেখায়। ওদেশের কৃতী অভিনেতাদের সম্বন্ধে ত বহু বই আছে শুনেছি। এদেশেরও কিছু কিছু আছে, নেই এমন নয়। তবে আরও লেখার দরকার। দেখবেন, যদি কিছু দান থাকে আপনার, ত, তার বিবরণ ঠিক রয়ে যা'বে কোনো লেখকের রচনায়। দেহ থাকবে না, কারই বা থাকে? কিন্তু কীর্তির পরিচয় হারাবে না, যদি তা যথার্থ কীর্তি হয়।

অত্যন্ত অভিনিবেশ-সহকারেই সুধীরবাবু শুনছিলেন আমার কথা। হঠাৎ কী হলো ওঁর মধ্যে কে জানে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন—আমাদের কথা লিখবে, এমন লেখক কোথায়!

স্তব্ধ হয়ে গেছে চারিদিক। দূরে কোথায়, কী দেখে রাস্তার কুকুরগুলো বুঝি চীৎকার করে মরছে। চুপ করে রয়েছেন সুধীরবাবু। ওঁর হাতের জ্বলন্ত সিগারেট-টা কখন শেষ হয়ে গেছে খেয়াল ছিল না, হঠাৎ আঙুলে উত্তাপ লাগতেই সেটা ফেলে দিলেন। আমি ওঁর অলক্ষ্যে কবাটের দিকে তাকালাম একবার। প্রথমে মনে হলো, অন্তরালবর্তিনী ওখানে নেই, কিন্তু, আরও একটু ভালো করে তাকাতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, কবাটের আড়ালে বসে পড়েছে সে। সাদা থান পরা দুটি পায়ের আভাস দেখতে পাচ্ছি।

দেখতে-দেখতে হঠাৎ এতক্ষণ পরে মনে হলো, মেয়েদের ঘরের সামনের দাওয়াতেই কি আমরা বসে বসে কথা বলছি? তাই হবে। সতীশ দেবনাথের ব্যাপার নিয়ে আমরা এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম যে, সেদিকে আর কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না আমাদের। তারপরে, আরও একটা কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল সতীশকে নিয়ে যখন আমরা ব্যস্ত ছিলাম, মেয়েরাও সব বেরিয়ে এসেছিল বটে, তার মধ্যে ঐ থানপরা মেয়েটি এসে মাদুর হাতে করে পেতে দিয়েছিল দাওয়ার ওপরে। এটা খানিকটা দূর থেকেই আমার লক্ষ্যে পড়েছিল।

সুধীরবাবু সোজা হয়ে বসলেন এই সময়। গম্ভীর গলায় ধীরে ধীরে বললেন—ছিল একজন লেখক, জানেন যদুবাবু? ছেলেমানুষ, গানটান রচনা করত, আমার কথায় আমাকে একখানা নাটক লিখে দিয়েছিল। প্লে-ও করেছিলাম সে'নাটক। সেই আমার তরুণ লেখক-বন্ধু বলেছিল, আমার জীবন-কাহিনী সে লিখে যাবে। তা' পারল না। পাগল ছিল, সাহিত্য নিয়ে উন্মত্ত থাকত সবসময়, জীবনের নিদারুণ বাস্তবতার দিক সে ভাবেনি। কী বলব যদুবাবু, যখন ধরা পড়ল, তখন দুটো ফুসফুসই তার গেছে। টি-বি। টি-বিতেই সে গেল শেষ পর্যন্ত।

—কী নাম?

—কী করবেন শুনে নাম? এ'রকম কতো ফুল আলক্ষ্যে ঝরে যায়, তার খবর আমরা রাখি ক'টুকু? শুনেছিলাম, সংসারে তার বোন ছিল একমাত্র, আর কেউ ছিল না। জানি না, কী হয়েছে সে বোনের। সে যখন হাসপাতালে চেষ্টা ক'রেও ঠাঁই না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তার সেই বোনের কাছেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলে, তখন আমি বাইরে, থিয়েটারের হয়ে অভিনয় করতে গেছি, আর বোতলের পর বোতল—সুরাপান ক'রে চলেছি।

—কেন?

সুধীরবাবু একটুক্ষণ থেমে থেকে, তারপর একটু হেসে বললেন—শুনবেন সে কাহিনী? সেই আমার তরুণ লেখক বন্ধু ছাড়া আর কেউ জানত না। সাধারণ মানুষই আমি। যেমন দশটা-পাঁচটা অফিস করে বাড়ী ফেরে সাধারণ বাঙালী, আমিও ছিলাম তাই। চাকরী করতাম অফিসে, কেরাণীর কাজ। বড়বাবুর হুকুম আর লেজার-রাখার কাজ ছাড়া দুনিয়ায় যে আর কিছু আছে জানতাম না। আর দুনিয়া বলতে, আমার বাড়ী। ছেলেপিলে হয়নি, ঘরে তরুণী স্ত্রী। অতি সুন্দরী। মুখখানি ঢলঢলে শুধু নয়, মমতা মাখা। বড়ো-

বড়ো দুটি চোখ মেলে যখন তাকাতো, তখন আমি সব ভুলে যেতাম। ভাবতেই পারতাম না যে, সেই চোখে কখনো পাপ থাকতে পারে, অবিশ্বাস লুকিয়ে থাকতে পারে। আমারই এক বন্ধু। ধরুন, তার নাম সুবিমল। পদবীটা না-ই বা বললাম। সে আজও বেঁচে, উত্তর বঙ্গের এক মফস্বল শহরের গণ্যমাণ্য ব্যবসায়ী সে। সুবিমলের কথা বলার ধরণটা ছিল ভালো। গল্প করছে, সারা অঙ্গ দিয়ে গল্পের ভাব সে ফুটিয়ে তুলত। শুধু আমার স্ত্রী কেন, আমি পর্যন্ত মোহিত হয়ে যেতাম। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় সে আসত। না এলে আমার স্ত্রী আর আমি দুজনেই অস্থির হয়ে উঠতাম মনে মনে। স্ত্রী বলতো —কেমন সুন্দর কথা বলেন সুবিমলবাবু, তুমি পারো না?

সত্যিই পারতাম না যদুবাবু,—সুধীরবাবু বললেন—কেমন যেন লাজুক আর মুখচোরা ছিলাম। কিন্তু সেই আমি যে একদিন মঞ্চে এসে একমাত্র কথাকেই অবলম্বন করে দাঁড়াব, এ কী কখনো ভাবতে পেরেছিলাম?

একটুক্ষণ থেমে থেকে আবার শুরু করলেন সুধীরবাবু, বললেন—অবিশ্বাস্য এক ঘটনার সম্মুখীন হলাম একদিন। অফিস থেকে ফিরে এসে দেখি, বুড়ী ঝি-টি বাড়ী পাহারা দিচ্ছে, আর কেউ নেই। টেবিলে পড়ে আছে স্ত্রীর চিঠি—সুবিমলকে ভালবাসি। ওরই সঙ্গে চললাম। দুঃখ ক'রো না।

আবার একটু থামলেন সুধীরবাবু, তারপরে বললেন—দুঃখ করার অনুভূতিটা পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। সারা মন প্রাণ কেমন যেন জড়ে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত জীবন-প্রবাহ হঠাৎ যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। খবরটা জানাজানি হতে দেরী হয়নি। ফলে, হঠাৎ আমি প্রচুর হিতৈষী লাভ করেছিলাম। কেউ বললে—পুলিশে খবর দাও। কেউ বললে—সুবিমলকে খুঁজে বার করো। আচ্ছা ঘা-কতক দিয়ে, বউকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। কেউ বললে—আরেকটা বিয়ে করো।

কিন্তু, কিছুই আমি করলাম না,—সুধীরবাবু বলতে লাগলেন—একে একে ভগ্নমনোরথ হয়ে ফিরে গেল হিতৈষীরা। আমি বসে বসে, শুধু নিজের মনে এই প্রশ্ন নিয়ে তোলপাড় করছি,—কেন গেল—কী পেলো সে সুবিমলের মধ্যে? ক্রমাগত, জানেন যদুবাবু, ক্রমাগত এই প্রশ্ন নিয়ে জীবনের পথে চলতে চলতে কতো প্রহর কতো মাস কাটিয়ে দেবার পর হঠাৎ আমি লক্ষ্য করলাম, আমি সুবিমলের মতো গুছিয়ে কথা বলতে শিখে গেছি! অফিস-ক্লাবের এক নাটকের নায়ক সেজে মঞ্চে অভিনয় করে মেডেল পর্যন্ত পেয়ে গেলাম। লোকে বললে—প্রতিভা। তারপরে আঁকড়ে ধরলাম এই

'প্রতিভা'কেই। এক আকস্মিক যোগাযোগের ফলে আমি হঠাৎ একদিন সাধারণ রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়ালাম। সেই যে দাঁড়িয়েছি, আর সরি নি। সিনেমা আর থিয়েটারই হয়ে দাঁড়াল আমার উপজীবিকা। দেখতে দেখতে এক এক করে কেটে গেল দশটি বছর। আমি তখন নামকরা অভিনেতা। যখন সুরা পান আর অভিনয় করা পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ছিল, সেই তখনকার লোক আমি, তখনকার কথাই বলছি। তরুণ লেখক বন্ধু গান লেখে, তাকে একদিন বললাম—নাটক লিখে দিতে পারো? স্বামী ত্যাগিনী এক মেয়ে পরপুরুষের হাত ধ'রে উধাও হয়ে গিয়ে পায়ে বেঁধেছে নটীর নূপুর। আর সেই শোকগ্রস্ত—ব্যাথাতুর স্বামী পাগলের মতো ঘুরে বেড়ায় স্ত্রীর খোঁজে। কখনো সাজে ফকির, কখনো সন্ন্যাসী, কখনো ভিখারি দোরে-দোরে ভিক্ষার ছলে ঘুরে ঘুরে দেখে, কোথায় আছে তার হারানো প্রতিমা! বছরের পর বছর গেল, অবশেষে পেলো সে তার সন্ধান একদিন নৃত্যপরায়ণা নটী নৃত্যশেষে অতিথিদের বিদায় দিয়ে শ্রান্ত হয়ে সে তার পায়ের নূপুর খুলতে যাচ্ছে, এমন সময় লুকিয়ে তার ঘরে প্রবেশ করলে আততায়ীর মতো একটি লোক। কালো আলখাল্লা ঢাকা তার মূর্তি আমার সেই তরুণ লেখক-বন্ধু বসন্ত সেনকে বলেছিলাম, শেষটা তুমি কী করবে ভাবো। লোকটি বিশ্বাসঘাতিনীকে প্রাণে মারবে, না—

আমরা দুজনে বসে বসে কথা বলছি বারান্দায় মাদুরের উপর বসে, এমন সময় হঠাৎ কবাটের আড়াল থেকে একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেজে উঠল—উঃ! মাগো!

চকিত হয়ে উঠলেন সুধীরবাবু, বললেন—কে?

সাড়া নেই। আমি বলে উঠলাম—কে ওখানে? মালতী

এবারেও সাড়া নেই। সুধীরবাবু একটু অবাক হয়ে আমাকে প্রশ্ন করলেন—মালতী ওখানে ছিল নাকি?

—হ্যাঁ।

—কী করে জানলেন?

—দেখেছিলাম।

—ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে নাকি?

আমার লক্ষ্য তখন কবাটের দিকে। কিন্তু ভিতর থেকে কবাট দুটো বন্ধ করে কে যেন এতক্ষণে তার খিলটাও তুলে দিল। গিয়ে বলব নাকি—বন্ধ করলে যে দরজা? মাদুরটা ওঠাবে কে? ওটা কি এভাবে পড়ে

থাকবে নাকি? আমরা ত এখুনি চলে যাবো আমাদের ঘরের দিকে, যে-যার বিছানায়।

কিন্তু, চুপ করে রইলাম। বলা আর হলো না। বললাম শুধু সুধীর বাবুকে—চেনেন নাকি মালতীকে?

সুধীরবাবু বললেন—একসঙ্গে অভিনয় করছি, চিনব না? তবে, চিনেছি এইখানে এসে। তার আগে ওকে চেনা ত দূরের কথা, ওকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। অথচ, লক্ষ্য করেছি, অলক্ষ্যে থেকে আমার কথা শোনবার, আমার কথা জানবার আগ্রহটা ওর নিদারুণ। কিন্তু আপনি শুনুন যদুবাবু, যা বলছিলাম।

বলে, আবার শুরু করলেন সুধীরবাবু,—বসন্ত লিখেছিল। শেষটায় করলে কী, লিখলে—লুকানো অস্ত্র বার করে ওর দিকে এগিয়ে এসেছে সেই লোকটি, কিন্তু, সেই আশ্চর্য সরল দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে তার কাজ সে করতে পারল না। অস্ত্র প'ড়ে গেল হাত থেকে। হারানো স্ত্রীর নাম ধ'রে ডেকে উঠে দুটি বাহু প্রসারিত করে দাঁড়াল। মেয়েটি চিনতে পেরে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার বুকে, বললে—মুক্তি দাও। আমাকে নিয়ে চলো এখান থেকে। কতো তর্ক করেছি, বলেছি, বিপথগামিনী মেয়েকে সংসারের মধ্যে ফিরিয়ে এনো না, দর্শক হয়ত সহ্য করবে না। কিন্তু সে শোনে নি, বলেছে—বদলে গেছে দিন। দর্শক নেবে। আর তাছাড়া, মানুষের আদর্শ থেকে মানুষ নিজে অনেক বড়ো। এক-এক সময় নিজেকেও অতিক্রম করে যায় সে। সেই আশ্চর্য মানবিক মুহূর্তগুলিকে উজ্জ্বল করে তোলাই আমার কাজ, কারণ, আমি [illegible]।

কতো বড়ো বিশ্বাস তার দেখুন।—সুধীরবাবু বলতে লাগলেন—এই নাটকের অভিনয় করতে গিয়েছিলাম উত্তর বঙ্গের এক শহরে। সুধীর আমার শিল্পী জীবনের নাম, আসল নাম নয়। সে নাম কাউকে বলি না, শিল্পী সুধীর-এর মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে সেই পুরানো নাম। কিন্তু, যে আমাকে থিয়েটারের বিচিত্র পোশাক আর মেক-আপের মধ্য দিয়ে দেখলে কিছুতেই চিনতে পারবে না, তাকে আমার চিনতে কোনো বাধা নেই। দেখলাম সুপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী—সুবিমলকে। সে-ই ছিল স্থানীয় উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রধান।

সুধীরবাবু একটু থামলেন। আমার তখন আর কৌতূহলের অন্ত নেই, বললাম—তারপর?

প্রতিভা'কেই। এক আকস্মিক যোগাযোগের ফলে আমি হঠাৎ একদিন সাধারণ রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়ালাম। সেই যে দাঁড়িয়েছি, আর সরি নি। সিনেমা আর থিয়েটারই হয়ে দাঁড়াল আমার উপজীবিকা। দেখতে দেখতে এক এক করে কেটে গেল দশটি বছর। আমি তখন নামকরা অভিনেতা। যখন সুরা পান আর অভিনয় করা পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ছিল, সেই তখনকার লোক আমি, তখনকার কথাই বলছি। তরুণ লেখক-বন্ধু গান লেখে, তাকে একদিন বললাম—নাটক লেখে দিতে পারো? স্বামী ত্যাগিনী এক মেয়ে পরপুরুষের হাত ধ'রে উধাও হয়ে গিয়ে পায়ে বেঁধেছে নটীর নূপুর। আর সেই শোকগ্রস্ত—ব্যাথাতুর স্বামী পাগলের মতো ঘুরে বেড়ায় স্ত্রীর খোঁজে। কখনো সাজে ফকির, কখনো সন্ন্যাসী, কখনো ভিখারি। দোরে-দোরে ভিক্ষার ছলে ঘুরে ঘুরে দেখে, কোথায় আছে তার হারানো প্রতিমা! বছরের পর বছর গেল, অবশেষে পেলো সে তার সন্ধান একদিন নৃত্যপরায়ণা নটী নৃত্যশেষে অতিথিদের বিদায় দিয়ে শ্রান্ত হয়ে বসে তার পায়ের নূপুর খুলতে যাচ্ছে, এমন সময় লুকিয়ে তার ঘরে প্রবেশ করলে আততায়ীর মতো একটি লোক। কালো আলখাল্লা ঢাকা তার মূর্তি। আমার সেই তরুণ লেখক-বন্ধু বসন্ত সেনকে বলেছিলাম, শেষটা তুমি কী করবে ভাবো। লোকটি বিশ্বাসঘাতিনীকে প্রাণে মারবে, না—

আমরা দুজনে বসে বসে কথা বলছি বারান্দায় মাদুরের ওপর বসে, এমন সময় হঠাৎ কবাটের আড়াল থেকে একটা অস্ফুট আর্তনাদ জেগে উঠল—উঃ! মাগো!

চকিত হয়ে উঠলেন সুধীরবাবু, বললেন—কে?

সাড়া নেই। আমি বলে উঠলাম—কে ওখানে? মালতী?

এবারেও সাড়া নেই। সুধীরবাবু একটু অবাক হয়ে আমাকে প্রশ্ন করলেন—মালতী ওখানে ছিল নাকি?

—হ্যাঁ।

—কী করে জানলেন?

—দেখেছিলাম।

—ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে নাকি?

আমার লক্ষ্য তখন কবাটের দিকে। কিন্তু ভিতর থেকে কবাট দুটো বন্ধ করে কে যেন এতক্ষণে তার খিলটাও তুলে দিল। গিয়ে বলব নাকি— বন্ধ করলে যে দরজা? মাদুরটা ওঠাবে কে? ওটা কি এভাবে পড়ে

থাকবে নাকি? আমরা ত এখুনি চলে যাবো আমাদের ঘরের দিকে, যে-যার বিছানায়।

কিন্তু, চুপ করে রইলাম। বলা আর হলো না। বললাম শুধু সুধীর বাবুকে—চেনেন নাকি মালতীকে?

সুধীরবাবু বললেন—একসঙ্গে অভিনয় করছি, চিনব না? তবে, চিনেছি এইখানে এসে। তার আগে ওকে চেনা ত দূরের কথা, ওকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। অথচ, লক্ষ্য করেছি, অলক্ষ্যে থেকে আমার কথা শোনবার, আমার কথা জানবার আগ্রহটা ওর নিদারুণ। কিন্তু আপনি শুনুন যদুবাবু, যা বলছিলাম।

বলে, আবার শুরু করলেন সুধীরবাবু,—বসন্ত লিখেছিল। শেষটায় করলে কী, লিখলে—লুকানো অস্ত্র বার করে ওর দিকে এগিয়ে এসেছে সেই লোকটি, কিন্তু, সেই আশ্চর্য সকরুণ দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে তার কাজ সে করতে পারলে না। অস্ত্র প'ড়ে গেল হাত থেকে। হারানো স্ত্রীর নাম ধ'রে ডেকে উঠে দুটি বাহু প্রসারিত করে দাঁড়াল। মেয়েটি চিনতে পেরে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বামীর বুকে, বললে—মুক্তি দাও। আমাকে নিয়ে চলো এখান থেকে। কতো তর্ক করেছি, বলেছি, বিপথগামিনী মেয়েকে সংসারের মধ্যে ফিরিয়ে এনো না, দর্শক হয়ত সহ্য করবে না। কিন্তু সে শোনে নি, বলেছে—বদলে গেছে দিন। দর্শক নেবে। আর তাছাড়া, মানুষের আদর্শ থেকে মানুষ নিজে অনেক বড়ো। এক-এক সময় নিজেকেও অতিক্রম করে যায় সে। সেই আশ্চর্য মানবিক মুহূর্তগুলিকে উজ্জ্বল করে তোলাই আমার কাজ, কারণ, আমি কবি।

কতো বড়ো বিশ্বাস তার দেখুন।—সুধীরবাবু বলতে লাগলেন—এই নাটকের অভিনয় করতে গিয়েছিলাম উত্তর বঙ্গের এক শহরে। সুধীর আমার শিল্পী জীবনের নাম, আসল নাম নয়। সে নাম কাউকে বলি না, শিল্পী সুধীর-এর মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে সেই পুরানো নাম। কিন্তু, যে আমাকে থিয়েটারের বিচিত্র পোসাক আর মেক-আপের মধ্য দিয়ে দেখলে কিছুতেই চিনতে পারবে না, তাকে আমার চিনতে কোনো বাধা নেই। দেখলাম সুপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী—সুবিমলকে। সে-ই ছিল স্থানীয় উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রধান।

সুধীরবাবু একটু থামলেন। আমার তখন আর কৌতূহলের অন্ত নেই, বললাম—তারপর?

—তারপর ?

সুধীরবাবু বলতে লাগলেন—মনে হতে লাগল, একজনের ঘর ভেঙে দেওয়া যায় না ? দাউ দাউ ক'রে জ্বালিয়ে দেওয়া যায় না একজনের সুখের সংসার ! ও যে সুখে আছে, ওর চেহারা দেখলেই তা বোঝা যায়। দ্বিতীয় দিন শো আরম্ভ হবে; মেকআপ নিয়ে সাজঘর থেকে বেরিয়েছি, ম্যানেজার বললে—সুবিমলবাবু এসেছেন। সস্ত্রীক।

সুবিমলের পাশে দেখলাম তাকে দীর্ঘ দশ বৎসর পরে। চেহারা অনেকটা পাত্‌লা হয়ে গেছে, কেমন যেন একটা অবসন্নতার ছাপ পড়েছে মুখের ওপর। তবু, সেই অদ্ভুৎ, আশ্চর্য দুটি চোখের দৃষ্টি ! সব ভুলে অপলক দৃষ্টিতে সম্মোহিতের মতো না তাকিয়ে বুঝি উপায় নেই ! কিন্তু, ও-কী চিনতে পেরেছে আমাকে ? এই আবক্ষ শ্মশ্রু, বিচিত্র পোষাক, এর মধ্য দিয়ে ওর কাছে প্রকাশিত হয়েছে কি আমার সত্যিকাবের রূপ ? মনে হলো, একবাব বুঝি চমকে উঠল, একবাব বুঝি কেঁপে উঠল ওর সর্বশরীর ! তার পরেই নিদারুণ মানসিক শক্তি দিয়ে ও জয় কবল নিজেকে। সুবিমলের কাঁধে আস্তে হাতখানা রেখে বলে উঠল মৃদুকণ্ঠে—চলো।

আর ভ্রমেও তাকাল না আমার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল বাইরে। শুনলাম মাথা ধরেছে, এই অজুহাতে অভিনয় পর্যন্ত দেখতে রাজী হয়নি। শেষে, সুবিমলের অনেক পীড়াপীড়িতে, দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে এসে বসেছে দর্শকের আসনে। এ-ও শুনলাম, দুটি সন্তান এসেছে ওর কোলে, বড়টি মেয়ে—বয়েস বছর আষ্টেক। ছোটটি ছেলে—ছয় বছর বয়সে। শুনে মনে একটা অদ্ভুত বিষণ্ণ সুর উঠল জেগে। আমার ঘরে যখন ছিল, সন্তানের প্রতি ছিল বিভীষিকা। বলত—সন্তান চাই না, শুধু চাই তোমাকে।

বুঝতেই ত পারছেন যদুবাবু—সুধীরবাবু বললেন—বৈজ্ঞানিক যুগ, উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনেব ক্ষেত্রে আমাব দিক থেকে কোনই ত্রুটি ছিল না। সেই আমার অতি আদরেব প্রিয়া, আজ অন্য পুরুষের সন্তানের জননী ! দুরন্ত অভিমান হলো, রাগ হলো, আবাব করুণাও হলো। দর্শকের আসনে ওরা বসে আছে দুজনে, ছেলেমেয়ে সঙ্গে করে আনেনি অবশ্য। মঞ্চ থেকে দেখতে পাচ্ছি ওদের। দেখতে দেখতে যখন এসে পৌছলাম শেষ দৃশ্যে, তখন আমার মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কিসের আবেগের বশে জানি না, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, কঠিন এক অভিনয়ের লীলা করতে হবে। আর কাউকে কিছু বললাম না, শুধু সাহায্য নিলাম বসন্তের। ও না থাকলে,

অভিনয় সর্বাঙ্গ সুন্দর হবে কেমন করে ? শেষ দৃশ্যে, আততায়ীর বেশে প্রবেশ করেছি পিস্তল হাতে নিয়ে। কথা ছিল শেষ মুহূর্তে পিস্তল ফেলে দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরব দু হাতে। বহু রজনী তাই করেছি। নাটকেও তাই আছে। কিন্তু, সেদিন আমি করলাম কী, দুটি হাত প্রসারিত করেও সরে দাঁড়ালাম, মেয়েটি ছুটে এসে আমার বক্ষে আশ্রয় পেলো না। আমি নিজের বুকে পিস্তল রেখে, ট্রিগার টিপে দিলাম। প্রচণ্ড শব্দ হলো। পড়ে গেলাম আমি। সুকৌশলে রক্তধারাকে প্রবাহিত করে দিয়েছি বক্ষস্থলে। যবনিকা পড়ে গেল। কিন্তু বসন্তের আর্তচীৎকারে সবাই এলো ছুটে। এমন একটা পরিস্থিতি করে তুললে। বসন্ত, যে, আমি যেন সত্যিসত্যিই আত্মহত্যা করেছি, ডামির বদলে লুকোন কোন সত্যিকারের পিস্তল হাতে নিয়ে। যা মনে মনে ভাবছিলাম, তা-ই হলো। ছুটে এলো সুবিমল, আর এলো—সে। আমার মুখের নকল দাড়ি গোঁফ ততক্ষণে অপসারিত করে ফেলেছে বসন্ত। সুবিমল চিনতে পেরে 'বন্ধু' বলে ঝুঁকে পড়ল আমার মুখের ওপর। আমি ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলে উঠলাম—সুবিমল। আমি যাই।

সে বললে—ক্ষমা করে যাও।

সুধীরবাবু বলতে লাগলেন—শেষ পর্যন্ত, নিজেকে আর কিছুতেই ধরে রাখতে পারে নি সে। আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর্তচীৎকার করে উঠল— স্বামী !

আপনাকে বলব কী যদুবাবু, আমার সারাটা বুকের দাহ যেন এক মুহূর্তে শান্ত হয়ে গেল।—সুধীরবাবু বলতে লাগলেন—আমার সমস্ত কিছু গোলমাল হয়ে গেল মুহূর্তে। ভেবেছিলাম-ওকে টেনে নেবো নিজের কাছে। ছিনিয়ে নেবো আমার আপন মানুষটিকে সুবিমলের হাত থেকে। কিন্তু, সে সব কিছুই করা হলো না। মনে হলো, আমি ছন্নছাড়া মঞ্চ"ায়ী এক অভিনেতা, আমার সঙ্গে ওর শান্তিময় জীবনকে আর জড়াই কেন ? হঠাৎ সবাইকে সরিয়ে দিয়ে আমি সোজা উঠে দাঁড়ালাম। সুবিমলের মুখের দিকে, আর তার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে হো-হো করে হেসে উঠলাম আমি, বললাম —প্রচণ্ড ভুল করেছেন আপনারা ! আমি অভিনেতা, আপনাদের সামনে অভিনয় ক্ষমতার এক নিদর্শন দেখিয়ে গেলাম শুধু। নমস্কার। বলে প্রায় সেই অবস্থাতেই অর্থাৎ সাজঘরে গিয়ে কোনক্রমে পোষাক আশাক বদলেই চলে আসি কলকাতা। ম্যানেজার কতো অনুনয় বিনয় করেছিল, আমি কোন কথা শুনিনি।

—তারপর ?

সুধীরবাবু বললেন—তারপর, দেখতেই ত পাচ্ছেন। আছি, অভিনয় করে চলেছি। কথা বলা মোটামুটি ভালই শিখেছি, কী বলেন ? মাঝে মাঝে মনটা অবশ্য উদাস হয়ে যায়। সুবিমলের স্ত্রীর কথাটা যে খুব মনে পড়ে তা নয়, যার কথা স্মরণে এলে বুকের ভিতরটা কেমন যেন মুচড়ে উঠতে থাকে, সে হচ্ছে আমার লেখক বন্ধু বসন্ত সেন। তার ব্যক্তিগত জীবনের কথা খুব কমই জানি। কিন্তু, সে আমাকে জানত, আমাকে সত্যিই ভালবেসেছিল।

বলে, সুধীরবাবু চুপ করে বসে রইলেন বহুক্ষণ। আমি যেন এক আশ্চর্য অবচ্ছন্নতার মধ্যে ডুবে গেছি। যখন চমক ভাঙল, তখন অনেক রাত। সুধীরবাবু বললেন—উঠুন ম্যানেজারবাবু, এবার গিয়ে শুয়ে পড়া যাক।

আমি, অজিত আর সুধীরবাবু পেয়েছিলাম একটি ঘর। সেই ঘরের দিকে যেতে গিয়ে, প্রথমেই পড়ল বড়বাবু-ছোটবাবুর ঘর। বড়বাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু ছোটবাবু দেখলাম তখনো শুয়ে পড়েননি, চুপ চাপ বসে আছেন বারান্দায়।

আমরা কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেই, বললেন—কী, ভাঙল আপনাদের আসর ?

—আপনি ঘুমোন নি ?

—না। আসছে না ঘুম। অজিতের খোঁজ করলাম, দেখি ও ঘুমে অচেতন। একবার মনে হল আপনাদের গল্পের আসরে গিয়ে যোগ দেই। তারপরে ভাবলাম,-থাক। তার চেয়ে চুপ করে বসে আত্মদর্শনই করা যাক্।

সুধীরবাবু একটু হাই তুলে দুটি হাত প্রসারিত করে আবার সংকুচিত করে আনলেন, বললেন—আপনারা দর্শন-তত্ত্ব নিয়ে মাতুন, আমি ঘুমোতে গিয়ে।

বলেই আর দাঁড়লেন না, হনহন করে চলে গেলেন ঘরের দিকে। আমি পা বাড়িয়েও যেতে পারলাম না, নিছক ভদ্রতা, না, অদম্য কৌতূহল—কী আমাকে আটকে রাখল ছোটবাবুর কাছে ?

উঠে দাঁড়ালেম ছোটবাবু, কাছে এলেন, তারপরে ধীর, অথচ চাপা গলায় বললেন—যাত্রার দল আপনার কেমন লাগছে ম্যানেজারবাবু ?

—ভালোই।

আমার উত্তর শুনে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু বোধ হয় হাসলেন ছোটবাবু, বললেন—সতীশবাবুর কথা ভাবতে ভাবতে আমার একটা ইংরাজী

উক্তি মনে পড়ে গেল। অভিনেতাদের বলা হয় Bundle of emotions! এরা যেটা প্রকাশ করে, বড়ো বেশী করে প্রকাশ করে, তাই না? রাগ হলে বড়ো বেশী রাগ করে। কাঁদলে, বড়ো বেশী কেঁদে ফেলে। হিংসা হলে সাংঘাতিক ভাবে তা প্রকাশ করে। ঘৃণা হলে, মর্মান্তিক ভাবে সে ঘৃণাকে প্রকট করে তোলে। আর ভালবাসলে, প্রচণ্ড ভাবে ভালবাসে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম—ভালবাসার প্রচণ্ড প্রকাশ কি আপনি কোথাও দেখতে পেয়েছেন দলে?

একটু যেন অপ্রতিভ হলেন উনি, বললেন—আপনি কথাটা ব্যক্তিগত হিসাবে ধরবেন না। আমি আত্মদর্শন কথাটা প্রথমেই ব্যবহার করেছি। আমি ভাবছি কী জানেন? আমি নিজে যাত্রা করি না বটে, তবু আমি দলের লোক ত বটে? আমিও যেন ধীরে ধীরে ওদের মতো হয়ে যাচ্ছি। ঐ Bundle of emotions! নইলে, সতীশবাবু বর্ষিয়ান ব্যক্তি, ওঁর গায়ে আমি হাত ওঠাই কি করে? "মিড সামার নাইটস্ ড্রিম" এর কথাটা মনে আছে ত?

"The Lunatic, the lover and the poet
Are of imagination all compact"

তা কবির কথা এখানে থাক। পাগল,—"Sees more devils than vast hell can hold"

আর, প্রেমিক? "Sees Helen's beauty in a brow of Egypt!"

মনে মনে একটু না চমকে পারিনি ওঁর কথায়। যতই 'আত্মদর্শন' কথাটা উনি ব্যবহার করুন না কেন, মনে হলো—"হেলেন্‌স্ বিউটি অন্ এ ব্রাউ অফ ইজিপ্ট" কথাটা দিয়ে উনি বিশেষ একটা ইঙ্গিত করতে চাইছেন। ইঙ্গিতটা কি সুধীরবাবুকে নিয়ে? না, অজিতকে নিয়ে? না আমাকে নিয়ে?

স্তব্ধ হয়ে গিয়ে কী যেন আপন মনে ভেবে চলেছেন বিপ্লববাবু, এক সময় মৃদু কণ্ঠে বলে উঠলেন—একটু বসুন না যদুবাবু।

আরও একটু অবাক হলাম। 'যদুবাবু' বলে কখনো ডাকেন না উনি, আজ ওঁর হলো কী? ধীরে ধীরে ওর পাশে বসে পড়লাম। বললেন—রাত কীরকম নিশুতি হয়ে গেছে, তাই না? ঐ যে গাছের পাতাটি ঝরে পড়ল, তারও যেন শব্দ শোনা যায়!

বলে, আবার একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপরে একসময় আচমকা বলে উঠলেন—ঘুম পাচ্ছে আপনার?

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—না-না-আপনি বলুন না?

বিপ্রববাবু বলতে লাগলেন—এ'এক নতুন ধরণের যাত্রার দল আমি তৈরী করতে গিয়েছিলাম যদুবাবু, আমাদের সঙ্গে কারুরই মিলবে না। আমাদের একটা 'মেসেজ' থাকবে—বলিষ্ঠ একটা বক্তব্য! কিন্তু তা হ'ল না। এক একবার ভাবি, ভুল পথে এসেছি, এ'দল ভেঙে নতুন দল গড়ব, পুরানো সব ছেঁটে ফেলে একেবারে নতুনদের নিয়ে। কিন্তু, এক জায়গায় এসে হেরে যাচ্ছি। আমার বাবা। উনি ঐতিহ্যাশ্রয়ী লোক, যতটা করেছি, তার বেশী করলে, বুকে ওঁর শেল বিঁধবে।

উনি থেমে গেলেন। উত্তরে চুপচাপ থাকাটা ত শোভন হবে না, তাই বললাম—এ'দল নিয়েই আপনি ক্রমশঃ মনের মতো কাজ করতে পারবেন।

কী হল ওঁর মধ্যে কে জানে, তাড়াতাড়ি, চাপা গলায় বলে উঠলেন—পারব, কিন্তু একটা সমস্যার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি যদুবাবু।

প্রশ্ন আমাকে করতে হলো না, উনিই বলতে শুরু করলেন,—কথাটা আপনি জানেন, এমন কি আমার বাবাও জানেন, আপনাদের দুজনের মধ্যে আলোচনা পর্যন্ত হয়েছে বলে শুনেছি। বুঝতে পারছেন—কার কথা বলছি? বীণা।

ওঁর মুখে 'বীণা'র কথাটা যে এভাবে শুনব ভাবতে পারিনি, তাই আমারই যেন কেমন লজ্জা করতে লাগল। বললাম,—থাক না, ব্যক্তিগত কথা নাই বা তুললেন।

বলে উঠলেন—ব্যক্তিগত কথা একেবারেই তুলতে চাই না, তুলছি সমষ্টিগত কথা। মেয়েটি দল ছেড়ে দিতে চাইছে অবিলম্বে, আমার কথা হচ্ছে, কলকাতায় ফিরে যাই তারপর ছেড়ে দিক, কিন্তু এখন চলে গেলে, ক্ষতি হবে না?

—নিশ্চয়ই।

—সেটাই বোঝানো যাচ্ছে না।

বললাম—কিন্তু, ছাড়তেই বা চাইছে কেন?

ছোটবাবু বললেন—চিঠি লিখে জানিয়েছে আমাকে, মুখে কথা বলার ত অবকাশ নেই, তাছাড়া, আমি নিজেই সেটা ভালবাসি না। লিখেছে 'আপনাকে আমাকে নিয়ে যেসব কথা উঠেছে, তা শুনলে কাণে আঙুল দিতে হয়। আমার জন্য আপনি সম্মান হারাবেন এ'আমি চাই না।

আমায় বিদায় দিন।' জানেন যদুবাবু, কাজই ও চলে যেতে চাইছে। অথচ, এখনো লালগোলায় অতগুলি 'শো' পড়ে রয়েছে।

কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থেকে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে নেবার চেষ্টা করতে লাগলাম। তারপর একসময় বলে উঠলাম—নিজে ওকে ডেকে বলে দিন না।

ছোটবাবু বললেন—সেটা সম্ভব নয়। তবে চিঠিতে লিখেছি—চলে যেতে পারবে? কষ্ট হবে না? তার উত্তরে—একটু আগে—চাকরটার হাত দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে—কষ্ট হবে না, একথা বলি কী করে? কিন্তু এখানে থেকেও যে কষ্ট পাচ্ছি। চোখে ঘুম নেই, মনে শান্তি নেই, এ'আমার কী হলো, কাজই বা করব কেমন করে? আপনি আমাকে খুসী মনে কলকাতায় পাঠিয়ে দিন। আমি এ লাইন ছেড়ে দেবো। নবদ্বীপে আমার মা আছেন, আমি তার কাছে গিয়ে থাকব।

বলতে বলতে হঠাৎ ছোটবাবু আমার হাতখানা চেপে ধরলেন, বললেন, কাজটা আপনিই পারেন যদুবাবু। আপনিই পারেন ওকে বোঝাতে।

জিজ্ঞাসু নেত্রে ওঁর দিকে তাকিয়ে আছি লক্ষ্য করে উনি বলে উঠলেন, আমি জানি ও এখনো ঘুমোয়নি, রাত নিশুতি, আপনি ওকে ডাকুন গিয়ে। ডেকে—কথা বলুন একটু।

—বলছেন কী!

ছোটবাবু বললেন—আমি এইখানে বসে আছি। আপনি যান। আপনি ম্যানেজার মানুষ, আপনিই পারবেন।

অগত্যা গেলাম পায়ে পায়ে ওদের বন্ধ দরজার সামনে। আস্তে টোকা দিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর থেকে সাড়া এলো,—কে?

—আমি। ম্যানেজারবাবু।

দরজাটা খুলে গেল। ভিতরটা আড়াল করে কবাটটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে মালতী। ওকে দেখে একটু চমকেই উঠলাম বলা যায়, মালতী এখনো ঘুমোয় নি কেন? ওর আবার কী হলো?

মালতী বললে—কী ব্যাপার ম্যানেজারবাবু?

বললাম—কিছু না। শীলা কী করছে?

—ঘুমুচ্ছে।

—বীণা?

ভ্রু-ছুটি কুঞ্চিত হলো মালতীর, চাপা গলায় বললে—বীণাকে আবার এতরাত্রে আপনার কী দরকার পড়ল, শুনি ?

—আছে। ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি ?

মালতী মুখ ফিরিয়ে ঘরের একটা কোণের দিকে তাকিয়ে তেমনি চাপাস্বরেই বলে উঠল—আয়লো বীণা, ডাকছে।

বলেই—মালতী দরজা থেকে সরে গেল—বীণাকে স্থান ছেড়ে দিয়ে। কেমন যেন উত্তেজিত—আতঙ্কিত ওর ভাব।

—কী হয়েছে ম্যানেজারবাবু?—বলতে বলতে বীণা এগিয়ে এলো দরজার দিকে।

বললাম—বাইরে এসো, বলছি।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ও বাইরে এসে দাঁড়াল—বারান্দায়। বললাম—ছোটবাবু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

চট্ করে আমার কাছ থেকে একটু সরে গেল বীণা। বললাম—ভয় নেই। উনিই আমাকে পাঠাসেন তোমার কাছে।

রুদ্ধশ্বাসে বীণা প্রশ্ন করল—কেন!

বললাম—ছোটবাবু সব আমাকে বলেছেন। তুমি চলে যেতে চাইছ কেন?

চুপ করে রইল—মাথা নীচু করে। বললাম—এ রকম ছেলে মানুষী করে ?

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে তেমনিভাবে। একটু সন্দেহ হতেই কাছে সরে গিয়ে দেখি—দুটি চোখ দিয়ে ধারা নেমেছে! বললাম—একি, কাঁদছ ?

তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে চোখ দুটি আঁচলে মুছে নিতে লাগল। বললাম—কে কী তোমাকে বলেছে বলো দেখি ?

অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে বললে—কে আবার কী বলবে ? কিন্তু, উনি কী চান ? ছাড়তে চান না আমাকে ?

—তুমিই বা ছেড়ে যেতে চাইছ কেন ?

এতক্ষণে মুখ তুলে তাকাল মেয়েটি, বললে—ম্যানেজারবাবু, আমি ওঁর টাকা-কড়ি-সম্পত্তি কিছুই চাই না—ওঁকে আমি বাঁধতেও চাই না। বিশ্বাস করুন।

মনটা কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ বলে উঠলাম—তুমি ওঁকে খুব ভালবাসো, না, বীণা ?

বললে—শুনতে চাইছেন কেন? কী করতে পারবেন আপনি?

বললাম—দেখ, সত্যিই কিছু করার আমার নেই। তবে একটা কাজ করতে পারি এখুনি। আসবে আমার সঙ্গে? ওঁর কাছে নিয়ে যেতে পারি তোমাকে।

মুহূর্তে চোখদুটি যেন উজ্জল হয়ে উঠল মেয়েটির, কিন্তু পরক্ষণেই ম্লান দেখালো ওর মুখখানি, বললে—যদি কেউ টের পায়?

—কেউ পাবে না—সবাই ঘুমুচ্ছে।

—মেয়েরা? মালতীদি জেগে আছে যে?

—থাক্ না। ও'জানে—আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছ। সেটাই জানবে।

তবু সংকোচ ঘোচে না মেয়েটির, বললে—এমন ফুটফুটে জ্যোৎস্না, এখান থেকে ঠিক দেখতে পাবে।

বললাম—দেখতে পেলেও লোক চেনা যাবে না। ওরা ভাববে, তুমি আমারই সঙ্গে কথা বলছ। কলঙ্ক দেবে? দিক, আমাকেই ত দেবে শুধু?

—আর, আমাকে না?

ঈষৎ লঘুকণ্ঠে বললাম—না। যাত্রা-থিয়েটারে-ঠিক উল্টো। এখানে ছেলেদের কলঙ্ক যত বেশী হয়, মেয়েদের হয় না। কিন্তু আর কথা বাড়িও না, শীগ্‌গির এসো।

আমার পিছনে পিছনে সন্তর্পণে চলে এলো মেয়েটি। ছোটবাবুর কাছ পর্যন্ত এসে, ওকে পৌছে দিয়েই আমি চলে যেতে লাগলাম অন্তরালে। কিন্তু, অদ্ভুত মানুষেব কৌতূহল! এগিয়ে গিয়েও যেতে পারলাম না। ওদের কাছেই যে বেড়াটা, ঠিক তার ধারে—একটা গাছের ছায়ার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম চুপচাপ।

শুনলাম, ছোটবাবু বলছেন—এমন করে আসাটা ঠিক হয়নি।

মেয়েটি বললে—বিশ্বাস করুন, আমি আসতে চাইনি।

—এসেছ যখন শুনে রাখো, আমি তোমাকে ছাড়তে পারব না।

—কাজের ক্ষতি হবে বলে?

—না, আমার নিজের ক্ষতি হবে।

—কী ক্ষতি?

—বুঝবে না। এখন গিয়ে শুয়ে পড়ো।

—কাল তাহলে যাব না ?

—না।

—এইভাবে থাকব ?

—হ্যাঁ।

মেয়েটির কণ্ঠস্বর যেন কান্নামাখানো, বললে—পারে মানুষ ?

—মানুষ বলেই পারে।

এবার বুঝি সে কেঁদেই ফেলল—আমি পারব না।

ছোটবাবু বললেন—তাহলে, কলকাতায় ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। ফিরে, দল ছেড়ে দিও। বাসা করে তোমায় আলাদা রাখব। বিয়ে করব।

—তাই বুঝি চেয়েছি আমি ?

—কী চেয়েছ তবে ?

—চেয়েছি দূর থেকে পুজো করতে। মেয়েটি বললে—আপনার টাকা-কড়ি বাসাটাসা—কিছুই চাই না। ওরা সব ভুল কথা বলে। আপনি বিয়ে করবেন ভালো মেয়ে দেখে, সংসার করবেন, সুখী হবেন, এইটেই চাই।

ছোটবাবু বললেন—আমার চাওয়া ছিল ভিন্ন। আমি এক চারণ-দল গড়তে চেয়েছিলাম। তোমরা বলবে—যাত্রার দল, আমি বলব, চারণ-দল। এই দল দিয়ে আমি কী করতে চাই তা আমিই জানি। কিন্তু, তা হবে না।

—কেন ?

—সত্যি বলব ?

—বলুন।

ছোটবাবু বললেন—কী সে কী হয় জানি না—কী প্রেরণায় বাবার সঙ্গে এসে দল গড়তে লাগলাম জানি না—হঠাৎ দেখি—তুমি। তুমি আমার সব কিছুর প্রেরণা হয়ে দাঁড়ালে। তুমি দলে না থাকলে সে দল চালানো আমার পক্ষে অসম্ভব।

মেয়েটি বোধহয় কোনো উত্তর দিল না। ছোটবাবুও চুপ করে আছেন। চলে যাবো কি যাবো না ভাবছি, এমন সময় আবার শুনতে পেলাম ওদের কথা। ছোটবাবুই কথা বললেন প্রথমে—কাঁদছ ?

—ভয় করছে।

—কেন ?

মেয়েটি বললে—আমি একটা বাজে মেয়ে মানুষ, আমাকে ও-সব কথা শুনতে নেই।

—কেন ?

—দোহাই আপনার, আমাকে অতো বাড়িয়ে তুলবেন না আপনি। আমি আছি, তবে কলকাতায় ফিরে গিয়েই আমাকে কিন্তু ছেড়ে দেবেন—আমি মার কাছে চলে যাবো, নবদ্বীপে।

বলে, আর বোধ হয় দাঁড়ালো না বীণা, প্রায় ছুটেই চলে গেল তার নিজের ঘরের দিকে। কয়েক মুহূর্ত পরে, এ ঘরের দরজায়ও আস্তে খিল লাগানোর শব্দ পেলাম। বুঝলাম, শুতে গেলেন ছোটবাবু। আমি ধীরে ধীরে ফিরে এলাম আমার ঘরে। হ্যারিকেনটা দরজার একপাশে ক্লান্ত প্রহরীর চোখের মতন স্তিমিত শিখায় জলছে, সুধীরবাবু এসে তাঁর বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছেন নিশ্চয়, সাড়া পাচ্ছি না, অজিতও নিদ্রায় অভিভূত। আমার শরীরও ক্লান্ত, চোখের পাতাদুটি আমারও জড়িয়ে আসছে ঘুমে, তবু শুয়ে শুয়ে আপন মনে কী যে সব চিন্তার জাল বুনে যেতে লাগলাম আমি, তার কোন ঠিকানাই ছিল না।

এ'আমার স্বভাব। যা কিছু ঘটনা দেখি, ঠিক শোবার আগে মনে মনে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি। বাড়ীর কথাও ভালো করে ভেবে নেই এই সময়। টাকা পাঠিয়েছি মণিঅর্ডারে, সেটা পাবে অমুক দিন, পাওয়ার পর সব দিয়ে থুয়ে বিনতার হাতে থা কবে কিছু, তাতে মাসের বাকীটা দিন কি চলে যাবে না? বিনতা আপনারই বন্ধুর বোন শচীনবাবু, যার অসুখের কথা শুনে, আপনার মধ্য-ভারত প্রবাসী বন্ধু প্রবাস থেকে চিঠি লিখেছেন আপনাকে, সেই চিঠি পেয়ে আমার সঙ্গে আপনি দেখা করতে এসেছেন, । তাইনা ? ভাগ্যে এসেছিলেন, তাই ত এ-ভাবে আলাপ-পরিচয়টা হয়ে গেল। আপনাদের মতো আমিও এককালে একটু-আধটু লেখবার চেষ্টা করতাম। তা সে-সব চলে গেছে। এখন, এই যে আপনি চুপচাপ বসে বসে শুনছেন আমার কথা, এতেই আমি কৃতার্থ। আর যাই হোক, একজন মনের মতো মানুষকেও ত বলতে পেরেছি আমার মনের কথা!

কিন্তু, যা বলছিলাম। শুয়ে-শুয়ে প্রথমেই যে-কথা মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল, সে হচ্ছে ছোটবাবু আর বীণার কথা। এসব মেয়েরা যে কোন্ সংসর্গ থেকে এসেছে, সে ত আর নতুন করে বোঝাতে আপনাকে হবে না, বুঝতেই ত পারেন, ওরা কী। অথচ, কী দেখলাম সেদিন বলুন ত, ঐ বীণার মধ্যে ? ওর বয়স আছে, যুবতী মেয়ে, ও জানে, ছোটবাবু ওর হাতের মুঠোয়, আমরা জানতাম, এই হাতের মুঠোয় রাখবার জন্যই বীণার

শুধু ছলচাতুরী, কিন্তু, সেদিন রাত্রে যা দেখলাম—যা শুনলাম—তাতে যে আমার সব ধারণা চুরমার হয়ে গেল! বিপ্লববাবুর অসম্মান হচ্ছে দেখে, মেয়েটি তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে চাইছে দূরে! ব্যাপারটা যতই চিন্তা করতে লাগলাম, ততই মনে হতে লাগল, এমন ত্যাগ স্বীকার করতে বোধ হয় মেয়েরাই পারে! শচীনবাবু, কত যায়গায় ঘুরলাম, পার হলাম কতো নদীপথ, কতো প্রান্তর! কত কষ্টই না সইতে হয় সবাইকে এইসব পথযাত্রায়, সে-সব ত নিজের চোখেই দেখেছি!

যতদূর মনে পড়ে, সময়টা হবে গ্রীষ্মের শেষাশেষি—মাঝে মাঝে কাল-বৈশাখীর ভ্রূকুটি দেখা দেয়, মাঝে মাঝে ঝড়আসে, ঝরা পাতা উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়, চলে যায় পথের ধূলোরাশি উড়িয়ে।

আমরা জিয়াগঞ্জের পালা সেরে ভগবানগোলায় এলাম। এখানে মাত্র তিনদিন, তারপরে লালগোলা যাবো, সেখান থেকে কলকাতায় ফিরে এসে কিছুদিনের বিরতি লাভ করব। কিন্তু, ঐ লালগোলা ঘাটেই জীবনের এমন এক রূপের সঙ্গে পরিচিত হলাম, যা আমাকে ঠেলে দিল বিপুল এক পরিবর্ত্তনের মুখে। শচীনবাবু, আপনার বন্ধুর বোন—আমার স্ত্রী-বিনতা—আজ অসুস্থ হয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু ডাক্তার কী বলে গেল সে ত শুনলেনই নিজের কাণে, ভালো হয়ে সে উঠবেই। আমার কথাটা কী জানেন? বিয়ে করে ঘরে আনা অবধি ওকে ক্রমাগত কষ্টই দিয়ে গেছি, স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ওকে রাখতে পারিনি, ছেলেমেয়েরাও তেমন করে মানুষ হচ্ছে না, অথচ, কতটুকুই বা করতে পারি আমি? প্রয়োজনের তুলনায় আয় করতে পারব কতটুকু আমি? রাষ্ট্রনায়কেরা 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড অফ্ লিভিং' বাড়াতে গিয়ে কোথায় এনে ফেললেন আমাদের? নিম্নমধ্যবিত্ত-সমাজকে এভাবে অবহেলা করার ফল বোধহয় ভালো হবে না। শুনি, মাসিক তিনশো টাকা আয় করলে আয়কর দিতে হয়, কিন্তু, প্রশ্ন করি, গড়ে চারজন করে প্রতি সংসারের লোকসংখ্যা ধরলে, বাসা ভাড়া করে যাদের থাকতে হয় তাদের তিনশো টাকায় সংসার খরচ চলে? আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হতে তাদের বাধ্য। জানেন, এইসব কথা যখন বসে বসে ভাবি, তখন মনে হয়, 'উর্বশী' পালার মধ্যে যেমন নেশাগ্রস্তের মতো আমি জড়িয়ে গিয়েছিলাম, সে-ই ছিল ভালো। আমি যে সমষ্টিরই একজন, সেটা অনুভব করার এক অদ্ভুত অবকাশ ছিল! আজ মনে হয়, ওদের সঙ্গে আমি নিজের অজান্তেই জড়িয়ে গিয়েছিলাম অদ্ভুতভাবে! ওরাও যেমন

কোনোদিকে তাকায় না, তেমনি আমিও তাকাইনি কোনো দিকে, বন্ধু সংসারের দিকে পর্যন্ত না! কিন্তু, এইযে একান্ত মনে প্রাণপণে ছুটে যাওয়া, —তার ফলেই বা আমি কী পেলাম? অজিতই বা কী পেলো? অম্বুজনাথ, সুধীর ব্যানার্জীরাই বা কী পাচ্ছে? তবু আমরা ছুটে চলেছি উদগ্র এক অজানিত প্রত্যাশার দিকে, অথচ সে যে কীসের প্রত্যাশা, সে সম্বন্ধে সঠিক ধারণা আমাদের কারুর নেই! কিন্তু, যেদিন অন্তর-উর্বশীর আসবে ক্লান্তি, যেদিন ঘটবে ছন্দপতন, যেদিন হবে 'তালভঙ্গ',—সেদিন কী হবে? সেই কথাটাও সেদিন জিয়াগঞ্জের সেই রাত্রিটিতে শুয়ে শুয়ে ক্রমাগত ভেবে গেছি! মহাকাল যে সেদিন কিছুতেই মার্জনা করবে না! "পূর্বার্জিত কীর্তি তার অভিসম্পাতের তলে হয় নির্বাসিত!"

জিয়াগঞ্জের পরে ভগবানগোলা। ঠিক ভগবানগোলা নয়, ভগবানগোলার কাছাকাছি একটা গ্রাম বিশেষ। আমি আর অনন্ত দলপতি যে কী-ভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, তা বর্ণনা করা বাহুল্য শচীনবাবু। অনন্তর মতো কর্মী মানুষ আমি দেখিনি, ও আছে বলেই আমার পক্ষে একটু-আধটু অবসর পাওয়া তবু সম্ভব হচ্ছিল। কার পাতে মাছের টুকরো কম পড়ল, কে অমুক মাছ খায় না, হাঁসের ডিম রান্না করো, ইত্যাদি ব্যাপার সামলানো থেকে আরম্ভ করে আসরের ব্যবস্থা করা পর্যন্ত, সব ব্যাপারে—ঐ অনন্ত।

প্রথম রাত্রির অভিনয় শেষ হবার পর—বাকী রাতটা মৃতের মতো ঘুমিয়ে একটু সুস্থ বোধ করলাম। অনন্ত এসে ডেকে ডেকে আমার ঘুম ভাঙিয়ে—বিছানার কাছে চা-বিস্কুট-টি পর্যন্ত হাজির করে দিয়ে গেছে। উঠে দেখি, বেলা বেশ হয়ে গেছে, ঘরে কেউ নেই, সুধীরবাবু, অম্বুজবাবু অজিত—এদের সবার বিছানাই খালি। বাথরুম থেকে ঘুরে এসে চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে বললাম—কটা বাজে হে অনন্ত?

অনন্তও চায়ের একটা ভাঁড় নিয়ে বসেছে, বললে—নটা বেজে গেছে। এই ত বড়বাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমি বাজারে চলেছি।

ঘরের শূন্য বিছানাগুলির দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললাম—হ্যাঁ হে, এরা সব গেল কোথায়?

ও' তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—গেছে এদিক-ওদিক।

—অজিত?

—গঙ্গার ধারের দিকে গেল লক্ষ্য করলাম।

চুপ করে বসে চা-টা শেষ করলাম। অমিত বললে—ম্যানেজারবাবু, বড়বাবু কিন্তু খোঁজ করছিলেন আপনার, অনেকক্ষণ থেকে।

—তাই নাকি! এতক্ষণ বলোনি!—বলে, তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম আমি। জামাটা গায়ে দিয়ে নিলাম।

ভগবানগোলার নিকটবর্তী এই যে গ্রামের কথা বলছি, এখানে একটা গোলপাতার ছাউনি-দেওয়া বড় ঘরে দলের প্রায় সবাই মিলে ছিল। এর লাগোয়া একটি ছোট ঘরে ছিলাম আমরা জনকয়েক; বড়বাবু-ছোটবাবু আর মেয়েরা যে 'ইট-বার-করা' পুরাণো বাড়ীতে রয়েছেন, সেখানে যেতে গেলে মিনিট কয়েক হাঁটতে হয়। অর্থাৎ, সমগ্র দলটি তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে বাস করছে আর কী! এরকম কতো হয়!

গেলাম। অপরিসর একটা নালার ধারে ছিল বাড়ীটা। ফটকে কাঠের পাল্লা নেই, ফটকের ইটের গাঁথনী ভেদ করে অশ্বথ গাছ মাথা তুলে উঠে দাঁড়িয়েছে। শিকড়গুলি সাপের মতো এঁকে বেঁকে যেভাবে ইটের ফাটল-গুলিকে আঁকড়ে ধরেছে, সেটা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করবার মতো! যেন অনেকগুলি সাপ একসঙ্গে কিলবিল করে বেড়িয়ে প'ড়ে. ইটের ফাটলগুলিতে মাথা গলিয়ে দিয়েছে।

বাড়ীটা বড়বাবুরই এক পরিচিত ভদ্রলোকের বসত-বাড়ী, দুই মহলা-বাড়ী, বাইরের বহির্মহলের দুটি অংশে দুটি ঘর নিয়ে বড়বাবুরা রয়েছেন, একটিতে মেয়েরা, অন্যটিতে বড়বাবু-ছোটবাবু।

আমি ওঁর ঘরে ঢুকতেই মুখ থেকে গড়গড়ার নলটা সরিয়ে কলরব করে উঠলেন বড়বাবু, বললেন—এইযে এতক্ষণে আসা হলো সরকার-মশাইয়ের।

ঘরে তখন ছোটবাবু ছিলেন না, রয়েছেন বড়বাবু আধশোয়া অবস্থায়, আর পায়ের কাছে, একটা পাট-ভাঙা সাদা মিলের শাড়ী পরা, লীলা রায়। সে যে আমাকে দেখা মাত্রই মুখ টিপে-টিপে হাসছিল এটা আমার চোখ এড়ায়নি। সঙ্কুচিত ভঙ্গিতে লজ্জিত হয়ে বড়বাবুকে বললাম—আজ উঠতে একটু বেলা হয়ে গেল।

—যাত্রাওয়ালার আবার বেলা কী হে!—বড়বাবু বললেন—উঠেছ এই ঢের, আমাদের দিন হচ্ছে রাত, আর রাত হচ্ছে—দিন! নাও, বসো দেখি এখন।

বলে, সামনের খালি চেয়ারটা নির্দেশ করলেন। বসলাম। উনি

বললেন—তোমাকে খবর পাঠিয়েছি, তুমি আসছ না, এদিকে শ্রীমতী যে অধীর হয়ে উঠেছেন।

সকৌতুকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন শীলার দিকে। আর, আমি ওদিকে অদ্ভুত এক লজ্জায় আর সংকোচে অভিভূত হয়ে পড়লাম একেবারে।

বড়বাবু বললেন—নাও আর দেরী কোরো না, বেড়িয়ে পড়ো।

মুখ নীচু করে তখনো মিটি-মিটি হাসছে শীলা, একটু অবাক হয়েই বলে উঠলাম—কোথায়!

—শ্রীমতীকেই জিজ্ঞাসা করো!—বড়বাবু বলে উঠলেন—সেই ভোরবেলা থেকে বায়না ধরেছে। আমি—বেতোরুগী, কোথায় বেরুবো বলো দেখি!

—আমার যে অনেক কাজ! আসরের দিকে একবারটি যেতে হবে, বায়নাদারদের ওখানে—

বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন বড়বাবু—সে আমি সব সামলে নিচ্ছি অনন্তকে দিয়ে। জানো সরকারমশাই, 'উর্বশী'র খুব সুখ্যাতি হয়েছে হে! দু-এক পালা বোধ হয় এখানেই বেড়ে যাবে! নাও, বেরিয়ে পড়ো শ্রীমতীকে নিয়ে।

শীলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম—কোথায় যাবে? এখানে দেখবার আছেই বা কী?

চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে বললে—গঙ্গার ধারে যাবো। যেখানটায় সিরাজউদ্দৌল্লা ধরা পড়েছিল, সেখানটা দেখে আসব।

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি লক্ষ্য করে শীলা বললে—জানেন না? সিরাজ ধরা পড়েছিলেন এই ভগবান গোলায়—নৌকো করে যেতে যেতে।

—তুমি জানলে কী করে?

—ওমা, সিরাজদ্দৌলায় প্লে করিনি আমি? সাজিনি—আলেয়া? —বলে মুখ সারিয়ে ব্রীড়াভঙ্গী করল শীলা, তারপরে বললে—উঠবেন না, নাকি? বলতে বলতে নিজেই উঠে দাঁড়ালো আগে, বড়বাবুর দিকে ফিরে বললে—যাচ্ছি বড়বাবু।

—এসো।

বিস্মিত—বিহ্বল—হতবাক্ কোনো নবীন প্রেমিকের মতো আমি বেরিয়ে এলাম ওর পিছনে-পিছনে। ফটক পেরিয়ে বাইরে এসে ও মাথায় তুলে দিলে ঘোমটা।

অন্ধকারে, নিঃশব্দে কিছুক্ষণ পাশাপাশি চলবার পর, যখন আমরা সড়কের একটা বাঁক ঘুরে নির্জন পথটায় পা দিয়েছি, ও বলে উঠল—গঙ্গার ধারটা কোনদিকে, জিজ্ঞাসা করে নাও না ?

বললাম—আমি জানি, জিজ্ঞাসা করতে হবে না।

ও বললে—ও, এসেই গঙ্গার সন্ধান-টন্ধান নেওয়া হয়ে গেছে বুঝি ?

বললাম—কাল, আমি আর অনন্ত যে গঙ্গায় চান করে গেছি।

ও বললে—বেশ! আর আমরা প'ড়ে রইলুম কুঁয়োতলায়!

পরিহাসের সুরে বলে উঠলাম—উর্বশীদের কথাই আলাদা!

যে-পায়ে-চলা পথটি ধ'রে আমরা দুজনে এগিয়ে চলেছি, সেটি নির্জন ত বটেই, দুপাশে তার বাগান, বাগানের পিছনে পিছনে গৃহস্থদের গৃহস্থালীর আভাষ দেখা যাচ্ছে। ও করল কী, পথের মধ্যে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল, বলল—মানেটা কী হলো ?

—প্রশংসাই করলাম।

আবার চলা হলো শুরু। কিছুক্ষণ পরে ও বললে—ঠাকুরের সুমতি হয়েছে দেখছি।

—ঠাকুর কে ?

—কে আবার! নিজে।

—আমি! একটু বিস্মিত হয়েই বলে উঠলাম—হঠাৎ এ ধরণের নাম-করণ ?

মুখ টিপে একটু হাসল—যাচ্ছি কোথায় ?

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে এসে গেল। আমি আর ও'কথা নিয়ে পীড়াপীড়ি করলাম না, বললাম—গঙ্গার ধার।

দাঁড়িয়ে পড়ল আবার। বলল—এদিকে ঘাট নাকি ?

—হ্যাঁ।

—তাহলে অন্যদিকে চলো।

—কেন ?

—গঙ্গার ধারেই, কোনো নির্জন যায়গায়, ঘাটে নয়।

—কেন ?

ও বললে—ঐ যে বললাম সিরাজ যেখানে ধরা পড়ল, সে জায়গাটা দেখব ?

বললাম, সে ত আমি জানি না

মুখ টিপে আবার হাসল, বলল—আমার দরকার কী? কল্পনা ক'রে নিলেই হলো।

বললাম—সে ত ঘাটে বসেও কল্পনা করা যেতো।

বললে—যেতো না। ঘাটে লোকজন নিশ্চয়ই এখন থাকবে। কথা কইব কী করে, প্রাণ খুলে?

—ও, এই কথা!

তীর্যক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললে—হ্যাঁ এই কথাই! কথা না বলে তুমি পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াবে, বলি, ভেবেছ কী ঠাকুর? ও' কথায় কান না দিয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলে উঠলাম—এসো তাহলে, বাঁদিকের এই পায়ে-চলা মেঠোপথটাই ধরি।

—ধরো।

চলতে লাগলাম মেঠোপথ ধ'রে। এবার পাশাপাশি নয়, আগে আর পিছনে। ও পিছনে, আমি আগে-আগে। চুপ করেই পথ হাঁটছে পক্ষি, আর সেই অবকাশে চিন্তা করতে করতে একসময় মনে হলো ওর ঐ 'ঠাকুর' সম্বোধনের তাৎপর্যটা বোধ হয় ধরতে পেরেছি। এতদিন ওদের সঙ্গে থেকে ওদের যতটুকু বুঝেছি, তাতে মনে হচ্ছে আমার ধারণাটা ভুল নয়। যে পুরুষের সঙ্গে একটির বেশী নারীর বন্ধুত্ব হয়, তাকেই ওরা পরিহাসের ছলে অনেক সময় 'ঠাকুর' বলে ডেকে ওঠে! সতীশবাবুদের কাছ থেকে এ-ধরণের কথা দু একবার শুনে ছিলাম বলে মনে হচ্ছে। দেখা যাক। পক্ষি আমাকে ঐ অর্থে 'ঠাকুর' বলেছি কিনা, এখনি জানতে পারা যাবে। এবং, যদি আমার অনুমানই সত্যি হয়ে দাঁড়ায়, বিষয়টা অত্যন্ত হাসির ব্যাপার, সন্দেহ নেই। এই সব ভাবতে ভাবতে চলেছি একসময় শুনতে পেলাম পক্ষির কণ্ঠস্বর,—সিরাজ লোকটি ভালো ছিল, তাই না?

—কী অর্থে?

—মেয়েদের মূল্য বুঝত।

—বুঝত কী?

—বুঝত না!

বললাম—ফৈজী বেগমের নাম শুনেছ?

—শুনেছি বই কী!

বললাম—তবে? তার চরিত্রে সন্দেহ ক'রে সিরাজ তার ঘরের চারিদিকে নিশ্ছিদ্র দেওয়াল তুলে তাকে মেরে ফেলেছিল, তা' জানো?

মৃদু একটু হাসির শব্দ শুনতে পেলাম পিছন থেকে। শীলা হেসে উঠে বললে—মরণও একসময় মেয়েদের কাছে পরম কাম্য হয়, তা জানো?

—সে আবার কী কথা!—থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম সঙ্গে সঙ্গে ওর ঐ অদ্ভুত কথা শুনে।

সামনে তখন ভাগীরথীর স্রোতধারা দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। তীরে পৌঁছনো পর্যন্ত ও' কোনো কথা বললো না। বলল তীরে পৌঁছনোর পরে। ধারে কোনো লোকজন নেই, ডানদিকে দৃক্‌পাত করলে ঘাটের কিছুটা অংশ চোখে পড়ে, মানুষজনও দেখা যায়, কিন্তু ঠিক চেনা যায় না এতদূর থেকে।

শীলা, আমার পাশে এসে, আমার হাতের ওপর হাতখানা ছুঁইয়ে রেখে ধীরে ধীরে বলে উঠল—ফৈজী বেগম যখন জানতে পারল, সিরাজ তাকে হত্যা করছে ঈর্ষা ক'রে, সন্দেহ করে—তখন প্রথমটায় হতচকিত হয়ে গেলেও, পরে, ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে করতে, ওর সব ভয়—সব আতঙ্ক—আমার মনে হয়—দূর হয়ে গিয়েছিল! তার মনে হয়েছিল, সিরাজ যত নিষ্ঠুরই হোক, তার জীবন নেওয়ার পিছনে তার এক ধরণের 'প্রেম-বোধ'ই কাজ ক'রে চলেছে। দয়িতের এই 'প্রেম-বোধ' কল্পনা ক'রে মেয়েরা অনেক সময় হাসতে-হাসতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে!

বললাম—এ ত তোমার ব্যাখ্যা।

ও বললে—আমার ব্যাখ্যাই ত বলছি, আমি কি অন্যের বুলি কপ্‌চাচ্ছি নাকি? কোনো ঘটনাকে আমার নিজের মনের মতো করে ব্যাখ্যা করার অধিকার ও কি নেই ঠাকুর?

হেসে বললাম—বসবে নাকি ঘাসের ওপর?

ও বলল—বসব বই কী। অনেক কথা আছে।

বসে পড়লাম পাশাপাশি। যায়গাটা নদীর ধার,তার ওপরে গাছের ছায়ার তলাও বটে, ও একটা মাটির ঢেলা কুড়িয়ে নিয়ে জলের ওপরে ছুঁড়ে দিলো, বললে—এখানে ত ভাগীরথী, লালগোলাতেও কি তাই?

বললাম—না। সেখানে—পদ্মা, ভাগীরথী আরও অনেক উজানে মূল গঙ্গার স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে। জানো? আমরা এই যে গ্রামে এখন এসেছি, এর পশ্চিমে ভাগীরথী, আর এর পিছনে, আমি পূর্বদিকের কথা বলছি, সেখানে দিয়েও এক ছোট্ট নদী বয়ে চলেছে, সে-নদী পেরিয়ে আরও পূবে খানিকটা গেলে তবেই ভগবানগোলা রেলস্টেশন।

ও' ঝংকার দিয়ে বলে উঠল—অতো পৌরাণিক ব্যাখ্যা কে তোমার কাছ থেকে শুনতে চাইছে, ঠাকুর?

একটু হেসে বললাম—চুপ করছি। আগে কহ আর।

—ঠাট্টা হচ্ছে?

বললাম—মোটেই না। ঠাট্টা করছ বরং তুমি। আমাকে নিয়ে হঠাৎ এ-ভাবে বেরিয়ে পড়াটা কি উচিত হয়েছে? অজিত কোথায়?

মুখের দিকে এতক্ষণ তাকিয়েছিল। মুখখানা নীচু করল চট করে। একটুক্ষণ থেমে থেকে বললে—আমি কী করে জানব? তাকে ত আর আমার কাছে আসতে দেওয়া হয় না! তাকে ত সর্বক্ষণ কবজা করে রেখেছ তুমি!

একটু চমকেই উঠলাম ঐ কথায়। বললাম—এ' অদ্ভুত খবরটা তোমাকে কে দিলো, শুনতে পারি?

ও হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল, বললে—ভয় নেই গো, রাগ করিনি। বরং এর মধ্য দিয়ে তোমার যে 'প্রেম-বোধ' প্রকাশ পেয়েছে, সেটা অনুভব করে এক ধরণের তৃপ্তিই পেয়েছি।

এবার সত্যিই হতবাক্ হয়ে যেতে হলো আমাকে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, দুর্বোধ্য কোনো চিত্রপটের দিকে না বুঝে যেমন করে মানুষ চেয়ে থাকে অবাক-হয়ে!

ও' তেমনি ভাবে হাসতে-হাসতেই বললে—দেখছ কী? পারলে ত এ'বার বুঝতে, ফৈজী-বেগমের ব্যাখ্যানের উদ্দেশ্য?

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ বলে ফেললাম—যাবে এখন অজিতের কাছে?

মুহূর্তে যেন নিভে গেল ওর সমস্ত হাসির আলো! ঈষৎ বিবর্ণ মুখে শঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠল শীলা—কোথায়?

বললাম—সে-ও গঙ্গার ধারে এসেছে শুনেছি। বোধহয় ঘাটের দিকেই কোথাও বসে আছে। যাবে?

দূরবর্তী ঘাটের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে আমার কাছ ঘেঁষে আরও সরে বসল শীলা, বলল—না।

—না কেন?

—এমনি।

বললাম—মানে হয় না।

ও বললে—হয় মানে। আচ্ছা, একটা কথার উত্তর দেবে?

—কী?

শীলা বললে—সেই যখন ঝুঁকলে, তখন, বীণার দিকে ঝুঁকলে কেন? তত্ত্ব নিতম্ভের যুদ্ধ বেধে যাবে না?

আমার ভিতরটা তখন অদম্য হাসিতে ফেটে পড়তে চাইছে! তাহলে 'ঠাকুর' বলে সম্বোধন করার তাৎপর্য যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই হলো?

হেসে উঠে বললাম—এসব মাথায় ঢুকল কী করে?

—মালতীদি বলছিল,—শীলা বললে—কাল রাত্রে চুপিচুপি বীণাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া, এসবই ত সে দেখেছে।

প্রসঙ্গের জের যাতে আর বেশীদূর না যায়, সেই ভেবে বলে উঠলাম—বীণাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলাম ছোটবাবুরই নির্দেশে। একটা কথা জানো কী, বীণা কলকাতা গিয়েই দল ছেড়ে দিচ্ছে?

—তাই নাকি?—বলে, আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবার পর, হঠাৎ সে হেসে উঠল খিলখিল ক'রে। তারপরে অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করে বলে উঠল—কতো ঢং দেখালি খেঁদী, অম্বলে দিলি আদা! দল ছেড়ে দিচ্ছে। ছোটবাবু রয়েছে হাতের মুঠোয়, দল অমনি ছাড়লেই হলো?

বলে, আমার দিকে ফিরে বসল একেবারে মুখোমুখি হয়ে, বললে—তা' তুমি কি আজকাল এই সবই ক'রে বেড়াচ্ছ নাকি?

—কী?

—এই, সব ডেকে-ডুকে দেওয়া?

অদ্ভুৎ কৌতুক অনুভব করলাম ওর কথায়, একমুহূর্ত থেমে থেকে ব'লে উঠলাম—বলো ত, তোমার ক্ষেত্রেও সে ভূমিকা নিতে রাজী আছি। ডেকে দেবো নাকি অজিতকে?

কণ্ঠস্বরে পরিহাসের আভাষটুকু অনুভব করতে পেরেছিল কিনা জানি না, উত্তরে বলে উঠল—সেই বান্দা কি তুমি? ওকে তুমি ছাড়বে আমার কাছে তাহলেই হয়েছে!

কথাটা ও হয়ত তরল কণ্ঠেই বলে থাকবে, কিন্তু আমার মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া হলো ভিন্নরূপ। ধীরে ধীরে মুখের হাসি আমার মিলিয়ে গেল, হৃদয়ের অবারিত উচ্ছ্বাস স্তিমিত হয়ে এলো। শীলা আমার মনের ভাব অনুধাবন করতে পারেনি। আমার নীরবতার কারণ অনুসন্ধান না ক'রে ও নিজের মনের গহনেই যেন অবতরণ করল। কী ভাবতে

ভাবতে কতকটা আত্মগত ভাবেই বলে উঠল—ভালবাসা! ভালবাসার কতো রূপই না দেখছি! দেখতে-দেখতে নিজের অন্তরটাও হাহাকার করে ওঠে! যা-পাইনি, তা' কাউকে পেতে দেখলে মনটা হিংস্র হয়ে ওঠে!

চম্‌কে উঠে, মৃদু কণ্ঠে বললাম—কী বলছ?

ও বললে—মালতীদির কথাটা জানো? সুধীরবাবুকে মনে মনে ভীষণ ভালোবাসে, সুধীরবাবু নিজেও তা' বোধহয় জানে না। সুধীরবাবু কি ওকে চিনতেও পেরেছে ছাই!

—মানে।

ও বললে—তুমি সুধীরবাবুর জীবনের ঘটনা সব জানো?

—তা' কিছু কিছু জানি।

এবার বোধহয় অবাক হবার পালা ওর, বললে—জানো!

বললাম—হ্যাঁ! এমন কি সেই ওঁর লেখক-বন্ধুটির খবরও জানি, যিনি সুধীরবাবুরই জীবনী নিয়ে নাটক রচনা করেছিলেন। বসন্ত সেন।

ও আগ্রহের সঙ্গে বললো—জানো তাঁর কথা!

—জানি বই কী।

শীলা অন্তরের উত্তেজনাকে দমন করতে করতে বললে—তাহলে ত সবই জানো। শোনো, তোমাকে একটা কথা বলি। ঘুণাক্ষরে কাউকেও বোলো না, মালতীদি কঠিন দিব্যি দিয়ে রেখেছে। কথাটা আমি ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ জানে না। শুধু তোমাকে বলব।

—কিন্তু, কথাটা কী?

শীলা বললে—সুধীরবাবুর বন্ধু সেই যে নাট্যকার? যিনি মারা গেছেন? তাঁরই বিধবা বোন ঐ মালতীদি। মনে মনে সুধীরবাবুকে ভালবাসে, কিন্তু কোনোদিন কাউকে জানতে দেয় নি, নিজের ভাইকেও না। বিধবা হয়ে নিঃসম্বল অবস্থায় পড়ে। মজা দেখেছ? মনে মনে সুধীরবাবুর কথা ভাবতে ভাবতে থিয়েটারেরই জীবন গ্রহণ করল। অ্যামেচার-থিয়েটার করে বেড়াতো, যাত্রাদলে ত সব মেয়ে আসতে চায় না, ও এলো সুধীরবাবু দলে আছে ব'লে।

স্তব্ধ হ'য়ে সেদিন ওর কথাগুলিই শুনছিলাম শচীনবাবু, আপনারা লেখক, আপনারা সব শুনলে কতটা অবাক হতেন জানি না, আমার কিন্তু বিস্ময়ের সীমারেখা ছিল না! ভাবছিলাম, বিচিত্র মানুষ আর বিচিত্র সংসার, কতো বিচিত্র ঘটনাই না ঘটে চলেছে, আমরা তার খোঁজ রাখি কতটুকু?

একবার মনে হলো, এখন সুধীরবাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালে কেমন হয়? কেমন হয় সুধীরবাবুকে বললে,— জীবনের সবটাই হলাহলে ভরা নয় সুধীরবাবু, কোথাও-না-কোথাও অমৃত রয়েছে। আপনার খোঁজবার মতো মন নেই, তাই দেখতে পাচ্ছেন না!

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, সুধীরবাবু কি সত্যিই জানেন না? এমনও ত হতে পারে, সবই তিনি জানেন, আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়বার সংকোচে তিনি ও'সব কিছু বলতে চান না!

মনে মনে এই সব তোলপাড় করছি, শীলা বলে উঠল—মালতীদির কথা শুনে ধ্যানস্থ হ'য়ে পড়লে যে একেবারে! কী হলো?

কিছু না'-বলে চট্ করে উঠে দাঁড়ালাম বললাম,—চলো, ফিরে যাই।

—সেকী!

বললাম—অবাক হচ্ছো যে? হাতের কাজ সেরে, খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকিয়ে ঘুম দিতে হবে না? আছো কোন্ দলে?

বলে, একটু থেমে, একটু হেসে বলে উঠলাম—রাত আমাদের দিন, দিন আমাদের রাত, তাই না? রাতে রঙ মেখে আসরে যাচ্ছো, আমরা তদ্বির-তদারক করছি, সব শেষ করতে রাত তিনটে, কখনো-বা চারটে, তাহলে? কী দাঁড়ালো? দিনে ঘুম, রাত্রে-জাগরণ।

অদ্ভুৎ একটা ব্রীড়াভঙ্গী করে আমার দিকে মুখ তুলে তাকালো শীলা, বললে—ওসব কি আর গায়ে লাগে ঠাকুর? তোমার জন্য সবই সার করেছি! কষ্ট আর কষ্ট বলে মনে হয় না! যেন চন্দনের প্রলেপ!

বলতে-বলতে উঠে দাঁড়ালো সে। একটু হেসে বললাম—কোন্ নাটকের সংলাপ?

মুখটা ফিরিয়ে নিয়েছিল, আবার ঘুরিয়ে অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করল আমার দিকে, তারপরে দীর্ঘশ্বাস টেনে কৃত্রিম খেদে বলতে লাগল—এতই যখন বোঝো, তখন আর এটা বুঝতে পারলে না? জীবন-নাটকের সংলাপ, বুঝলে?

হেসে বললাম—কী, ফিরবে এখন? না, ঘাটের দিকে যাবে?

পা বাড়িয়েও থম্‌কে থেমে গেল, বললে—কেন? ঘাটে কেন?

—অজিত যদি বসে থাকে?

মুখখানিতে আকস্মিক এক লজ্জার ছায়া খেলে গেল মুহূর্তের জন্য, সামলে নিয়ে বলে উঠল—গেলে খুসী হও নাকি ?

—হই বই কী!

[illegible]
ন ?

—কী ?

—হিংসের বিষ-তীর।

উপমার নতুনত্বে কৌতুক অনুভব করলাম বটে, কিন্তু, কথার পৃষ্ঠে উপযুক্ত কথা কিছু বলতে পারলাম না। বললাম—হিংসে আবার কেন? ঐ ত ঘাটের রাস্তা। তুমি যাও না।

—যদি না থাকে ?

বললাম—যদি না থাকে, একা ফিরে আসতে পারবে না ?

—তাই বই কি—শীলা আমার পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে বললে—কেউ চুরি করে নিয়ে পালায় যদি ?

—সে ভয়ও আছে নাকি ?

—ওমা, থাকবে না !—বলে, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, সত্যি সত্যিই বিস্মিত হয়ে তাকায় আমার মুখের দিকে, বলে—কিছুই জানো না দেখছি! এমনিতে আমরা যা-ই হই না কেন, ঐ যে থিয়েটার করি, দুষ্টু লোকেদের কাছে সেটাই ত আকর্ষণ! এখানকার লোক দেখে কী আর বুঝবে না, আমি এ' অঞ্চলের মানুষ নই, আমি যাত্রাদলের মেয়ে ?

কথাটা অসত্য নয়। যতই এদের নাম পোষ্টারে বিজ্ঞাপিত হোক না কেন, যতই এদের ছবি ছাপা হোক না কেন, মানুষের মনে প্রত্যক্ষে হোক পরোক্ষে হোক, এদের সম্বন্ধে এক হীন চিন্তাই ঘনিয়ে ওঠে। সেটা মুখে সবাই প্রকাশ না করলেও অনেকেরই হাবে-ভাবে চলনে-বলনে, ব্যক্ত হয়ে পড়ে। এ' নির্মম সত্যিকথাটা আমাদেরও পক্ষে যতো কম প্রকাশ করা যায় ততই মঙ্গল, তবে, শীলা যে এটা অনুভব করে, সেটা লক্ষ্য ক'রে সেদিন অখুশী হইনি, এটা বলতে পারি, শচীনবাবু।

সেদিন, ওর কথার উত্তরে ওকে শুধু বলেছিলাম—তাহলে ?

আমরা পায়ে চলা পথটি ধ'রে গঙ্গার ধার থেকে অনেকটা ভিতরে চলে এসেছি একটা অপেক্ষাকৃত পরিসর পথের উপর, এবং এই পরিসর পথটিই সোজা চলে গেছে গঙ্গার ঘাটের দিকে।

পথে লোকজন একেবারেই ছিল না। ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললে—তাহলে, কী ? ফিরেই ত যাচ্ছি।

বললাম—আচ্ছা শীলা, ওর সঙ্গে ক'দিন দেখা হয় না ?

[illegible]আহা!—বলে, মুখ ঘুরিয়ে, আমার দিকে মুহূর্তের জন্য [illegible]; ফিরে দাঁড়ালো। তারপরে, আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—দেখা হয়, এটা সত্যিই চাও?

কোমল কণ্ঠে বললাম—চাই বই কী। এক কাজ করো, তুমি ঘাটে চলে যাও, আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, পাঁচমিনিট দাঁড়িয়ে থাকব, যদি এর মধ্যে না ফেরো, তাহলে বুঝব, অজিত ওখানে আছে, অজিতের সঙ্গে তোমার দেখাও হয়েছে। তখন আমি একাই ফিরে যাব। কেমন? এই কথা রইল?

—তোমার অজিত মরবে, এখনো ফেরাতে পারলে ভালো করতে!

বলতে-না-বলতে একটা ঘূর্ণির মতো হিল্লোল তুলে শীলা প্রায় ছুটেই ঘাটের দিকে চলে গেল বলা যায়। আমি পাঁচ মিনিট কেন, তারও বেশী সময় দাঁড়িয়ে ছিলাম বলতে হবে। ঘাটের পথ একেবারেই নির্জন; যারা স্নান করবার তাঁরা স্নান সেরে চলে গেছেন বহুক্ষণ, এত বেলায় স্নানার্থী আর কই? একটি রাখাল ছেলে একবার একপাল গাভী নিয়ে পথটা পার হয়ে অন্যদিকে চলে গেল শুধু!

ও যখন ফিরল না, তখন বুঝলাম, অজিতের সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে তাহলে সত্যিই। এবং সে কথার প্রমাণও পেলাম দুপুর বেলায়, খাওয়া-দাওয়ার পরে। আমাদের বাসার কাছে একটা গাছতলায় মাদুর পেতে অজিত গেল বিশ্রাম করতে, সঙ্গে ডেকে নিয়ে গেল আমাকে। চুপিচুপি বললে—আজকের ঘটনার জন্য আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

—কী ঘটনা?

বললে—শীলা আমাকে বলেছে।

—কী বলেছে?

—বলেছে, আপনি ওকে ঘাটের কাছ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে চলে গেছেন।

—ওঃ, এই ব্যাপার!

একটুক্ষণ থেমে থাকার পর অজিত বললে—এ-এক নতুন দিগন্ত খুলে গেছে আমার কাছে!

আর, তারপরে কত কথাই ও' বলে গেল, আমি কিছু শুনলাম, কিছু শুনলাম না, মৃদু মন্দ হাওয়ায়—সত্যি কথা বলতে কী, আমার তন্দ্রা আসছিল।

কিন্তু আজ আপনাকে কথাটা বলেই ফেলি শচীনবাবু, হঠাৎ ওর একটি কথায় আমার সমস্ত তন্দ্রা একেবারে ছুটে গেল। কথায়-কথায় ও' সেদিন কী বলেছিল, জানেন? বলেছিল, বড়দা, আপনাকে ত আমার জীবনের সব

কথাই বলেছি। আমার জীবনে কোন খারাপ মানুষের খাঁটি রূপকে জানি নি। তাই, এই ছলনাময়ী মেয়েটির ছলনা এত মধুর লাগছে আমার কাছে।

চ'মকে উঠে বললাম, বললাম—ছলনা!

—ছলনাই ত! আমাকে ভালবাসে, সে কি ওর প্রাণের কথা? মুখের কথা মাত্র। অথচ, ভাবতে গেলে, মুখের কথাই ত সব! যাকে বলে—মনে যখন যা আসে, সব বলে ফেলা! মানুষের এক-একটা 'মুড্'-এর এক-একটা বিকাশ! তবু এই সব বিরল মুহূর্তের বহিঃপ্রকাশের স্মৃতি নিয়েই মালা গাঁথতে ভালো লাগে যদুদা! এই ভালো লাগারই দাম কি কম? এরই জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম যদুদা!

কোন কথা না বলে অজিতের কাছ থেকে এর পর উঠে এসেছিলাম ঘরের দিকে। সবাই তন্দ্রাভিভূত, দেখি, দরজার কাছে বসে পালানবাবু তামাক সাজছেন। বললেন—ও-ছোঁড়ার সঙ্গে কী অতো গুজ-গুজ ফুসফুস করেন! আসুন, তামাক ইচ্ছে করুন।

—না, থাক।

বলে, ঘরে না ঢুকে, ওরই পাশে বসে পড়লাম দাওয়ায়। তামাক সেজে নিয়ে, টিকে ধরিয়ে, তাতে গোটা দুই টান দিয়ে পালানবাবু ফিরলেন আমার দিকে, বললেন—কী করেন? গল্প শোনেন বুঝি? ঐ এক রোগ! যাত্রাদলে নতুন কেউ এলে, সবাই কোমর বেঁধে লেগে যায় যার-যার গল্প শোনাতে! আরে বাপু, গল্প শোনাবো আমরা, তুমি দুদিনের ছোকরা, তুমি আর গল্প শোনাবে কি? কতটুকু জীবন তোমার হে? আমাদের তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, আমরা হচ্ছি—যাকে বলে—ত্রিকালদর্শী। গল্পের ভাণ্ডার আছে আমাদের কাছে, কতো নেবে তুলে, নাও না?

একটু থামলেন পালানবাবু, আবার গোটা কতক টান দিলেন হুঁকোয়, তারপরে বললেন—শুনবেন তাহলে একটা? বর্দ্ধমানের এক গাঁয়ে গেছি পালা গাইতে। তখন আমি সা-জোয়ান, ইয়া চেহারা, আছি গোলক সার দলে। মশাই, বলব কী, 'নম্বর' সারা করে এক সময় আসর থেকে বেরিয়ে এসেছি, আমার পরের সিন আসতে দেরী আছে, একটু এগিয়ে গিয়ে বিড়িওয়ালার কাছ থেকে বিড়ি কিনতে গেছি, তা' সম্বন্ধীর পো আমায় বিড়ি বিক্রি করলে না কিছুতেই! বললে—ইঃ! আপনাকে বিড়ি দেবো! যান মশাই—হবে না। অবাক হয়ে বললাম—সে কী! কেন? তা' সম্বন্ধীর পো বললে—আপনি রাজার ভাইটার কাণে ফুসমন্তর দিয়ে দিয়ে—ফুসমন্তর

দিয়ে দিয়ে—বাজার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিলেন—রাজাটাকে ছারখার করে দিতে বসেছেন,—আর, আপনাকে বিড়ি দেবো কি না, আমি? সে বনিস্তি আমি নই!...শুনে ত আমি থ! কী আর করি! ঝিম্-ধরা গুলি-খোরের মতো সাজঘরে এসে বসে রইলাম। সবাই বললে—কী হলো মশাই, কী হলো? তাদের কিছু বললাম না। মনের মধ্যে কী হচ্ছিল জানেন? হচ্ছিল, পার্ট ত জ্বালিয়ে দিয়েছি, নইলে সম্বন্ধীর পো ওকথা বলে? কিন্তু, সেদিক থেকে আনন্দ হলেও, ওদিকে যে নিরানন্দের ব্যাপার! বিড়ি না পেয়ে পেট ফুলে ওঠবার জোগাড়।

পালানবাবুর বর্ণনার ভঙ্গিতে না হেসে পারলাম না। পালান বললে—হাসছেন কী ম্যানেজারবাবু! আপনার শ্রীচরণের আশীর্বাদে পার্ট ত করলাম অনেক! কিন্তু, আজকাল বসে বসে কী ভাবি জানেন? মিথ্যা দিয়ে সত্যের আভাষ ফুটিয়ে তোলা, ভিতরে যতো ক্ষমতার কথাই থাক না কেন, আমাদের জীবনগুলি যে মিথ্যায়-মিথ্যায় ভরে গেল। আপনি বিশ্বাস করুন, আজ আমাদের চোখের জলও মিথ্যায় এসে দাঁড়িয়েছে! দলের কেউ মারা যাক? অমনি চোখের জলের বান ডেকে যাবে, কিন্তু, সত্যিই সে কি কান্না, সত্যিই সে কি দরদ? বারবার নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করে চলেছি!

পালানবাবুর কথা, ছোটবাবুর কথা, সুধীরবাবুর কথা, অজিতের কথা, শীলার কথা,—সব কথার মধ্য দিয়ে যেন একটি সুরই বার বার বেজে উঠতে চায়! এ দল বলে কথা নয়, এ'ব্যক্তি বলে কথা নয়, সবাই যেন সমগ্র মানুষ-জাতির একটা অনিবার্য ট্রাজেডির সুর গুণগুণিয়ে তুলছে সারা জীবন দিয়ে! মুহূর্তের পাওয়া কেমন করে অনন্তের পাওয়ায় পরিণত করা যায়, এ যেন প্রতিটি মানুষের অপ্রত্যক্ষ সাধনা! সে সাধনায় সিদ্ধি আসে ক'জনের? সাহিত্যের মাধ্যমে যে স্বাক্ষর রেখে যেতে চায় তাকেও ত চলে যেতে হয় স্রোতের-মুখে-পড়া ছোট্ট তরীটিতে ফসলের ভার থরে-থরে সাজিয়ে দিয়ে! 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী, আমারই সোনার ধানে গিয়াছে ভরি!'

কিন্তু, সাহিত্য সৃষ্টির কাজও ত সবার নয়! যাদের নয়, তারা? যারা নশ্বরতার কাছে সহজেই বশ্যতা মেনে সকালে থলি হাতে বাজারে বেরুচ্ছে, অফিসে যাচ্ছে, বাড়ী ফিরছে, সাধারণ সংসারের সাধারণ ভোগ-ব্যসন নিয়ে

মগ্ন হয়ে আছে, তাদের জীবন [illegible] এক বয়েসের,—[illegible] চলে কেটে, যায়, অনিবার্য লয়ে এসে সাধারণভাবেই একদিন থেমে যায়। কিন্তু, এই পালানবাবু থেকে শুরু করে, ছোট-বড়ো যারাই সাধারণ জীবনের গণ্ডীর বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আত্ম-জিজ্ঞাসায় অধীর হয়ে উঠছে, সেই তারা?

মনে পড়ে, ভগবানগোলার পালা সেরে লালগোলায় যেদিন এলাম, সেদিনকার কথা। তরুণ-বয়সী এক অভিনেতা কী কারণে যেন রেগে উঠে বলছিল—দল ছেড়ে দেবো, কিন্তু ছেড়ে দেবার আগে বুঝিয়ে দিয়ে যাবো, কে গেল? সবার সব মুখোস খুলে দিয়ে যাবো!

ছেলেটি সম্ভবতঃ দলের কারুর-কারুর চারিত্রিক ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত করে কথাটা তুলেছিল! কিন্তু কতো হাস্যকর তার এই চিন্তা! বলতে ইচ্ছা করছিল—মুখোস কোথায় যে খুলবি? মুখোস পরতে পরতে মুখোস এখন সত্যিবারের মুখে পরিণত হয়েছে! মুখোসই 'মুখ' হয়ে দাঁড়িয়েছে!

অর্থাৎ, থিয়েটার-যাত্রার কোন লোককে যদি বলা যায়, তুমি চরিত্রহীন, তুমি অমুক মেয়ের প্রেমে পড়েছো, ইত্যাদি,—তাহলে সমগ্র সমাজের পক্ষে চমকটা কোথায়? যারা শুনবে, তারা এই কথাই বলবে, এ-তো জানা কথা! এ-আর নতুন কথা কী! মঞ্চে মেয়েছেলের হাত ধরতে পারো, মেয়েছেলের কোলে মাথা রেখে শুতে পারো,—আর মঞ্চের বাইরে সেই তাদের কাউকে ওভাবে দেখলে, তোমার মাথায় রক্ত চ'ড়ে গেল? কাকে কি বলবে? তোমার চীৎকারই সার হবে!

কিন্তু, লালগোলার কথা যখন এসে পড়ল, তখন আমার শেষ কথাটি বলবারও সময় এসে গেল শচীনবাবু! ভগবানগোলার সেই গ্রাম থেকে বাস-এ, লরীতে বোঝাই হয়ে আমরা এসে পৌছলাম লালগোলা। এবং পৌছানোর পর থেকে, পরের দিন—রাত কেটে গিয়ে—তারও পরের সকাল পর্যন্ত আমার বা অনন্তর নিঃশ্বাস ফেলার পর্যন্ত অবকাশ ছিল না! বড়ো একটা টিনের আটচালা আমরা পেয়েছিলাম, কাছেই আর একটা ছোট টিনের বাড়ী, সেখানে স্থান হলো মেয়েদের। মেয়েদের ঘরদোর দেখাতে গেলাম আমিই প্রথম। বললাম,—আর কী, যে-যার বিছানা পেতে নাও।

চলে আসছি, পিছন থেকে বীণা মেয়েটি অনুচ্চস্বরে আমাকে ডেকে উঠল—ম্যানেজারবাবু, শুনুন?

থমকে দাঁড়ালাম। যে-ঘরটি ওদের চারজনের জন্য স্থির করা হয়েছে,

তার সামনে একটা ঢাকা বারান্দা আছে, সেই বারান্দার একটা কোণে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল বীণা, অস্ফুটকণ্ঠে প্রায় ফিস্‌ফিসিয়েই বললে—একটা চিঠি দেবো, ছোটবাবুকে দেবেন আপনি?

অদূরে দরজার কাছে শীলার হাসি মুখখানা মুহূর্তের জন্য দেখা গেল। আর, দেখা মাত্রই মনে পড়ে গেল ওর সেই কথাটা,—আজকাল কি এ সবই করছ নাকি? এই, দেওয়া-নেওয়া?

তাই, বীণাকে ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠেই বলে উঠলাম—কেন! চিঠি কেন?

বীণার চোখ দুটি ছলছল করছে। সে হাতের মুঠি থেকে ছোট্ট একটা কাগজ বার করে আমার হাতের মধ্যে দিয়ে দিলে, কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে বলে উঠল—লালগোলাই আমার শেষ ম্যানেজারবাবু, এর পরেই আমি কলকাতা চলে যাবো, সেখান থেকে—কাশী, মায়ের কাছে।

—কেন! একথা বলছ কেন?

বীণা মুখ তুলে তাকালো, বললে—আপনি ত জানেন ম্যানেজারবাবু। আমাকে নিয়ে ছোটবাবুকে খুবই হেনস্তা হ'তে হচ্ছে, এ-আমি সহ্য করব কেমন ক'রে?

বললাম—হেনস্তা আবার কী? কে করবে ছোটবাবুকে হেনস্তা?

বীণা তেমনি ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললে—আপনি জানেন না। লোকে কত-কী কানাকানি করে! বিষ-বিষ! লোকের কথার বিষে একেবারে জ্ব'লে-পুড়ে গেলাম!

ব'লে, আর সে দাঁড়ালো না কাছে, মুখ ফিরিয়ে চলে গেল ঘরে।

চ'লে আমিও যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি, ঢাকা বারান্দার বাইরের দরজার কাছে শীলা দাঁড়িয়ে আছে। বললে—যেওনা, একটু দাঁড়াও। চোরি তোমাকে কী যেন বলবে।

'চোরি' অর্থাৎ চারুবালা। বীণারই বয়সী তরুণী মেয়েটি। ফর্সা-ফর্সা চেহারা, দোহারা গড়ন, শান্ত মুখশ্রী। একটু বিস্মিত হয়েই বললাম—চোরি!

শীলার চোখ দুটি কৌতুকে যেন জ্বল জ্বল করছে, দেখে মনে হয়, অতি কষ্টে সে তার উদ্গত হাসির স্রোতকে বেঁধে রেখেছে। মনে একটা সন্দেহ ধবক্ ক'রে জ্বলে উঠল—এর মধ্যে শীলার কোনো কারসাজি নেই ত?

বললাম—চোরি আবার আমাকে কী বলবে?

ঠোঁট উল্টে উত্তর দিলে—তার আমি কী জানি?

বলেই তাড়াতাড়ি চলে গেল ভিতরে, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চোরি এলো বাইরে, হাতে একটা জলভর্তি কাঁচের গ্লাস, আর রেকাবীতে দুটো মিষ্টি, বললে—চট্ করে এটুকু মুখে দিয়ে ফেলুন ত ম্যানেজারবাবু?

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলাম মেয়েটির মুখের দিকে। এই যে এত দীর্ঘ দিন দলের সঙ্গে এ-দেশ সে-দেশ ক'রে বেড়াচ্ছি, কিন্তু কই, এমন আচরণ কারুর ত কখনো দেখি নি। কেউ যে এমন করে মিষ্টি নিয়ে এসে যত্ন ক'রে খাওয়াচ্ছে আমাকে, এ-তো কখনো ঘটেছে বলে মনে পড়ে না! আজ হঠাৎ কী এমন হলো, যে, চোরি এমন করে এসে দাঁড়ালো আমার সামনে?

মৃদু একটু ঝংকার দিয়ে চোরি বলে উঠল—কী! হাঁ করে দেখছেন কী! খেয়ে নিন না টুক করে!

বলেই, মুখের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলল সে।

বিস্ময়ের আমার সীমা-পরিসীমা ছিল না সেদিন! অবরুদ্ধ কণ্ঠে কোন ক্রমে বলে ফেললাম—হঠাৎ?

—হঠাৎ আবার কী! ইচ্ছে হলো, তাই!—বলে, চোরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের কোণে আবার একটু হাসল, বললে—খেয়ে নিন না! আর অতো সাধ্‌তে পারি না!

কোনো কথা না বলে রেকাবীটা হাতে নিয়ে মিষ্টি দুটো খেয়ে ফেললাম তাড়াতাড়ি; ও কাঁচের গেলাস এগিয়ে দিলো। জলটা খেয়ে গেলাসটা ওর হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে বললাম—আমাকে হঠাৎ মিষ্টি খাওয়াবার ইচ্ছা হলো কেন, বলো ত?

—কেন আবার! মরণ হয়েছে আমার, তাই!—বলে, মুখ নীচু করে রেকাবীটা আর গেলাসটা নিয়ে দ্রুত-পায়ে ছুটে গেল ঘরের ভিতরে।

একটুক্ষণ থেমে থেকে বারান্দা থেকে, বাইরে আসছি, মুহূর্তের জন্য চোখে পড়ল, ঘরের এক কোণে পাতা বিছানার ওপর বসে শীলা আর চোরি গা-টেপাটেপি করে হাসছে।

কী বলবেন শচীনবাবু? দিব্য দৃষ্টি? সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে থেকে কালো একখানি যবনিকা সরে গেল। বুঝলাম, সবটাই সাজানো, সবটাই একটি নাটকের একটি দৃশ্যের অভিনয়! এবং, এ-অভিনয়ের পিছনে কাজ করছে শীলার মন, শীলার এক অদ্ভুত নিষ্ঠুর কৌতুক-বোধ! মনে মনেই হাসলাম, হেসে চলে গেলাম নিজের কাজে।

প্রথম কয়েকটা দিন আমাদের কাজের অন্ত থাকে না। তারপরে, যখন আসর বসল, কনসার্ট বেজে উঠল, তখনো কাজের শেষ নেই। 'রঙ-কাম' করে পোশাক-আশাক প'রে যারা আসরে যাবার তারা যাচ্ছে, স্বয়ং বড়বাবু বসে রয়েছেন সাজঘরের সামনে, আর আমরা ছুটোছুটি করছি, এমন কি ছোটবাবুরও পরিশ্রমের অন্ত নেই! রান্নার ব্যবস্থা কী হয়েছে, কে রাত্রে ভাত খাবে না, রুটি খাবে, কার পাতে ভালো মাছখানি পড়ল না, এ-সব তদ্বিরও পরোক্ষে আমাদের। এ-সব ক'রে শুতে-শুতে রাত তিনটে-চারটের কম নয়, ঘুম থেকে উঠতে উঠতে পরদিন যাকে বলে বেলা এগারোটা। তবে, অভিনেতাদের মতো আমরা অতোটা ঘুমোই না, সাড়ে আট-টা, ন'টা সাড়ে-নটার মধ্যেই অনন্ত এসে আমাকে ডেকে তোলে। কাজ থাকলে কাজে বেরিয়ে পড়ি, অথবা কাজ না থাকলে, ঘুম থেকে উঠে বসি।

নটতিলক অম্বুজনাথ একদিন বললেন—মশাই, লালগোলা জায়গাটি বেশ। আমার কেন যেন চট্টগ্রামের কথা মনে পড়ে যায়।

—চট্টগ্রাম!

—মিল নেই, তবু যেন কোথায় মিল আছে।—বলতে বলতে স্বপ্নিল হয়ে ওঠে অম্বুজবাবুর দৃষ্টি, বলেন—তবু ত আমাদের এটা থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা-কোম্পানী, বাস-এ ট্যাক্সি-এ যাতায়াত হচ্ছে, কিন্তু অন্য অন্য কোম্পানীতে আগে-আগে কীভাবে যাতায়াত করেছি! গ্রীষ্মের দিনে—কড়া রোদ্দুরে ছাতি ফেটে যায় আর কী, সেই অবস্থায় খোলা মাঠের ওপরে এবড়ো খেবড়ো রাস্তা দিয়ে গরুর গাড়ীতে টিকির-টিকির করতে করতে চলেছি, প্রাণটা বেরিয়ে যায় আর কী! সন্ধ্যাসন্ধি গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছলাম, সারা গায়ে-হাতে-পায়ে ব্যথা, মাথা ঘুরছে, শরীর আনচান করছে, পেটে ক্ষিদে নেই, গা গুলোচ্ছে, অথচ, আটটা নাগাৎ সাজঘরে গিয়ে বসতে হলো, রঙকাম করতে! সারা রাত তারপরে গলা ফাটাতে হবে জাব্বা জোব্বা প'রে! বুঝুন একবার ব্যাপারটা! স্ত্রী-পুত্র কোথায় রইল প'ড়ে, আমরা যাযাবর বেদের মতো এঘাট-ওঘাট করে বেড়াচ্ছি! মশাই, রক্ত মাংসের মানুষ ত! তাই, যদি সেই হাড়ভাঙা খাটুনির পর একটু-আধটু নেশা ক'রে ফেলি, আপনারা ত তেড়ে মারতে আসবেন, কিন্তু সেদিনকার দিনে সে সব না করে আমাদের উপায়ই বা ছিল কী!

বলে, একটু দম নিয়ে অম্বুজবাবু বলতে লাগলেন—পালা গাইতে কাঁহা-কাঁহা মুল্লুকেই না গেছি! চট্টগ্রাম গেলাম—সেই কর্ণফুলী নদীর কাছে

রিয়াজুদ্দিন বাজার—সেদিনটা ছিল দোলের দিন—পালা শুরু হবে রাত্র দুটোর আগে নয়—বারোটায় সাজঘরে ঢুকলেই যথেষ্ট—গেলাম একটু নেশার চেষ্টায় রিয়াজুদ্দিন বাজারের দিকে। একটি স্ত্রীলোকের বাড়ীতে বসে একটু নেশা করে নিয়ে বাইরে বেরিয়েছি, হঠাৎ আমার সঙ্গীটি একযায়গায় এসে থেমে গেল। একটা বাড়ীর দরজা দেখিয়ে বললে—এ আমার চেনা ঘর। মনে পড়ে গেছে। যাবে ভিতরে?

বললাম—কেন?

সে বললে—গত বছরে এসেছিলাম, এবাড়ীর একটা মেয়ে মানুষের সঙ্গে ভাব হয়ে গিয়েছিল। যে-কদিন পালা গাইতে চট্টগ্রামে ছিলাম, রোজ আসতাম। আমাকে কেঁদে বলত—বাবু, আমাকে কোথাও নিয়ে যাবে? এ বৃত্তি আর ভাল লাগে না।

বলতে বলতে সঙ্গীটি আমার হাত ধ'রে টান দিলে, বললে—এসো না? ফুলবাসী খুব ভালো মেয়ে।

—ফুলবাসী?

—মেয়েটার নাম। এসোই না?

গেলাম। যেরকম হয় আর কী ওসব মেয়েলোকের ঘর। কাঁচের পাল্লা বসানো আলমারীর ভিতরে পুতুল সাজানো সারি সারি, মেঝেতে পুরু তোষকের ওপরে টান টান করে চাদর পাতা, তাকিয়া সাজানো, আর মেঝের বাকীটা অংশ প্রিন্টেট অয়েল ক্লথের মতো কি এর দ্রব্য দিয়ে বিছিয়ে রাখা। আমরা ঢুকেই দেখি, মেয়েটি মাথা নীচু করে বসে আছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে।

'ফুলবাসী'—'ফুলবাসী' বলে কতো ডাকল আমার সঙ্গী, সাড়া নেই। বোধ হয়, খুব নেশা করেছিল মেয়েটি। মেঝের একদিকে গোটা দুই বোতল গড়াগড়ি যাচ্ছে।

আমার সঙ্গীটি গিয়ে মেয়েটির গায়ে হাত দিতেই অবাক কাণ্ড। মাথাটি গড়িয়ে টুপ করে প'ড়ে গেল মেঝেতে।

ব্যাপার দেখে, আমার সঙ্গী আর আমার দুজনেরই নেশা চটে গেছে ততক্ষণে। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখি, মেয়েটি যেখানটায় বসেছিল, সেখানটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ব্যাপারটা হলো, মেয়েটির গলা কেটে, ধড়ের ওপরে মুণ্ডুটি আবার বসিয়ে রেখে, কে বা কারা চম্পট্ দিয়েছে, বাইরের লোকজন তখনও টের পায় নি! আমরা ত ও-সব দেখে আতঙ্কে

ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপ্‌ছি। তারপরে মনে হলো, খুনী বলে আমাদের দুজনকে না ধ'রে ফেলে শেষ পর্যন্ত! তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম, পালিয়ে আর কোথাও নয়, একেবারে আস্তানায়। কটা দিন কী যে উদ্বেগে কেটেছিল, কী বল্‌ব। সেই থেকে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম মশাই, আর ও-লাইনে নয়!

বললাম—তা আসল লোক ধরা পড়েনি?

অম্বুজনাথ বললেন---কিছুই জানি না। আমরা ত তারপর ওখান থেকে চলে এলাম। এ বলছি আপনাকে বিশবছর আগের ঘটনা।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন---কত ঘটনা শুনবেন? চট্টগ্রামের আগেও এক ঘটনা ঘটেছিল। আলিপুর দুয়ারে---রেল লাইনের ধারে দুটি বোন ছিল গঙ্গা আর যমুনা, ফুটফুটে হাসিখুসী মেয়ে দুটি। একবার—তখন আমি শ্রীবব নাট্য সমাজে আছি, গিয়ে শুনলাম, যমুনাকে কেটে ফেলেছে! গঙ্গা বোনের মৃত্যুতে পাগলের মতো হয়ে কোথায় যে চলে গেছে, তার খবর কেউ জানে না। কী ব্যাপার? না, যমুনা কার সঙ্গে যেন ভাবসাব ক'রে পালিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কতোদিন থাকবে পালিয়ে? সে-লোক দিন কতক পরেই উধাও হয়ে গেল। ও তখন আর করে কী, ফিরে এলো তার পুরানো যায়গায়---আলিপুরদুয়ারে। কিন্তু আলিপুরদুয়ারে যার রক্ষণাবেক্ষণে ও-ছিল, সে ওকে ছাড়বে কেন? লোক দিয়ে সে-ওকে একদিন শেষ করে ফেলল!

—ধরা পড়ে নি?

—নিশ্চয়ই। দুজনকেই কালাপানি পার হয়ে আন্দামানে যেতে হয়েছিল। শুনেছি মেয়াদ শেষ হবার পর তারা আর ফিরে আসেনি, সেখানেই বসবাস করছে।

এ-সব শুনতে শুনতে কী-এক অজানা আতঙ্ক এসে যেন মনটাকে গ্রাস ক'রে ফেলেছিল। কিছুক্ষণ আর উঠতে পারি নি, চুপচাপ অম্বুজবাবুরই পাশে বসে ছিলাম দরদী শ্রোতা পেয়ে অম্বুজবাবুরও অন্তরের দ্বার বুঝি খুলে গিয়েছিল। তিনি ব'লে চললেন—আজ বুড়ো বয়সে এ-সব কথা যতো মনে হয়, তত ভাবি, এই সব স্ত্রীলোকের কী অদ্ভুত জীবন। ঐ গঙ্গা-যমুনা দুই বোন কী হাসি খুসীই না ছিল! ম্যানেজারবাবু, এসব স্ত্রীলোককে নিয়ে দুটি পুরুষের দ্বন্দ্ব, এ যেন তখনকার দিনে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। ওদের কাছ থেকে তারা আশা করত একনিষ্ঠতা, কী আশ্চর্য কথা বলুন ত?

ব'লেই আমার দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে, মৃদুকণ্ঠে বলে উঠলেন—এখনকার

কথা ঠিক বলতে পারব না, তবে দেখেশুনে কি মনে হয়, অবস্থা বদলেছে? বোধহয় না।

কথাটার মধ্যে হঠাৎ এমন এক ইঙ্গিতের স্পর্শ পেলাম, যে, আর ওখানে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলাম না, তাড়াতাড়ি উঠে এলাম ওঁর কাছ থেকে।

কিন্তু, ইতিহাস বার বার এসে বর্তমানকে নাড়া দিতে চায়। আমার মধ্যে ওঁরা কী দেখেছিলেন জানি না, আমাকে কেন্দ্র করে ওঁদের মধ্যে কী চিন্তার ঝড় উঠত জানি না, প্রায় সবাই-ই অবসর পেলে কাছে ডেকে গল্প করতেন, এবং গল্পের শেষে একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করতেন, যার অর্থ হলো,—সাধু সাবধান!

এ-সব ইঙ্গিত অবশ্য করতেন না গোকুলবাবু। তাঁর কাছে ইতিহাস ছিল তাঁর নিজেরই স্মৃতিকথার রোমন্থন। সে-সব কাহিনী দিয়ে যে আজকের মূল্যায়ন করতে চা'ছেন, তা' নয়, আসলে গল্পের রসই ছিল সেখানে মুখ্য কথা। বলতেন—যাত্রা কি ফ্যাল্‌না? এ কী উটকো লোকের দ্রব্য? মতিরায়ের কথা ত বলেছি সরকার মশাই, মতিরায়েরও আগে ছিল নীলকান্ত মুখুজ্যে মশাই, ডাক সাঁইটে যাত্রাওয়ালা।

যেদিন বসে ওঁর সঙ্গে কথা বল্‌ছি, সেদিন আমাদের একটু অবসরও ছিল হাতে, উপর্যুপরি দিনকতক 'পালা' হয়ে গেছে লালগোলায়, আরও দিনকতক হবে, খুব নামডাকও হয়েছে, পয়সাও আসছে খুব। এবং পয়সা আসছে বলে বড়বাবুর মনটাও ভালো আছে। রাত তিনটেয় শুয়েছে বলে, বেলা আট-টা বেজে গেছে তবু ঘুমুচ্ছে সবাই, আমার ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে যাওয়ায় বেরিয়ে এসেছি। এসে দেখি, তাঁর ঘরের বারান্দায় বসে গড়গড়া টানছেন গোকুলবাবু। গোকুলবাবুর ঘুম অবশ্য কম, উনি সকাল-সকালই উঠে পড়তেন। আমাকে দেখতে পেয়ে কাছে ডেকে বসালেন। তাতে ক্ষতি নেই, ওঁর সঙ্গে গল্প করতে ভালোই লাগে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই পাটভাঙা সবুজ পাড় সাদা শাড়ী পরে শীলাও যে ওখানে এসে উপস্থিত হবে, এ-জানলে কখনই ওখানে বসতাম না। ক'টা দিন ধ'রে ওর সংশ্রব একেবারে এড়িয়েই চলছিলাম বলা যায়।

সেদিনকার সেই চোরির মিষ্টি-খাওয়ানোর ঘটনার পর শীলার সঙ্গে একবার মাত্র একান্তে দেখা হয়েছিল। বলেছিল—কী ঠাকুর, বীণার খবর কী?

—মেয়েদের খবর মেয়ে হয়ে তুমিই ত জানবে বেশী।

ও হেসে বললে—তা জানবো না কেন? আমার চোখ থেকে তোমরা লুকোবে? দাঁড়ালো কী? ছোটবাবুকে চিঠি ত পৌঁছে দিলে, তারপর?

গম্ভীর হয়ে গিয়ে সংক্ষেপে উত্তর দিলাম—ছোটবাবু ওকে ছুটি দিয়েছেন, লালগোলার পরই ত আমরা কলকাতা ফিরছি? তখন থেকেই বীণার ছুটি।

বেশ মনে আছে, শীলা কথাটা শুনে আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল কিছুক্ষণ ধ'রে, কোনো কথা আর বলেনি।

আর, তার পরে, শীলার সঙ্গে দেখা হলো এই এখন, বড়বাবুর কাছে বসে যখন গল্প শুনছি ওঁর। ও কিন্তু নীরবে এসে পায়ের কাছে বসল বড়বাবুর। বড়বাবু ততক্ষণে বলে চলেছেন—মতিরায়ের লেখা বই আমার কাছে কিছু আছে হে, তা জানো? যত্নে রেখে দিয়েছি, তবু কাগজগুলো খাস্তা হয়ে গেছে। কম বই লিখেছিলেন মতিরায়? লক্ষ্মণ-বর্জন, রাবণ-বধ, গয়াসুরের হরি পাদপদ্মলাভ, সীতাহরণ,—এতো আমারই কাছে আছে। এ ছাড়া রামবনবাস, তরণীসেনবধ, কর্ণবধ, কতো বই ছিল ওঁর। তোমাদের গিরিশ ঘোষের থেকে কোন অংশে কম হে?

তর্ক না করে চুপ করে রইলাম। নিজে প্রাচীন যাত্রাওয়ালা, যাত্রা-সম্বন্ধে ওঁর প্রচণ্ড দুর্বলতা ত থাকাই স্বাভাবিক। বললেন—পিয়ারীমোহনের কথা ত তোমায় বলেছি। দুদান্ত বেহালা বাজিয়ে, বরানগরে বাড়ী ছিল, দোরে দোরে বেহালা বাজিয়ে পয়সা রোজগার করত। ভবানীপুরের এক বেবুশ্যে ওর বেহালা শুনে মুগ্ধ হয়, তারপরে দুজনে মিলে যাত্রার দল তৈরী ক'রে নলদময়ন্তী পালা খোলে, বলেছি না? সেই রকম মেয়ে-যাত্রা সেকালে আরও হয়েছিল, মেয়েরা-মেয়েরা মিলে 'বিদ্যাসুন্দর' করেছিল, বলেছি কী? তারা-হারা আর বৌমাষ্টারের পার্টি ত তখন রীতিমত নাম করে ফেলেছে হে। রাজা বৈদ্যনাথের বক্সিতাও মেয়েদের দিয়ে 'বিদ্যাসুন্দর' পালা তৈরী করেছিল।

ব'লে, পায়ের কাছে বসে থাকা শীলার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—ভ্যালা যাত্রা করেছেন সরকারমশাইরা। ভাবলেন, মেয়ে-নিয়ে যাত্রা এই প্রথম! এই মাথাভর্তি পাকা চুল-ওয়ালার রয়েছে কী করতে, পুরানো বৃত্তান্তের সাক্ষী দেবো না?

বললাম—তা'ত বটেই।

বড়বাবু উৎসাহ পেয়ে বলতে লাগলেন—রামকৃষ্ণ কংসারী মশায়ের নাম

শুনেছো? ঐ পিয়ারীমোহনের দলে গান শেখাতো। কম গুণী ছিল মানুষটা! পুরানো কথা বাবুদের কাছে বসে বসে শুনতাম ত? কংসারী মশাই নিজে বেহালা বাজাতেন চমৎকার, তার ওপরে ভালো নাচ জানতেন। বোঝো ব্যাপার! এ-রকম চৌখশ ব্যক্তি দলে থাকলে, দিগ্বিজয় করা যায় না? তার ওপরে কংসারী মশাই ছিলেন ভালো 'টন্‌শা'—'টন্‌শা' বোঝো? বোঝো না। ঐ দেখ মা-লক্ষ্মী মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে লেগেছেন। তোমাদের হচ্ছে থ্যাটার-মার্কা যাত্রাপার্টি, তোমাদের দলে ত চৌখশ 'টন্‌শা'ই নেই! প্রত্যেক দলে থাকে। কার কখন অসুখ হলো কে জানে! দলে এমন একজন থাকা চাই, যাকে ঝোলে-ঝালে-অম্বলে যেখানে দাও, ঠিক কাজ চালিয়ে যাবে। যে-কোনো পার্ট, যে-কোনো কাজ। নাচ-গান-অভিনয়—সব। তা, তেমন মনিষ্যি ছট করে আজকাল পাচ্ছোই বা কোথায়? ঐ যে 'বিবেক' সাজে আমাদের পঞ্চানন-ছোকরা, ও আবার আমার সম্পর্কে ভাইপো হয়, ওর দিকে একটু নজর রেখো, তালিম দিলে ভালো 'টন্‌শা' হবে কালে-কালে, দেখে নিও। কিন্তু, হ্যাঁ, যা বলছিলাম—ঐ কংসারী মশাই পরে 'দক্ষযজ্ঞ'-যাত্রা করেছিলেন, খুব নামডাক ছিল 'দক্ষযজ্ঞের'!

বলে, একটু থেমে, গড়গড়ার নলে মুখ দিয়ে চোখ দুটো বুজলেন। শীলা আমার দিকে তাকিয়ে কী যেন বলবার চেষ্টা করছে ইঙ্গিতে, ঠিক বুঝতে পারছি না।

একটু পরেই উনি চোখ খুললেন, বললেন—আরেকজন। বুঝলে? আরেকজন ডাকসাইটে যাত্রাওয়ালা ছিলেন সেকালে—রামধন সূত্রধর। তখনকার দিনে প্রতি রাত্রে তাঁর পঞ্চাশ-ষাট টাকা রোজগার হতো। কম কথা নয়! তা, তিনি করতেন কী, সেই টাকার সিকি অংশ নিজে রেখে, টাকাটা দলের সবার মধ্যে ভাগাভাগি করে দিতেন। লোকে তাঁকে ভক্তি করত খুব। অবশ্য এ সব আমারও শোনা কথা। লোকে ভক্তি করে তাঁকে ডাকত 'ওস্তাদজী' বলে। এ'দেরও পরে যিনি যাত্রা ক'রে দেশটাকে মাতিয়ে তুলেছিলেন, তিনি হচ্ছেন, নাম নিশ্চয়ই শুনেছ, 'গোপাল উড়ে।' 'গোপাল উড়ের' বিদ্যাসুন্দর এর নাম শোনে নি এমন মনিষ্যি ত দেখিনে! জানো এই গোপালবাবুর কথা? যাজপুরে বাড়ী ছিল, কলকাতায় এসেছিল কাজের খোঁজে। কী কাজ করত জানো? ফেরী করত, সৌখীন দ্রব্য সব ব'য়ে ব'য়ে ফেরী করে বেড়াতো। কিন্তু, সখ ছিল গানবাজনায়। আসল কথা, যাত্রার পোকা ছেলেন ভেতরে। বৌবাজারের রাধামাধববাবু ছিলেন

বড়লোক মানুষ, তার ছেলের ছিল যাত্রাদল। সেই দলে ঢুকে পড়লেন গোপালবাবু। সুন্দর চেহারা ছিল, গলাও ছিল ভালো! মালিনী সাজতেন তিনি বিদ্যাসুন্দরে। রাধামাধববাবু খুসী হয়ে একেবারে পঞ্চাশ টাকা বেতনে তাঁকে দলে নিয়ে নিলেন। বোঝো ব্যাপার! তখনকার দিনের পঞ্চাশ টাকা! তারপরে অবশ্য রাধামাধববাবু গত হলে এই গোপালবাবুই সব পেলেন। এবং পেয়ে, নিজেই করলেন যাত্রার দল। ভৈরব হালদার মশাই ছিলেন সিঙ্গুরের লোক, তিনি গোপালবাবুর জন্য গান বেঁধে দিতেন। তার মানে বুঝেছ? গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দরের গানগুলি বাঁধা কার তাহলে? ঐ ভৈরব হালদার মশাইয়ের। কী, নমস্য ব্যক্তি নন তিনি? কাশী ধোপা বলে আরেকটি লোক ছিল, ভালো নাচের মাষ্টার, নানান যাত্রাদলে নাচ শিখিয়ে বেড়াতো। সে এলো গোপালবাবুর দলে। আর, গোপালবাবুর দলে মালিনী সাজত শুনেছি সে-ই। লোকে বলে, এই কাশী মালিনীর নাচ থেকেই যাত্রায় খেমটা নাচের উদ্ভব (উদ্ভব) হয়েছে।

বড়বাবু নিজের কথায় মগ্ন হয়ে আছেন, একদিকে আমি বসে আছি, অন্যদিকে পঙ্কি ব'সে ব'সে অস্থিরতা প্রকাশ করছে, ইতিমধ্যে দেখি ঘুম ভেঙে উঠে ফোলা ফোলা চোখে, ধুতির খুঁট-টা গায়ে জড়িয়ে সুশীল এসে উপস্থিত। সে দুহাত জোড় করে বড়বাবুকে নমস্কার ক'রে আমাকে ও পঙ্কিকেও অভিবাদন জানিয়ে বড়বাবুর পায়ের কাছে বসে পড়ল, প্রায় পঙ্কিরই গা ঘেঁষে।

বড়বাবু ওকে দেখে খুসীই হয়েছেন, বললেন—এসো গো সুশীলরানী, এই তোমাদের কথাই সব বলছি। যাত্রার পোকা রয়েছেন যাদের ভেতরে তাদের বিত্তান্তই হচ্ছে।

সুশীল বললে—বলুন বড়বাবু, আপনার মুখে ও-সব কথা শুনলে ভিতরটা জুড়োয়; যাত্রার ফিমেল, লোকে শুনলে বড় হতচ্ছেদ্দা করে!

গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে সরিয়ে সোজা হয়ে বসলেন বড়বাবু, বললেন—ইস্! যাত্রার ফিমেল অতো সোজা নাকি? কাশীধোপা, গোপাল উড়ে, এঁরা সব ডাক সাঁইটে ফিমেল ছেলেন, তাদের কথা লিখে লিখে সব 'ডাক্তার' হচ্ছেন, আর আমি জানিনা কিছু, অ্যাঁ? কী বলো হে-সরকার মশাই, সত্যি না?

—আজ্ঞে, তা' বটে।

ব'লে, চুপ করে থাকি। গোকুলবাবু দেখছি এসব সংবাদ ও কিছু কিছু

রাখেন। 'ডাক্তার' হচ্ছেন, মানে, থিসিস্ লিখে 'ডক্টরেট্' পাচ্ছেন আর কী।

কথা বলতে বলতে ততক্ষণে উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন গোকুলবাবু। বললেন—এই আমার মতো পাকাচুলওয়ালার বাক্যিগুলো মনের ভিতরে ধরে রেখে দিও। আজ আমি বলে যাচ্ছি, এই একদিন তোমাদেরি নিয়ে বই লিখে সব 'ডাক্তার' হবে, হ্যাঁ! যাত্রার ফিমেল অমনি ফ্যাল্না!

পঙ্কি ত বহুক্ষণ থেকেই উসখুস করছিল, এবার আলোচনার ছেদ বুঝে আবার এক কাণ্ডই করে বসল। বলে উঠল—বড়বাবু?

কিছু দম নিয়ে, কোমল কণ্ঠে বললেন বড়বাবু—কী মালক্ষ্মী, মিছে কথা বলছি? এই তোমাদের কথা ত লোকে বইতে একদিন লিখবে? লেখেনি, থ্যাটারের ব্যাপার নিয়ে লোকে বই লেখেনি গাদা গাদা?

পঙ্কি অধীর কণ্ঠে বলে উঠল—আমি অন্য একটা কথা বলছিলাম বড়বাবু।

—কী মা, বলো?

একটুক্ষণ থেমে, থেকে, তারপরে পঙ্কি বললে—আপনার মনে আছে বড়বাবু, আজ একটু ছুটি চেয়েছিলাম?

—ছুটি। আজ?—বড়বাবু একটু বিস্মিত হয়ে উঠলেন—আজ ত সারা রাত পালা, দু-দুটো শো রয়েছে। উর্বশী। সন্ধ্যে সাতটায় পেথম শো-র আরম্ভ, তাই না সরকার মশাই?

বললাম—আজ্ঞে হ্যাঁ।

পঙ্কি বললে—আমি চারটের মধ্যেই ফিরে আসছি।

একটু যেন আশ্বস্ত হলেন বড়বাবু, বললেন—তা, চারটের মধ্যে যদি ফেরো, আমাদের আর আপত্তি কী? কী বলো সরকার মশাই?

—আজ্ঞে, তাতে আর আপত্তি কী?

আমার কথা শুনে পঙ্কি বোধ হয় মুখটিপে একটু হাসল, তারপরে বললে—আপনি আমার কথাগুলো সব ভুলে যান বড়বাবু। বলেছিলাম না, আমার এক বন্ধুর বাড়ী আছে, কদিন ধরে এসে-এসে ঝুলোঝুলি করছে তার বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য। এ সবই ত আপনি জানেন। আজ মনে করেছি, সেখানে যাবো, সকালে উঠেই স্নান সেরে নিয়েছি।

বড়বাবু বললেন—তা' বটে, পাটভাঙা কাপড়ও পরেছ দেখছি।

কথাটায় প্রশ্রয় পেয়ে পঙ্কি বলে উঠল—তাহলে ছুটি মঞ্জুর?

হেসে বড়বাবু বললেন—মঞ্জুর।

পঙ্কি বললে—আর একটি প্রার্থনা আছে।

—বলো?

পঙ্কি বললে—একা যাবো নাকি? কাউকে সঙ্গে দিন।

—কাকে সঙ্গে দেবো?

পঙ্কি অম্লান বদনে বলে বসল—ম্যানেজার বাবুকেই দিন না। আজ বিকেল পর্যন্ত ওঁর আর কাজ কী?

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—না-না, আমি যেতে পারব না।

—তাহলে আমি একা যাবো?

বড়বাবু বললেন—বটেইত, একা যাবে?

বললাম—আমি অজিতকে গিয়ে বলছি। সে বরং সঙ্গে যাক।

অজিতের কথা শুনে মুখ লুকিয়ে একটু হেসে ফেলল পঙ্কি, বড়বাবুর মুখের ভাব অবশ্য বোঝা গেল না। পরক্ষণেই পঙ্কি উঠল কলরব করে,—সে হচ্ছে প্রম্পটার, তাকে দু-দুটো শো আজ চালাতে হবে, সে বরং আজ বিশ্রাম নিক।

আমার দিকে চোখ তুলে বলে উঠল—চলো না বাপু, অতো কিন্তু কিন্তু করছ কেন?

বড়বাবুর মনটা খুবই ভালো ছিল বলতে হবে। ওর কথার প্রতিধ্বনি করে উঠলেন—বটেই ত! কিন্তু কিন্তু করছ কেন?

মনে মনে সত্যিই বিরক্ত হয়ে ছিলাম, বললাম—বাড়াবাড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে পঙ্কির চোখে একেবারে জল এসে গেল, বললে—বাড়াবাড়ি! আমার সঙ্গে যে কারুর যাওয়ার দরকার, এ কথাটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেল, না?

বড়বাবু বললেন—যাও না সরকার মশাই, আর জিদ করছ কেন?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম—আচ্ছা ঠিক আছে, আমি চানটা সেরে আসি।

কুঁয়োতলায় গিয়ে স্নান সারতে দশ মিনিটের বেশী লাগেনি। আমাদের ঘরে ফিরে দেখি, অজিত ঘুম থেকে উঠে বসেছে, সুধীরবাবুও চোখ খুলেছেন, তবে বিছানা ছেড়ে ওঠেননি, শুয়ে শুয়েই গেলাসে করে চা খাচ্ছেন। আমাকে দেখে বলে উঠলেন—ম্যানেজার বাবুর চান সারা? বেরুচ্ছেন নাকি?

—হ্যাঁ।

ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন—বেরোন। আপনাদের উৎসাহ আছে, আমাদের

মর্মগ্রন্থি সব যেন শিথিল হয়ে গেছে। উৎসাহ নেই, কিছু নেই, শুধু অলস শয়নে মুহূর্তের জপমালা হাতে, বসে বসে বিদায়ের ক্ষণ গুণে যাওয়া!

আমি বেশ পরিবর্তন করছি, অজিত বিস্মিত দুটি চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, আর আপন মনে বলে চলেছেন সুধীরবাবু—

'Now my charms are all o'erthrown…'

মনে পড়ে গেল কথাগুলো। আজও তা' মনে আছে শচীনবাবু। টেম্পেস্ট-নাটকের এপিলোগে প্রস্‌পেরো যে-কথা বলেছিল, সে বুঝি আমাদের সবারই জীবন-নিংড়ানো মর্মবাণী :—

"Now my charms are all o'erthrown—
And what strength I have 's mine own
Which is most faint
· Now I want
Spirits to enforce, art to enchant
And my ending is despair
Unless I be relieved by prayer !"

'Art to enchant' কথাটা লক্ষ্য করুন শচীনবাবু, আর লক্ষ্য করুন 'despair' এবং 'Prayer' কথাটি। যাদের কথা আপনাকে আজ বলে যাচ্ছি, তাদের সঙ্গে নিজের জীবনটাকে একসূত্রে গেঁথে নিয়ে বুঝতে পারছি, কী নিদারুণ—কী মর্মভেদী কথাটাই না বলে গেছেন সেক্‌স্‌পিয়ার!

কিন্তু থাক সে কথা। আমি কাপড়-চোপড় বদলে বেরিয়ে আসছি, অজিত ডেকে বললে—কোথায় যাচ্ছ যদুদা?

স্বভাবতই থেমে গেলাম, কিন্তু থেমে গিয়েও সত্যি কথা বলতে পারলাম না। বলতে পারলাম না,—ওহে অজিত, তোমারই শীলার সঙ্গে আমি বেড়াতে বেরুচ্ছি, ফিরবো সেই বিকেলবেলায় তার আগে নয়?

যদি বলতে পারতাম, তাহলে যা ঘটল, তা' ঘটতে পারত না, আর এমন হঠাৎ বিগিয়ে এসে বসে আপনাকে আমার কাহিনী শোনাবার প্রয়োজন হতো না শচীনবাবু!

কিন্তু, বলতে পারলাম না সত্যি কথা, সংক্ষেপে শুধু বললাম—এই একটু বেরুচ্ছি আর কী, কাজে!

বলেই আর দাঁড়ালাম না, হন হন করে চলে এলাম বড়বাবুদের কাছে। কী সব রসিকতা হচ্ছিল জানিনা, বড়বাবু মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখে

নিয়ে বললেন—এইত, পাটভাঙা ধুতি-পাঞ্জাবী প'রে একেবারে কার্তিকটি সেজে এসেছো—যাও মা-লক্ষ্মী, আর দেরী কোরো না।

পঙ্কি উঠে এলো পাশে।

সুশীল হাসতে হাসতে বলে উঠলো—দিদির ফিরতে দেরী হলে আজ আমি কিন্তু উর্বশী, হ্যাঁ!

পঙ্কিও হেসে ফেলল কথাটায়, বললে—তাহলে ত আমি বাঁচি! উর্বশী সেজেছি পেটের দায়ে! বড়বাবু উপভোগ করছিলেন তামাসাটা। হেসে বললেন—যাও মা লক্ষ্মী, কর্তাকে নিয়ে।

এতক্ষণ পরে পঙ্কিকে ভালোভাবে নজর করে দেখলাম। সবুজ ভেল্‌ভেট পাড়ের ধবধবে সাদা মিলের শাড়ী পরেছে সবুজ বর্ণের ব্লাউজের সঙ্গে মানিয়ে। হাতে একগাছা ক'রে চুড়ি, গলায় সরু একটা হার, বাঁ হাতে মেয়েলি-ঘড়ি, মাথায় টেনে দিয়েছে ঘোমটা। ধীর, কোমল কণ্ঠে বললে—এসো। বড়বাবু যখন ছুটি দিয়েছেন, তখন আর ভাবনা কী? তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। আমাকে আমার বন্ধুর বাড়ী পৌঁছে দিয়েই তুমি চলে আসবে।

শেষ কথাটা ও বেশ জোর দিয়ে—সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়েই বললে। আর, তারপরেই বেরিয়ে এলো আমার সঙ্গে। বড়বাবুর কাছ থেকে উঠে, পায়ে চলা পথটি ধরে বড়ো রাস্তার দিকে আসছি, হঠাৎ চোখ পড়লো অদূরের ঘরটার দিকে। আমাদের ঘরটা। দেখি, বারান্দায় বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে অজিত, আমাদের দিকে ছুটি বিস্ফারিত চোখ মেলে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

—কী হলো!

বললাম—অজিত।

বোধহয় একটু চমকে উঠল। তারপরে ঝংকার দিয়ে চাপা গলায় বলে উঠল—ওদিকে দেখতে হবে না। তাড়াতাড়ি চলে এসো দেখি!

অগত্যা যেতে হলো। এ-পথ সে-পথ নিশ্চুপে পার হয়ে এসে, অবশেষে একটা ফাঁকা যায়গায় এসে থামলাম আমরা। ঘোমটা খসিয়ে দিয়ে খুশী-হওয়া কণ্ঠে বলে উঠলো—কী চমৎকার দিনটা আজ দেখছো! মেঘলা! মেঘল-মেঘলা দিন আমার বড় ভালো লাগে।

বললাম—কোথায় তোমার সেই বন্ধুর বাড়ী?

ফিক করে হেসে ফেললে, বললে—হারিয়ে গেছে!

—মানে!

তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলে উঠল—অতো মানে-মানে করতে হবে না। একটা সাইকেল-রিক্সা ঠিক করো দেখি?

—কী হবে!

বললে—ঘুরব। সারা শহরটা ঘুরে বেড়াবো। ঘণ্টা-হিসাবে ভাড়া ঠিক করবে; নইলে ঠকবে কিন্তু।

—আচ্ছা পাগল একেবারে!

—কী বললে! পাগলী?—চোখ ঘুরিয়ে পক্ষি বললে—এতদিন পরে বুঝলে! তোমার সঙ্গে-সঙ্গে থাকলে কী জানি কী হয়, সত্যিই পাগল হয়ে যাই!

মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললাম।

ও বললে—হাসলে যে? বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা?

বলে নিজেও একটু হেসে বললে—কথাটায় হয়তো বাড়াবাড়ি আছে, তবে খুব মিথ্যেও নয় কথাটা। তোমাকে কাছে পেলে মনে হয়, ঘুরি—ঘুরে বেড়াই পাগলের মতো, এ-দেশ সে-দেশ করে বেড়াই! কেন একথা মনে হয় কে জানে!

বলতে-বলতে নিজেকে সামলে নিয়ে কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত করে বলে উঠল—কই, ডাকো রিক্সা?

তা-ই হলো। রিক্সায় করে ঘণ্টা খানেক কেন, ঘণ্টা দুয়েক ধ'রে কতো যায়গাতেই না আমরা ঘুরলাম—দূরে গ্রামের মধ্যে! কোথায় কী মন্দির, কোথায় পুরানো কী আছে, রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে করে সব ও জেনে নিচ্ছে, আর এখানে-সেখানে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছে!

তারপরে, রিক্সা যখন আবার ফিরে এলো শহরে, বাজার অঞ্চলের মধ্য দিয়ে রিক্সাটা চলেছে যখন, তখন হঠাৎ ও করলে কী, চেঁচিয়ে উঠে বললে—থামো-থামো।

—কী ব্যাপার?

ও বললে—এস, এসো দুজনে খেয়ে নেই।

—কোথায়?

—ঐ হোটেলে?

—কোন্ হোটেলে?

বললে—ঐ যে মাটির বাড়ী, টিনের চাল, দেখতে পাচ্ছ না? দরজার মাথায় ভাঙা টিনের ওপরে আল্‌কাতরা মাখিয়ে সাদা রঙ দিয়ে লিখে রেখেছে

বান্ধব ভোজনালয়। ভারী সুন্দর, না? ওকে যেন অদ্ভুৎ এক নেশায় পেয়ে বসেছে। ছোট্ট একটা হোটেল মতন। আমাদের পেয়ে মালিক একেবারে তার নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালে। যাত্রার লোক বলে যে চিনতে পেরেছে এমন নয়! সঙ্গে মহিলা দেখেই সম্ভবতঃ এ' আপ্যায়ন!

পাকা মেঝে, মাটির দেওয়াল, একদিকে একটা খাট পাতা। মেঝেতে পাশাপাশি বসে শালপাতায় ক'রে ভাত-ডাল-ভাজা-তরকারী-মাছ, কতো কী খেয়ে উঠলাম! কিন্তু, এ-সবের বিশদ বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই। আসল কথা, ওকে পেয়েছে ঘোরার নেশায়। খেতে-খেতেই মালিককে জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে ও পদ্মার চরের কথা জেনে নিলে। খাওয়ার পর আমাকে বললে—যাবে না?

—কোথায়?

—পদ্মার চরে।

—সে কী?

মিনতির সুরে ও বললে—চলোনা যদুদা, বেড়িয়ে পড়ি! দেখছ না, আকাশটা কেমন মেঘের টোপর প'ড়ে আছে, রোদ নেই, তোমার একটুকুও কষ্ট হবে না।

বললাম—পদ্মা দেখনি কখনো?

—তুমি দেখেছ?

—না।

—আমিও দেখিনি।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে আবার উঠলাম রিক্সায়। ষ্টেশনের কাছে এসে ছেড়ে দিলাম। পঙ্কি চারদিকে সন্তর্পণে তাকিয়ে দেখছিল, বললে—পা চালিয়ে চলো যদুদা। আমার সেই লোক যদি আমার দেরী দেখে পথে বেরিয়ে পড়ে থাকে আমার খোঁজে, ত. ভয়ানক মুসকিল হবে!

—কেন, মুসকিল কেন?

ঠোঁট টিপে একটু হেসে বললে—যাত্রাথিয়েটারের মেয়েদের ওপর এক শ্রেণীর লোকের যে কী লোভ, তা তুমি জানো না!

অস্ফুটস্বরে বলে উঠলাম—বলছ কী তুমি!

পঙ্কি ও প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল চট করে, বললে—যে লোকের বাড়ী যাবো মনে ক'রে এলাম, তার কাছে যেতে মন চাইল না। কী জানো? এত খুসী হবার চেষ্টা করেও মন সুখী হচ্ছে না! এই বিচিত্র

জীবনের ভার বয়ে বয়ে ক্লান্ত! দেখি যদি পদ্মার হাওয়ায় মনের খুসীটা ফিরে পাই!

কথাটার মধ্যে এমন এক বিষণ্ণ সুর ছিল যে, আমি আর প্রতিবাদ করলাম না, একজন লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে পথের নিশানা জেনে নিয়ে চলতে লাগলাম চরের দিকে।

স্টেশনের প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে রেললাইন ধ'রে ধ'রে উত্তর দিকে চলতে লাগলাম। কিছুক্ষণ যাওয়ার পরই থামতে হলো, রেললাইনও শেষ হয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল সামনেটা একটা খালের মতো। দূরে পদ্মার জল দেখা যায়, আর, এই খালটায় জল নেই, খালের ভিতরে—একপাশে একটা ভাঙা পান্সী নৌকো মেরামত করা হচ্ছে, কোথাও নতুন কাঠ বসিয়ে ঠক্‌ঠক্ করে ঠোকাঠুকি চলেছে, কোথাও আলকাত্‌রা গরম করে রঙ লাগানো হচ্ছে। টিয়ে-পাখী রঙের শাড়ী-পরা অল্পবয়সী একটি বৌ ইট-পাতা উনুনের সামনে বসে আল্‌কাতরা গরম করছে!

ছেলেমানুষীর সুরে পক্ষি বলে উঠল—চলো না যদুদা, দেখে আসি।

গেলাম। লোকগুলি বিস্মিত হয়েই তাকালো আমাদের দিকে। পক্ষি বৌটির কাছে এগিয়ে গিয়ে কী-সব আলাপ-আলোচনা করতে লাগল।

আমার কাছেও এগিয়ে এসেছিল দুটি-একটি লোক। শুনলাম, বর্ষায় এ'খাল জলে পূর্ণ হয়ে যায়। তাছাড়া, বৃষ্টি-বাদল হলেও খালে জল জমে। তখন বড়ো গাঙের সঙ্গে এর হয়ে যায় সংযোগ। আমরা এ-সব কথাবার্তা বলছি, হঠাৎ চেয়ে দেখি পক্ষি কোমরে আঁচল জড়িয়ে বৌটির সঙ্গে আল্‌কাতরা-গরম করার কাজে লেগে পড়েছে।

আপনাকে বলব কী শচীনবাবু, সে'সব পাগলামীর দিনগুলি আজও স্পষ্ট চোখের সামনে ভেসে ওঠে! পনেরো বিশ মিনিট নয়, প্রায় ঘণ্টা দুয়েক নৌকোর লোকেদের সঙ্গে সেদিন কাটিয়ে ছিলাম আমরা। আমি বসে রইলাম পাড়ে, ঘাসের ওপর। আর পক্ষি বৌটির সঙ্গে মিশে কী যে গল্প আর কী যে হাসাহাসি করতে লাগল, সে ও-ই জানে! আল্‌কাতরা গরম হওয়া মাত্র বৌটি সরে দাঁড়ালো পক্ষিকে নিয়ে, আর দুজন জোয়ান লোক এগিয়ে এসে সন্তর্পণে নামিয়ে নিলে আল্‌কাতরার টিন উনুন থেকে। ছোট ছোট সরু বাঁশ কেটে তার ডগায় এক গোছা সাদা সুতো বেঁধে, সেই অতিকায় ব্রাশের মতো বস্তুটা আল্‌কাতরার টিনে ডুবিয়ে নিয়ে নৌকোয় রঙ

লাগাবার যে-পদ্ধতি দেখলাম, তাতে, আমার ততটা বিস্ময় জাগেনি, যতটা জেগেছিল পক্ষির। সে ছিল নীচে, আর আমি ছিলাম পাড়ের ওপরে একটা বাবলা গাছের ছায়ায়। আমার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে, সে কী তার উল্লাস! বললে—এসো না, আমরাও রঙ লাগাই?

একটি বুড়ো-মতন লোক হেসে বললে—আপনেরা পারবেন না দিদিমনি।

ইতিমধ্যে লক্ষ্য করলাম, একটি-বিশ-বাইশ বছরের ছেলে, কলা-গাছে কলা-পাতার যে আগার দিকটা আছে, সেরকম গোটাকয়েক কেটে নিয়ে এসেছে। তারপ প্রান্তটুকু পাথর দিয়ে ছেঁচে নিয়ে তৈরী করল অতিকায় তুলি, সেটা ডুবিয়ে রঙ দিতে লাগল।

ওদের নৌকোর কাজ এমনি করে এগিয়ে গেল যখন সমাপ্তির পথে, আমি ওকে ডেকে বললাম—এবার চলো, চারটে যে বাজে?

—যাই।—বলে বাধ্য মেয়েটির মতো উঠে এলো আমার কাছে বৌটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে। আবার আমরা ফিরে আসছি স্টেশনের দিকে, ও-হঠাৎ একসময় দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল—বারে, ফিরে যাচ্ছি নাকি?

—যাবো না!

ও বললে—বারে, চরটাই ত দেখা হলো না!

—চর আবার কাছে গিয়ে দেখব কী? ফিরতে হবে না? কটায় শো, খেয়াল আছে?

পক্ষি মিনতির স্বরে বললে—চলোই না, একটুখানি ঘুরে আসব।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম—পনেরো মিনিটের মধ্যে ঘোরাঘুরি শেষ করতে হবে।

ও বললে—না, আধঘণ্টা।

আর কিছু বললাম না। আবার এগিয়ে গেলাম সেই খাদের দিকে। খাদে নেমে খাদটা পার হয়ে উঠলাম গিয়ে চরে। এসে মনে হলো, না এলে বিপুল এক আনন্দের স্বর থেকে সত্যিই বঞ্চিত হতাম বুঝি! চারিদিকে সবুজের হিল্লোল, ধান আর ধান, সতেজ,—সবুজ ধানগাছ, মাঝখান দিয়ে পায়ে-চলা পথটি চলে গেছে পদ্মার দিকে। এদিক-ওদিক কাজ করছিল কৃষাণেরা, আমাদের দেখতে পেয়ে তারা উঠে দাঁড়ালো। কাছে যাকে পেলাম, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—পদ্মার তীরে যাব, আর কতটা যেতে হবে, হে?

—ক্রোশ খানেক!

সবিস্ময়ে বললাম—ক্রোশ খানেক!

—হ্যাঁ।

পঙ্কি অনুনয় করে বললে—চলোই না!

কৃষাণটিকে জিজ্ঞাসা করলাম—কোনো ভয় ডর নেই ত হে?

সে বললে—না আজ্ঞে। আমরা আছি। আপনারা যান না। গাঙের ধারেও লোকজন আছে।

পঙ্কি বললে—তবে আর কী! চলো দেখি পা চালিয়ে!

বললাম—এত বড়ো চর, অচেনা-অজানা যায়গা, হুট্ ক'রে আসাটা কি ঠিক হলো?

পঙ্কি বললে—ওরা ভরসা দিলে, তবু তোমার ভয় হচ্ছে? চলোই না, এতটা এসেছি, পদ্মার জল ছুঁয়ে আসি, কিছু হবে না! শুনলে না, লোকজন রয়েছে?

দ্বিরুক্তি না করে পাশাপাশি চলতে লাগলাম। চলতে-চলতে মনে হচ্ছিল, চলাব বুঝি আর শেষ নেই! ক্রমে ক্রমে ধান আর তার পরে ঘাসের শ্যামলতা শেষ হয়ে বালিয়াড়া দেখা দিলো! ধূ-ধূ বালির চর, আর দূরে—ঐ পদ্মা! তীর ঘেঁষে ঘেঁষে কতকগুলি নৌকোর সারি, বড়ো বড়ো জাল পাতা, দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে।

পঙ্কিকে যেন ততক্ষণে দুরন্ত নেশায় পেয়েছে। মসৃণ বালুকার ওপর পায়ের ছাপ এঁকে এঁকে এগিয়ে চলেছে সে জলরেখার দিকে।

হঠাৎ একসময় থমকে গিয়ে সে একটু ডানদিকে বেঁকে দাঁড়ালো, বললে—যদুদা? চেয়ে দেখ?

—কী?

—ওপারটা দেখতে পাচ্ছ?

দেখলাম। ওপারের শ্যামল ভূমিরেখা চোখে পড়ল। বললাম—পাকিস্তান। রাজশাহী।

ও কোনো কথা বলল না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। খোঁপাটা কখন ভেঙে গিয়ে চুলগুলি এলিয়ে পড়েছে, হাওয়ায় উড়ছে আঁচল, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, বললে—ঐ সব জায়গা থেকেই ত অসহায় লোকগুলি তাড়া খেয়ে এসে এখানে-সেখানে কোনক্রমে মাথা গুঁজে পড়ে আছে, তাই না?

—হ্যাঁ।

পঙ্কির মধ্যে একটা ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম, ও ধীরে ধীরে বললে—ঐ যে

নৌকোর লোকগুলি, যারা আল্‌কাতরার রং করছিল, তারাও পাকিস্তান থেকে ছিন্নমূল হয়ে চলে এসেছে।

বললাম—কিন্তু, ভেঙে পড়েছে কী?

আমার দিকে ফিরে দাঁড়ালো, বললে—না। ঐ ত বৌটি বলছিল। শ্বশুর, ভাসুর, দেওর, স্বামী, সবাই মাছ ধরতে বেরিয়ে যায়, জাল বোনে, নৌকো তৈরী করে, মেরামত করে। দিনরাত খেটে খুটে পেটের ভাত জোগাড় করছে!

বললাম—একেই বলে জীবনী-শক্তি! যাদের মধ্যে শত মার খেয়েও এমন করে উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা আছে, তাদের দিয়ে দেশ সোনা ফলাতে পারে। আবাদ করলে ফলত সোনা, তবে, কথা হচ্ছে, এখন আবাদ করে কে?

পক্ষি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কী-যেন বোঝবার চেষ্টা করছিল, বললে—পাড়ের ওপর বসে বসে তখন এই সব চিন্তাই করা হচ্ছিল বুঝি?

হেসে ফেললাম। বললাম—চলো, এগোই।

বালির ওপর পা ফেলে ফেলে অতি কষ্টে অগ্রসর হচ্ছি, ও বললে—তোমার কথা কিন্তু ঠিক বুঝলাম না।

—বুঝে দরকার নেই।

পক্ষি আর ও-প্রসঙ্গে এলো না, কী যেন আপন মনে ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ এক সময় বললে—বৌটির আট বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল জানো?

—তাই নাকি?

ও বললে—হ্যাঁ! অতো ছোট বয়সে বিয়ে হয় নাকি?

—হয়েছে। সে ত দেখতেই পাচ্ছ।

ও বললে—নাম কী জানো? চন্দনা। সুন্দর নাম না?

বলতে বলতে ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ বলে উঠল—আমার মেয়ে হলে, তার নাম রাখতাম চন্দনা।

বলেই, সঙ্গে সঙ্গে মুখ-চোখ লাল করে হেসে ফেললে, আঁচল দিয়ে মুখ চেপে ধ'রে রোধ করতে লাগল সেই হাসির আবেগ, বললে—কী সব আবোল তাবোল বকাচ্ছ যে ছাই! আমার আবার সন্তান হবে কী? কোনো দিন হবে না।

আবার হাসতে লাগল উচ্ছ্বসিত হয়ে। বললে—বেশ আছি, না যদুদা? সেই প্রথম বয়সে একবার বিপদে পড়েছিলাম, সেই যে তখন পেটের ভিতর কাটা-ছাঁটা করল ডাক্তার, ব্যস! যেটা পেটে এসেছিল, সেটা গেল,

আর আমার মা হবার সব সম্ভাবনাও শেষ হয়ে গেল! বেশ হয়েছে, না? কী? কথা বলছ না যে?

ধীর কণ্ঠে বললাম—বলার কিছু নেই।

—কেন?

বললাম—আমার বদলে অজিতকে সঙ্গে নিয়ে এলে পারতে! লেখক লোক, অনেক কথা সে বলতে পারত!

খিলখিল করে হেসে উঠল, বলল—তা' পারত। বলত, চলায় তোমার ছন্দ, বলায় তোমার সুর!

বলতে-বলতে থেমে গিয়ে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো, বললো—আচ্ছা, বলো ত? রক্ত মাংসের মানুষ আমি, আমি কখনো প্রতিমা হতে পারি? সরস্বতী-প্রতিমা?

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। ওর মুখখানা হঠাৎ কিসের এক অব্যক্ত ব্যথায় বিবর্ণ হয়ে গেল। অস্ফুট, বেদনার্ত কণ্ঠে ও বলে উঠল—বড়ো ভয় করে, জানো? ওর কাছে বেশীক্ষণ থাকতে আমার বড়ো ভয় করে।

তারপরেই, ও' স্তব্ধ হয়ে গেল। বালির ওপর দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে তখনো আমরা হেঁটে চলেছি। আপনাকে কী বলব শচীনবাবু, এক কালে খুব বই পড়ার সখ ছিল, ইংরেজী-বাংলা যে বই-ই হাতের কাছে পেতাম, তৃষ্ণার্তের মতো তাতেই মগ্ন হয়ে যেতাম! চরে বেড়াতে-বেড়াতে যেন আমার সেই মনটাকে হঠাৎ ফিরে পাচ্ছি মনে হলো। মনে হলো, পদ্মার চরের সেই বিশাল ব্যাপ্তির মধ্যে হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, নোরা থেকে শুরু ক'রে ইসাডোরা ডানকান, সবাই এসে ভীড় ক'রে দাঁড়াচ্ছে সামনে! অজিত কাছে থাকলে হয়ত পরিহাস ক'রে বলতো—'রোমান্টিক মনোভাব'!·· কিন্তু, কথাটা সত্যিই। সত্যিকার রোমান্টিক অনুভূতি যে কী ব্যাপার, ঠিক সেইদিন, সেই মুহূর্তে, পদ্মার পরপারে যখন অস্তগামী সূর্যের আভা এসে পড়েছে রাঙা হয়ে,—আমি অদ্ভুত ভাবে অনুভব করেছিলাম। আমার বইয়ে-পড়া এবং ভালো-লাগা সব চরিত্রগুলি যেন স্পষ্ট চোখের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে!

কিন্তু থাক সে কথা, আমাকে নিয়ে ত কাহিনী নয়। যাকে নিয়ে কাহিনী, যাদের নিয়ে কাহিনী, তাদের কথাই বলি।

দুঃসাহসিনীকে সঙ্গে ক'রে প্রায় দু'মাইল ধরে হেঁটে এসে জলের কিনারায় পৌঁছেছিলাম ততক্ষণে। আসলে কিন্তু, এ-পদ্মার একটা শাখা মাত্র, জলরাশি খানিকটা পেরিয়ে গেলেই আবার একটি জনমানব-শূন্য ধূ-ধূ চর,—তার

ওপারে ভয়ঙ্করী পদ্মার মুল স্রোত! সেই স্রোতের জল ত ছোঁয়া সম্ভব নয়, তাই এই শাখার স্তিমিত জলই স্পর্শ করে মাথায় ঠেকালো পক্ষি। সামনেই তীর ঘেষে সারি সারি কয়েকটি জেলেদের নৌকা রয়েছে বাঁধা. এধারে-ওধারে জাল শুকোচ্ছে। কতগুলি মাটির হাঁড়ি আল্‌কাতরা মাথানো অবস্থায় উপুড় করে রাখা আছে, তাতে নাকি বাচ্চা মাছ ধ'রে রাখা হয়। আশেপাশে স্ত্রী পুরুষ অনেকেই কাজ-কর্মে ব্যস্ত, আমাদের ভাব ভঙ্গিতে দু' তিনজন কাছেও এলো। সবাই হিন্দু, ছিন্নমূল, ওপারের রাজশাহী থেকেই চলে এসেছে।

তাদের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে এক সময় দেখি, বেলা একেবারে পড়ে এসেছে, নৌকার কয়েকটি লোক ছাড়া আর সবাই, ফিরে যাবার উদ্যোগ করছে।

যারা রইল, পক্ষি তাদের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করতে করতে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—শুনলে ত সব? ভয়ের কিচ্ছু নেই! সন্ধ্যাসন্ধ্যি এদের সঙ্গে ফিরে গেলেই হবে।

বললাম—সন্ধ্যা হতেই বা বাকী কতো? কটায় আজ প্রথম শো, খেয়াল আছে ত? আর দেরী করা উচিত নয়। তোমার মেক্‌-আপ—

বলেই, থেমে গিয়ে, একটু হেসে বলে উঠলাম—মানে, রঙ্‌-কাম আছে না?

ও কিন্তু পরিহাসে যোগদান করলে না, সংক্ষেপে শুষ্কমুখে বললে—চলো।

চরের ওপারে বিশাল স্রোত ধারা ছুটে চলেছে, পরপারে শ্যামল ক্ষেত্র, তরুশ্রেণী আর সারি সারি কয়েকটা টিনের ঘর চোখে পড়ে। শুনেছি, লালগোলার পরপারে ডানদিকে—অবশ্য কিছুটা দূরে—গোদাগাড়ি ঘাট। গোদাগাড়ি ঘাটে রেলের ষ্টেশন আছে শুনেছিলাম। ট্রেনের ধোঁয়া কি দেখা যায়? ডানদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখবার চেষ্টা করলাম, কিছুই দৃষ্টি গোচর হলো না। এদিকে তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এক ঝাঁক বক ওপার থেকে উড়ে আসছে এপারে, জলের ধার থেকে কে যেন কাকে ডাকছে, কেঁপে-কেঁপে উঠে সেই স্বর ক্রমশঃ মিলিয়ে যাচ্ছে! একটা ছোট্ট নৌকো—মাথায় ছোট্ট পাল খাটানো—মূল স্রোত থেকে শাখা নদীর মধ্যে চলে আসছে। সব মিলিয়ে সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! কাজকর্ম-মানুষজন-বন্ধুবান্ধব-বাড়ীঘর-সব বুঝি ভুলিয়ে দেয়!

বড়ো চরটির ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে ফিরে আসছি, এবার যে বালুকা-

রাশির মধ্যে এসে দাঁড়ালাম, এ-বালির মাথায় এ-ধারে ও-ধারে কী-সব কাঁটা-ঝোপের সৃষ্টি হয়েছে! পঙ্কি হঠাৎ করল কী, আমার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আমার বাহুমূলে ওর হাতখানি ছুঁইয়ে, ফিস্‌ফিস্‌-করা স্বরে বললে—কী নির্জন যায়গাটা! ঐ দেখ, যারা ফিরে যাবার, তারা ফিরে গেল, কোনো দিকে কোনো সাড়া শব্দ নেই, এসো না একটু বসি?

প্রকৃতির এই ব্যাপ্তি, এই নৈঃশব্দ্য, এ বুঝি আমারও অন্তস্তলে তার কাজ করে চলেছিল, নইলে এক কথায় রাজী হয়ে যাবো কেন?

বসলাম। পঙ্কিও বসেছে পাশ ঘেঁষে। কিছুক্ষণ নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটবার পর, ও হঠাৎ নরম বালির ওপর শুয়ে পড়ল, আমার কোলের ওপর মাথাটা এলিয়ে দিয়ে।

চমকে উঠে বললাম—করছ কী! ওঠো—ওঠো।

তাড়াতাড়ি উঠে বসল পঙ্কি, বললে—কী ব্যাপার! অমন করে উঠলে কেন।

চারিদিকে কেউ কোথাও নেই, নৌকোর সেই স্ত্রীপুরুষের দলটাকে দেখা যায়, ঐ দূরে ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, আর আমার পাশে বসে আছে এক লীলাময়ী নারী! কিন্তু, আজ বলতে বাধা নেই, মনের মধ্যে এতখানি বিতৃষ্ণা আর অ-প্রেম পোষণ ক'রে বোধ হয় অমন করে কারুর পাশে বসে আছে জীবনে কখনো সময় কাটাই নি! অথচ, উঠছি না, বসে আছি চুপচাপ, নিথর নিশ্চল প্রস্তর স্তূপের মতো! ধীরে ধীরে দিগন্তে মেঘের কোল থেকে দিনের শেষ রশ্মিটুকুও মিলিয়ে গেল, আকাশে দুটি-একটি করে তারা ফুটতে লাগল, আকাশ জুড়ে অন্ধকারের কুন্তল-জাল এলিয়ে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় বুঝি আরও এক রহস্যময়ী!

উঠতে যাচ্ছি, পঙ্কি খপ করে আমার হাতটা ধ'রে আবার বসিয়ে দিলে আমাকে। তীব্রস্বরের স্বরে বললে—উঠছ কেন? বসে থাকো চুপ করে। প্রকৃতিকে এমন করে জীবনে বোধ হয় আর কখনো পাবো না, প্রাণ ভরে ভোগ করে নিতে দাও!

বলেছিলাম—শো-র কথা ভুলে যাচ্ছ?

—না!—ধারালো কণ্ঠে পঙ্কি বলে উঠল—ভুলিনি। ভুলিনি বলেই বলছি, জীবনে আর কোনো "শো" আমার থাকবে না।

—মানে!

ও বললে—তোমাকে বলে দিচ্ছি, আজই আমি বিদায় নেবো দল থেকে।

—কিন্তু, কেন ?

ও বললে—রঙ-মাখা জীবন যে আর ভালো লাগছে না গো! মেয়েরা কী চায়, আর আমি কী পেয়েছি, একবার হিসাব করে দেখ দেখি ?

চুপ করে রইলাম। কয়েক মুহূর্ত এই ভাবে কেটে যাবার পর বললাম—কিন্তু, ওদের 'শো'-র কী হবে ?

পঙ্কি বললে—সে ওরাই বুঝবে। মহানন্দে সুশীলরাণী নেমে যাবে আসরে।

বললাম—ভেবে দেখ বেশ করে কথাটা। তুমি দল ছাড়লে,—শেষটা কী হবে? তোমার জায়গায় আরেকটি মেয়ে ওরা নিয়ে নেবে।

নিক ! —অদ্ভুত চাপা এক হাসিতে মুখর হয়ে উঠল পঙ্কি, বললে—তবে, এ-কথাও বলব, আমার মতো মেয়ে পাওয়া শক্ত। বোধ হয় সত্যিকারেই উর্বশী-মেয়ে আমি।

উৎসুক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি লক্ষ্য ক'রে, ও একটুক্ষণ থেমে থেকে আবার বলতে শুরু করল,—কতো মানুষকে প্রলুব্ধ করে কাছে টেনেছি, আর তারপরে কঠিন হাতে দূরে ঠেলে দিয়েছি, তার কি ইয়ত্তা আছে? পেয়ে-পেয়েও মন ভরল না, —না-পাওয়ার অস্থিরতাও দূর হলো না। এ যে কী জ্বালা তা কাকে বোঝাই ?

দু'হাতে মুখ ঢাকলো। ও কথা বলে যাচ্ছে, আর ঠিক তখনই কোথা থেকে একটা কাদাখোঁচা পাখী এসে অদূরের ঝোপের আড়ালে তীব্রস্বরে ডাকতে আরম্ভ করেছে। কথা ওর শেষ হলো, পাখীটাও শুরু করল ছুটে-ছুটে এ ঝোপ থেকে সে-ঝোপে যাওয়া! চীৎকার করতে করতে এ-ঝোপ থেকে সে-ঝোপে যায়, আবার তখখুনি ফিরে আসে !

আমরা নীরব হয়ে পাখীটাকেই লক্ষ্য করছি। কিছুক্ষণ পরে যে সে কোন্ ঝোপের অন্তরালে গেল আর দেখতে পেলাম না, কিন্তু, থেকে থেকে তার সেই তীব্র তীক্ষ্ণ চীৎকার বাতাসে ভেসে-ভেসে বেড়াতে লাগল !

পঙ্কি বললে—ও নির্ঘাৎ মেয়ে-পাখী। সঙ্গীহারা হয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে।

বলেই, আমার দিকে ফিরে তাকালো, এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল আমার চোখের দিকে।

বিব্রত বোধ করে বললাম—উঠতে হবে না? অন্ধকার হয়ে গেল যে ?

ও বললে—তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে ইচ্ছে করছে জানো ?

—অদ্ভুত ইচ্ছে ত !

ও বললে—না-না, বৌ-ছেলেপিলে যেমন তোমার আছে তেমনি রইল, শুধু তুমি মাঝে মাঝে আসবে আমার কাছে। আমার জীবনের একমাত্র বন্ধু হয়ে থাকবে তুমি।

এবারে সত্যিই অবাক হলাম। বললাম—আমাকে এতটা জেনেও তোমার কাছে ডাকতে ইচ্ছা করছে?

—জানি বলেই ডাকছি!—পঙ্কি বলতে লাগল,—আমাকে যে মনে মনে কতখানি ঘৃণা করো, সে আমার জানতে বাকী নেই! আর জানি বলেই বলছি, সেই ঘৃণাই আমার জীবনের আজ পরম লাভ! কতো মানুষকে কতো ঠকিয়েছি, কতো মানুষের সঙ্গে কতো ছলনা করেছি, কতো চাতুরী করেছি! তোমার ঘৃণার মধ্য দিয়ে সে-সবের কিছুটাও যদি শোধ হয়, ত, আমি বেঁচে যাই! আমি আজ চাই এমন একজন পুরুষ, যে আমাকে কখনই ভালবাসবে না, শুধু ঘৃণা করবে, তাচ্ছিল্য করবে, অবহেলা করবে, দরকার হলে চাবুক চালাবে! সারা জীবন ধ'রে আদর অনেক পেয়েছি, এবার চাই অনাদরের আস্বাদ!

বিস্মিত বিহ্বল হয়েই সেদিন বসে বসে শুনে যাচ্ছিলাম ওর অন্তরের সেই আর্ত আকুতি!

তারপরে ও গেল স্তব্ধ হয়ে, আমিও স্তব্ধ। কতো সেকেণ্ড, কতো মিনিট, কতো ঘণ্টা যে কেটে গিয়েছিল অমন নিশ্চুপ অবস্থার মধ্য দিয়ে, কে জানে? আমরা যেন অন্ধকারের ঘেরা টোপের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলাম সেদিন! আকাশে চাঁদ ওঠেনি, তারায় তারায় ভরে গেছে আকাশটা! কতো গ্রহ, কতো নক্ষত্র! প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্র থেকে আলোকরেখা বিচ্ছুরিত হয়ে উধাও অনন্তে কতো দূর পর্যন্ত গিয়ে কাকে স্পর্শ করছে কে জানে!

সেই অন্ধকারের রাজ্যে হঠাৎ এক সময় কে যেন কথা কয়ে উঠল। বললে—কথা বলো।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুটি হাত এসে আমার একটি হাত নিবিড় করে জড়িয়ে ধরতে চাইল। আর, অতর্কিতে ঠাণ্ডা একটা সাপ এসে হাতের ওপর পড়লে আমরা যেমন চমকে উঠি, আতঙ্কিত হয়ে উঠি, ঠিক তেমনি করে ওর হাত দুটো আমি সরিয়ে দিলাম সেই মুহূর্তে।

বলতে বলতে পঙ্কি হঠাৎ কেমন যেন অধীর হয়ে উঠল লক্ষ্য করলাম। বললে—কেমন অদ্ভুত রাত্রিটা, তাই না? কথা বলো যদুদা, কথা বলো।

তুমি পুরুষ, ভালো-ভালো কথা, তা, সে যতো মিথ্যাই হোক, খুব সুন্দর ক'রে যদি আমার কানের কাছে কিছুক্ষণ ধ'রে গুন্‌গুন্ করে যেতে পারো, তাহলে, ধীরে ধীরে অনুভব করব, আমাকে বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠছে, শিউরে উঠছে মনে হবে, আবার বোধহয় আমার 'আমি'কে ফিরে পেলাম! স্বরস্বতী-লক্ষ্মী, যা খুসী তাই বলে যাও।

এতক্ষণ পরে কথা বললাম। মৃদু কণ্ঠেই বললাম—অজিতকেই সঙ্গে করে নিয়ে আসা উচিত ছিল না কি? সে নাট্যকার, কথা বানানো তার কাজ, আমার নয়।

ও' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপরে বললে—ওর বয়সটা কম, তাই ভয় পেলাম। ওযে আমার ওপর একরাশ কল্পনা আরোপ ক'রে বসে আছে! কিন্তু, যখন ও বুঝবে, ওর সব ধারণা ভুল, তখন? যখন বুঝবে, আমি লক্ষ্মীও নই সরস্বতীও নই—একটা ব্যর্থ-জীবন—ব্যর্থ-প্রাণ সামান্য মেয়ে মানুষ মাত্র, তখন কী হবে? আমার কষ্টের থেকে, ওর মনোকষ্টের কথা ভেবেই ওকে সঙ্গে আনতে চাইনি যদুদা।

চুপ করে রইলাম শচীনবাবু। এবং তারপরে যে কতক্ষণ কেটে গেল, রাত যে কত হয়ে গেল, সে কথা আজ বলতে পারব না। এর পরে যতক্ষণ ছিলাম, কেউ আর কোনো কথা বলি নি, চুপচাপ পাশাপাশি বসে রইলাম দীর্ঘ সময়, কেউ কারুর হাতেও হাত রাখিনি, কেউ কাউকে ছুঁই-ও নি। শুধু সুধীরবাবুর আবৃত্তি-করা কটি লাইন সেই মুহূর্তে মনের মধ্যে গুঞ্জন করে ফিরছিল,—"Now my charms are all overthrown!"...

এক সময় ও-ই বললে—চলো এবার উঠি।

—চলো।

উঠলাম বটে, কিন্তু কেমন করে এই গাঢ় অন্ধকারে পথ চিনে যাবো? পদ্মার তীরের দিকে তাকিয়ে দেখি, সারিসারি আলো জ্বলছে নৌকায়, আর এদিকে, উঁচু পাড়ের ওপরে গ্রামের মধ্যেও আলোর আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু সেই আলোর রাজ্যে পৌছব কী করে?

কিন্তু, আশ্চর্যের কথা, পক্ষির সেদিকে যেন ভ্রূক্ষেপও নেই। ও শুধু বললে—তাহলে কী ঠিক হলো? এখ্‌খুনি গিয়ে দল ছাড়বে ত?

—তুমি?

ও দৃঢ়কণ্ঠে বললে—আমি ত ছাড়বই। তোমাকেও ছাড়তে হবে। এভাবে জীবন কাটালে জীবনের আর মুক্তি নেই।

বলতে ইচ্ছা করল—কীসে মুক্তি আছে বলতে পারো? নিজেদেরই সৃষ্টি করা অর্থনীতি, সমাজনীতি, এবং আরও বহু প্রকারের নীতি জীবনটাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধ'রেছে সরীসৃপের মতো, এর থেকে মানুষের মুক্তি কেমন করে হবে, বলতে পারো?

কিন্তু, না, এ-জিজ্ঞাসা ওকে করিনি। এ-জিজ্ঞাসা ক্রমাগত করে চলেছি নিজেকে।

আর, তারপরে? তারপরে, সেই অন্ধকারে, পথ চিনে, কোনক্রমে কম্পিত অন্তরে যখন ষ্টেশনের প্লাটফর্মের উজ্জ্বল আলোর সন্নিধানে এসে পৌঁছলাম, তখন রাত এগারোটার কম হবে না।

বললাম—স্থির সিদ্ধান্ত? আজ ভোরের ট্রেনেই কলকাতা চলে যাবে?

—হ্যাঁ।

আর কোনো কথা হলো না তখন। তারপরে, ষ্টেশনে গিয়ে একটা রিক্সা নিয়ে যখন আমাদের যাত্রার আসর-সংলগ্ন সাজঘরে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন আমাদের দেখা মাত্র, সমগ্র দলে একটা সাড়া পড়ে গেল। আসরে তখন অগনিত মানুষ, চিত্রার্পিতের মতো অভিনয় দেখছে। এক লহমাতেই বুঝলাম উর্বশী-নাটকের শেষ দৃশ্যটির অভিনয় চলছে তখন।

সাজঘরের মধ্যে গিয়ে পৌঁছান মাত্রই নানান দিক থেকে নানান প্রশ্ন।

—কোথায় ছিলেন?

—খুঁজে খুঁজে হয়রান একেবারে!

গোকুলবাবু এগিয়ে এলেন কাছে। চোখের দৃষ্টি তীব্র, প্রচণ্ড ক্রোধে মানুষটির চেহারাই বিকৃত হয়ে গেছে। বললেন—একটা দায়িত্ববোধও নেই আপনাদের!

লক্ষ্য করলাম, সম্বোধনে তুমি নয়, আপনি ক'রে কথা বললেন বড়োবাবু।

পঙ্কি মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে সেইদিকে এক মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে নিয়ে বলে উঠলাম—আমরা দুজনেই চাকরী ছেড়ে দিতে এসেছি।

তাই দিন!—গর্জন করে উঠলেন গোকুলবাবু—আপনাদের আমার দরকারও নেই।

সুধীরবাবু আসরে রয়েছেন তখন, দূর থেকেই "কেশীদৈত্যে"-এর হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে:—

"সংহার—সংহার! সংহারের মধ্য দিয়ে ভিতরের জ্বালাটাকে তৃপ্ত করতে চাই! সংহার—সংহার!"

বললাম—ভোরেই ট্রেনেই চলে যাবো দুজনে।

—তাই যান!—বড়বাবু বলে উঠলেন—শুধু যাবার আগে একবার আস্তানায় গিয়ে দেখে যান নিজের চোখে, কী সর্বনাশ বাধিয়ে গেছেন আপনারা! বিপুল আছে সেখানে, যদি পারেন ত তার সঙ্গে একবার দেখা করে যাবেন যাবার সময়।

—কী করছে!

বড়োবাবু বললেন—একটি দুর্ঘটনা হতে হতে বেঁচে গেছে! অজিত ওদিকে যায় যায় হয়েছিল।

একটা চাপা আর্ত-চীৎকার শোনা গেল পক্ষির কণ্ঠস্বরে,—কী বললেন!···

বড়োবাবু বলতে লাগলেন—তবে আর বলছি কী! ডাক্তার বাবুর হাতে কিছু তুলে দিয়ে তবে রেহাই পেয়েছি! লুকোচাপার মধ্যে সারতে হয়েছে ব্যাপারটা! সময়মতো ধরা গেছল তাই রক্ষে! পাম্প করে পেট থেকে সব বার করে দিতে হয়েছে ডাক্তারবাবুকে!

ঠিক এই সময়, আসর থেকে সুশীলের কৃত্রিম স্ত্রীকণ্ঠ শোনা গেল। এবং তার সংলাপের ফলস্বরূপ সেই মুহূর্তে একটা করতালির স্রোত বয়ে গেল বুঝি বিপুল জনতার মধ্যে!

অদ্ভুত পাণ্ডুর—বিবর্ণ দেখাচ্ছিল পক্ষির মুখখানা। স্থাণুর মতো সে দাঁড়িয়ে আছে আমার পাশে। গোকুলবাবু বললেন—সতীশ দেবনাথ কৌটা থেকে মোদকের মতো দেখতে কী যেন একটা কবিরাজী ওষুধ খায়, সেই ওষুধ নাকি অজিতকেও মাঝে মাঝে দিতো। বিকেলবেলা, সেই ওষুধ মনে করে মনের ভুলে কার যেন একতাল আফিং মুখে পুরে গিলে ফেলেছিল।

বলে উঠলাম—কী সর্বনাশ!

—সর্বনাশ বলে সর্বনাশ!—বড়োবাবু বলতে লাগলেন—এদিকে 'উর্বশী' নেই, ডবল শো। ভাগ্যিস সুশীল ছিল। দেখছেন আসরের দিকে তাকিয়ে? সুশীল আজ মান বাঁচিয়ে দিয়েছে। কী সুন্দর 'উর্বশী' করল, একবার দেখুন গিয়ে! কার সাধ্য বুঝবে, যে, মেয়ে নয়! দর্শকরা সবাই মনে করছে—মেয়ে!

মুহূর্তে কঠিন হয়ে গেল শীলার মুখ। সে দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল—এবার সেকেণ্ড শো শুরু হবে ত? সেকেণ্ড শো আমি করব।

গোকুলবাবু বললেন—তা কী করে হয় মা-লক্ষ্মী?

শীলা ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে বললে—আমি করবই সেকেণ্ড্ শো। তারপরে আপনি চাকরীতে রাখুন, আর নাই রাখুন, সে-সব পরের কথা পরে হবে। কিন্তু, সুশীলকে জিত্তে আমি কিছুতেই দেবো না। এই আমি সাজতে চললাম আমার সাজ ঘরে। খাবার-দাবার যা আনাবার, এখানেই আমি আনিয়ে নিচ্ছি।

বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে ভীড় ঠেলে মেয়েদের সাজঘরে ঢুকে গেল সোজা. এবং ঢুকেই বাইরের পর্দাটা ফেলে দিলে! ওদিকে, আসরেও অভিনয় শেষ হলো, দর্শকের করতালি, এবং তারপরে নানান কলরবে মুখরিত হয়ে উঠল যায়গাটা।

বড়বাবু হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত। নটতিলক অম্বুজনাথ আর সবার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা পর্যবেক্ষণ করছিলেন, এবার এগিয়ে এলেন তিনি, বললেন—বড়োবাবু, এটা কিন্তু ভালো হচ্ছে না।

—কী ভালো হচ্ছে না!

অম্বুজবাবু বললেন—আমি সুশীলের হয়ে বলছি। সে এখ্খুনি আস্বে সাজঘরে, এসে কী দেখবে? তার বদলে অন্যলোক সাজ্ছে! এটা আর্টিষ্টের পক্ষে কতখানি বেদনাদায়ক, তা' আপনি নিজে আর্টিষ্ট্ হয়ে বোঝবার চেষ্টা করুন বড়োবাবু। আজ সুশীল আপনার মান বাঁচিয়ে দিয়েছে! দর্শকদের মধ্যে উচ্চবাচ্য লক্ষ্য করলেন একটুও? তারা সুশীলকে পুরুষ ব'লে বুঝতেই পারেনি! একী কম ক্ষমতার কথা? আপনিই বলুন।

বড়োবাবু আমার দিকে ফিরে দাঁড়ালেন, বললেন—সত্যিই ত, সুশীল এসে হুলুস্থুল কাণ্ড করবে। আমি তাকে ঠেকাচ্ছি, তুমি ভেতরে যাও সরকার মশাই, মা-লক্ষ্মীকে বুঝিয়ে বলো, এ হয় না। সেকেণ্ড্ শোতে সুশীল-ই বেরুবে।

অগত্যা গেলাম ভিতরে। অন্য মেয়েরা কেউ সাজ ঘরে তখন ছিল না, 'রং-কাম' তুলে পোষাক পাল্টে কেউ বাড়ী গেছে, কেউ অন্যদিকে বসে হয়ত গল্প করছে। অর্থাৎ পক্ষি তখন সাজঘরে একা। আয়নার সামনে বসে 'রঙ-কাম' করতে ব্যস্ত।

বললাম—সাজতে হবেনা। বেরিয়ে এসো।

—কেন!

বললাম—কী কথা ছিল? দল ছাড়বে না?

মুহূর্তে উঠে দাঁড়াল, আমার দিকে ফিরে দুটি চোখে তীব্র জ্বালা নিয়ে বলে উঠল—তুমি এসেছ কী করতে? যাও শীগ্‌গির বাইরে যাও!

বললাম—বাইরে যাবো কী, বড়োবাবুই যে আমাকে পাঠালেন!

সেইভাবেই উত্তেজিত কণ্ঠে বললে—বেশত, তুমি না এসে তিনি আসতে পারলেন না! নিজের মুখে এসে বলুন দেখি,—না, তোমাকে সাজতে হবে না! দেখি কতখানি ক্ষমতা!

বলে, আলনায়-রাখা সুশীলের ধুতি-সার্ট টেনে নিয়ে আমার গায়ের ওপরে ছুড়ে ফেল্‌ল, বললো—নিয়ে যাও। খবরদার, আমার ঘরে এখন যেন কোনো পুরুষ মানুষ না ঢোকে! ঢুকলে চাৎকার করবো!

ওকে শান্ত করবার জন্যই নিম্নকণ্ঠে বললাম—পাগল হয়ে গেলে নাকি! এখন কি তোমার উর্বশী সাজবার সময়? নামুক না সুশীল, তুমি চলে এসো। অজিতের কাছে তোমার এখ্‌খুনি যাওয়া দরকার! শুনলে না, কী হয়েছে ওর?

শীলার মাথায় তখন সত্যিই আগুন ধরে গিয়েছিল। আয়নার সামনে শতরঞ্চিতে বসে ওরা 'রঙ-কাম' করে, ও করল কী. হঠাৎ হেঁট হয়ে, একটা হেসলিনের কৌটো তুলে নিয়ে সজোরে ছুঁড়ে দিলে আমার মুখের দিকে, আমি যদি মুহূর্তে মুখ না সরিয়ে নিতাম, তাহলে একটা রক্তারক্তি কাণ্ডই ঘটে যেতো।

গোলমাল শুনে বড়োবাবু ছুটে এলেন ঘরে, পিছনে পিছনে অম্বুজনাথ এবং আরও দু'একজন। সেদিন সে এক অতি নাটকীয় দৃশ্যেরই অবতারণা করেছিল বটে, শীলা! বড়োবাবুর দিকে তাকিয়ে তীব্র কটূক্তি করতে তার একটুও আটকালো না। বললে—আমি এইভাবে বুকের আঁচল ফেলে দিয়ে থানায় ছুটে যাবো, কার-কার নামে কী-কী বলব, তাত বুঝতেই পারছেন! আমরা অভিনেত্রী, আমরা সব পারি! তবে আমাদের কাছেও ঘেন্না বলে কথাটা আছে, না যদি চান. কাল দল ছেড়ে চলে যাবো। কিন্তু আজকের রাত্রিটা আমাকে 'উর্বশী' সাজতেই হবে। জীবনে কিছুই পাইনি, তাবলে শিল্পী মনের দম্ভটাও কেড়ে নেবেন!

বলতে না-বলতে, কী আশ্চর্য, ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল শীলা। বড়োবাবু এগিয়ে গিয়ে তাকে দুহাতে টেনে নিলেন কাছে, সস্নেহে বলে উঠলেন—বুঝি মা-লক্ষ্মী, তোমার দুঃখও কি বুঝি না? ঠিক আছে, নামো

তুমি। সুশীলকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি। তবে, বড়ো রাগ হয়ে গিয়েছিল মা, শো ফেলে রেখে এমনটা করে? শিল্পী না তুমি?

কাঁদতে কাঁদতেই বসে পড়ল শীলা ওঁর পায়ের কাছে। উনি—"কী করো মা-লক্ষ্মী" বলে তাড়াতাড়ি পেছিয়ে এলেন দুপা, তারপরে আমাদের দিকে ফিরে বললেন—চলো হে চলো, মা-লক্ষ্মীকে সাজতে দাও নিরিবিলি, সুশীলের ধুতি-জামা বরং আমিই নিয়ে যাচ্ছি।

বেরিয়ে এলাম নিশ্চুপে। সুশীল ততক্ষণে আসর থেকে এসে সাজঘরের দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, সে এবার এগিয়ে এসে বড়োবাবুকে কী বলতে লাগল শুনলাম না, আরও এগিয়ে গেলাম। দলের প্রতিটি লোক বড়ো সাজঘরে উপস্থিত হয়েছে, আমি তাদের মধ্য দিয়ে বাইরে এলাম, দেখি অদূরে, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কেশীদৈত্যরূপী সুধীরবাবুর খুব কাছে দাঁড়িয়ে সাদা থান-পরা মালতী ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলছে। মুখখানি পেন্ট-করা, কিন্তু পরণে সাদা থান। সেকেণ্ড শোর জন্য পোষাক-আশাক সে এখনো পরেনি আর কী।

এর পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত শচীনবাবু। শীলা মত্ত হয়ে গেল 'উর্বশী' নিয়ে, আমি ফিরে এলাম আস্তানায়, অজিতের কাছে। ওর শিয়রে বসেছিলেন বিপুলবাবু, আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—এসেছেন? বসুন তাহলে। আমি একবার আসরে যাই।

—কেমন আছে?

—ভালো। ঘুমুচ্ছে।

উনি চলে যেতেই সতীশ দেবনাথ এসে ঢুকল ঘরে। বলল—ম্যানেজার বাবু, একবার বাইরে আসবেন?

এলাম। সতীশ চুপি চুপি বললে—কাউকে ঘুণাক্ষরে আসল ব্যাপারটা জানাইনি। এবারে আপনাকে বলছি সত্যি কথাটা। অজিত-ছোঁড়াটার হাতে আজ দড়ি পড়ত। মোদক আমি খাই, কিন্তু ও কখনো খেতো না; ওর খাওয়ার কথাটা আমি সবাইকে বানিয়ে বলেছি। আসলে কী হয়েছিল জানেন? আপনি শীলাকে নিয়ে কোথায় চলে গেছেন, ফিরে আসছেন না,—এসব শুনে ও মুখে একতাল আফিং পুরে দিয়েছিল। দলের বুড়োরা ত অনেকেই আফিং খায়? কী করে ও' জোগাড় করেছিল, ও-ই জানে, তবে সবটা পেটে যায়নি, এই রক্ষে!

যে-সন্দেহটা এতক্ষণ মনের মধ্যে ধূমায়িত হয়ে ফিরছিল, সতীশের কথায়

এবার সেটা দৃঢ়তর হলো। সমস্ত ব্যাপারটাই পরিষ্কার হয়ে উঠল এবার। অজিতের শিয়রে বসে থাকতে থাকতে, যখন একসময় ও'চোখ খুলল, যখন ও 'যদুদা' বলে ডেকে উঠল, তখন ওর হাত হাতের মধ্যে নিয়ে স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বলে উঠলাম—ছিঃ ভাই, এমন ভুলটা করতে আছে!

ছলোছলো চোখে আমার দিকে তাকালো, তারপরে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ক্ষীণকণ্ঠে বলে উঠল—প্রায়শ্চিত্ত করলাম যদুদা। আমার মধ্যে কোথায় যেন এক স্বপ্নালু মন লুকিয়ে ছিল, প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে সে প্রমত্ত হয়ে উঠেছিল। প্রবল ধাক্কা খেয়ে এবার স্থির হয়ে গেছি, যদুদা, আপনাকে আজ বলছি, আর আমার ভুল হবে না।

কোমলকণ্ঠে বললাম—অজিত, ঘরে আর কেউ নেই, তাই তোমাকে আজ সত্যি কথাটা বল্‌ব। আমি তোমার সম্বন্ধে শীলার কথা সবই শুনেছি। শুনে এটুকু বুঝেছি, শীলা মনে মনে তোমাকেই ভালবাসে। তবে, এ ভালবাসার প্রকৃতি ভিন্ন, একে সে সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখতে চায়।

একটু হাসল অজিত, বলল—ওসব কথা থাক যদুদা। আমি আশ্চর্যরকমে ওসব থেকে মুক্ত হয়ে গেছি।

বিস্মিত হয়েই বলে উঠলাম—অর্থাৎ?

ও বললে—নিজেকে ফিরে পেয়েছি যদুদা, যাকে বলে, পুনরাবিষ্কার করা! বুঝেছি, আমি একটা সোপান অতিক্রম করে গেছি। কারুর ওপরে রাগ নেই, অভিমান নেই, বরং ওর ওপর আমার একটা স্নেহ-বোধই প্রবল হয়ে উঠ্‌ছে! কিছুই পায়নি জীবনে!

তারপরে, নিশ্চুপে উঠে এসেছিলাম ওর কাছ থেকে। বড়োবাবু-ছোটবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেই-দিন ভোরের ট্রেণেই ফিরে এসেছিলাম কলকাতা।

বড়োবাবু বলেছিলেন—তুমিও ক্ষেপে যাচ্ছ সরকার মশাই? মনের দুঃখে না-হয় বুড়ো মানুষ দুটো কথাই বলেছি, তা' বলে তুমি চাকরী ছাড়বে?

না শচীনবাবু চাকরী সত্যিই তখন ছাড়িনি, চলে এসেছিলাম দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে। যাতে করে, অন্য চাকরীর চেষ্টা করতে পারি। সেদিন বুঝেছিলাম, দল না ছাড়লে আমার উপায় নেই। এই যে স্ত্রী-পুত্রকে ফেলে রেখে বাইরে বাইরে যাযাবরের মতো এরে বেড়ানো, ঘুতে আর যারই কিছু হোক না হোক, আমার ক্ষতি হচ্ছিল।

এসে দেখি ঠিক সময়েই এসে পড়েছি। স্ত্রীর রক্তাল্পতা ছিলই, অসুখটা

বেড়ে গেছে। ওর ভাই থাকে পালামৌতে, তাকে ও অনন্যোপায় হয়ে চিঠি লিখেছিল। আজ ভাবছি, ভাগ্যে লিখেছিল।

তাইত আপনার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়টা হয়ে গেল শচীনবাবু! ওর ভাই ছুটি না পাওয়ায় আসতে পারলেন না, আপনি তাঁর বন্ধু, আপনাকে তিনি চিঠি লিখে তার বোনের খবর নিতে বললেন, এবং সেইজন্যই ত আপনি এলেন, তাই না? আমিও বাঁচলাম মনের মতো একটি লোক পেয়ে! কথাগুলো যেন জগদ্দল পাথরের মতো বুকের ওপর চেপে বসেছিল, আজ হাল্‌কা হয়ে বাঁচলাম!

কিন্তু এত কথা বললাম, এবার বাকী কথাটা শুনে নিন। সেদিন লাল-গোলা ষ্টেশনে, ভোরের বেলা একা পোঁটলাপুট্‌লি নিয়ে ট্রেনে উঠে বসেছি, গাড়ী প্রায় ছাড়ে-ছাড়ে, এমন সময় অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, সুশীল ছুটে আসছে—একা হন্তদন্ত হয়ে, হাতে তার টিনের সুট্‌কেশ, আর শতরঞ্চি-বাঁধা বিছানা। আমি চীৎকার করে ডাকতেই সে এসে উঠল আমার কামরায়। সে-ও উঠল, গাড়ীও ছেড়ে দিলো। জিজ্ঞাসা করলাম—কী ব্যাপার?

সুশীল বললে—দল ছাড়লাম।

—কেন!

উত্তর দিলে—পয়লা শোতে উর্বশী সেজে মান বাঁচালুম দলের, সেকেণ্ড্‌ শোতে আমাকে নামালে না, নামালে শীলাদিকে। তাই ঝগড়া করে চ'লে যাচ্ছি।

সারাটা পথ আর কোনো কথা হলো না। ও আর আমি পাশাপাশি বসে আছি যে-যার চিন্তায় মগ্ন হয়ে! শীলার কথাই বার বার মনে পড়ছিল। কোন্‌ কথাটা মনে পড়ছিল জানেন শচীনবাবু? সেই যে পদ্মার চরে ও বলেছিল, নারীত্বের চরম ব্যর্থতার কথা! চিন্তা করতে করতে একসময় মনে হলো, বোধহয় বুঝতে পেরেছি ওর জীবনের যথার্থ ট্রাজেডীর সুরটা! মেয়েদের জীবনে স্বাভাবিক ভাবেই কতগুলি স্তর আছে, প্রথম জীবনে সে কন্যা ও ভগ্নী, তারপর সে প্রিয়া ও জায়া, তারপর সে জননী। যখন সে জায়াত্বকে অতিক্রম ক'রে মাতৃত্বে এসে দাঁড়ায়, তখন তার সমস্ত জীবনের অনুভূতি হয়ে দাঁড়ায় ভিন্নরূপ! কিন্তু, যে মেয়ে 'প্রিয়া'কেই ধ'রে রাখতে চায় প্রবীণত্বের উত্তরণকাল পর্যন্ত, তার দেহ-মনের ট্রাজেডীর বেদন যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠেছে শীলার অন্তর্বেদনার মধ্য দিয়ে! শীলাকে না দেখলে, শীলাকে না জানলে, এ' নির্মম সত্যটা আমার জানা হতো না! কিন্তু

থাক, আমার কথা। যা আপনাকে বলছিলাম, তা-ই বলি। শেয়ালদাতে গাড়ী প্রায় পৌঁছে গেছে বলা যায়, এমন সময় সুশীল কথা বললে। বললে—একটা কথা শুনুন ?

—কী ?

বললে, অন্যদলে যাবো। তবে, মেয়ে আর সাজব না, কাটা-সৈনিক সাজাক আর যাই করুক, পঞ্চাশটাকা মাইনে দিক, তাতেও রাজী, সাজব এবার পুরুষ।

—পারবে ?

—পারতেই হবে।—সুশীল বললে—ম্যানেজার বাবু, শিল্পীমনিষ্যি যখন নতুন যুগটা দেখতে পায় না, তখনই সে মরে। আমি বুঝতে পেরেছি, নতুন যুগকে মেনে না নিলে দাঁড়াতে পারব না। জানেন ? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শীলাদির সিন দেখছিলাম। ইস, যেন একেবারে ক্ষেপে আছে! বাইরে যতোই রাগ দেখাই, ভিতরটা একেবারে মোহিত হয়ে গিয়েছিল ম্যানেজারবাবু!

কোনো কথা না বলে নীরবেই ট্রেন থেকে নেমে ভীড়ের মধ্যে মিশে গিয়েছিলাম সেদিন। বাড়ী এসেছি, বৌকে বাঁচিয়েও তুলেছি কিন্তু ভাবনার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছি কই ? লক্ষ্মী মেয়ে, মাসে মাসে ওকে যে টাকা পাঠাতাম, তার থেকে কিছু টাকা ও যে কেমন করে বাঁচিয়েছে, ভেবে অবাক হয়ে যাই! এখন সেই টাকা দিয়ে মুদীর দোকান দেবো কী স্কুলে মাষ্টারী করব, সেটাই ভাবছি। ঐ যে নটতিলক অম্বুজবাবুর কথা বলেছিলাম, তাঁর মেজোভাই একটা স্কুলের হেডমাষ্টার। তাঁর সুপারিশে ওখানে একটা চাকরী পেতে পারি মনে হচ্ছে। কিন্তু, হিসেব করে দেখতে হবে কোনটাতে বেশী পাবো, মাষ্টারী না দোকানদারী ? সামাজিক সম্মান বলে কিছু আছে বলে মনে হয় না, সুতরাং যাতে টাকা বেশী সেটাই করব। কিন্তু সে-সব ভাবনা ছাড়া আরেক ভাবনা যে আমার মনকে বার বার দোলা দিয়ে যাচ্ছে শচীনবাবু! মনে হচ্ছে, পঙ্কি আমাকে একটা নিদারুণ সত্যি কথা বলেছিল সেদিন। ওর মত আমিও বলছি, মনের মধ্যে মধু জমছে কই ? কোনো একটা আদর্শ, কোনো একটা চিন্তা, কোনো একটা মানুষ, কোনো একটা অবলম্বন, কাউকেই মনপ্রাণ দিয়ে আঁকড়ে ধরবার শক্তি যখন মানুষের নিঃশেষ হয়ে যায়, তখনই হয় মনুষ্যত্বের মৃত্যু। আজকে যে চারি দিকে তাকিয়ে এই মৃত্যুই দেখতে পাচ্ছি, এর থেকে মুক্তি পাবার পথ কই ?

ছোটবাবু এসেছিলেন এর মধ্যে দেখা করতে। বীণা দল ছেড়ে চলে গেছে সেই কাশী, ওর মায়ের কাছে। ছোটবাবু ভেঙে পড়েন নি, মুষড়ে পড়েন নি, বললেন—আবার নতুন করে দল চালাবো। অজিত নতুন নাটক লিখছে, এবার ছদ্মনামে নয় নিজের নামে। পিপল্‌স্ থিয়েটার মুভ্‌মেণ্ট আমরা যাত্রার মাধ্যমেই শুরু করবো। রিয়ালিজম্ আর সিম্বলিজ্‌মের মিশ্রণ—। আমাদের পুরানো যাত্রার ধরণ নতুন করে নতুন ঢং-এ চালিত করবো। যাত্রার মাধ্যমে সত্যিকার নাট্য-সাহিত্যই বা গড়ে উঠবে না কেন?

ছোটবাবু অনেক কথাই বলে গেলেন, বুঝলাম, ওঁর উৎসাহের আর অন্ত নেই। শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন ওঁদের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে গেছি, মুক্তি চাইলেই কি মুক্তি পাওয়া যায়? ঘরে আছি বটে, মন কিন্তু ওদের পিছনে পিছনে মৌমাছির মতো গুন গুন করে ফিরছে!